To talk of many things
Of shoes and ships and sealing wax
Of cabbages and kings.

১৩৩৪
রামেশ্বর এণ্ড কোং
চন্দননগর

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম্-এ,

চন্দননগর।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৩৪

দাম দু টাকা চার আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস,

৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

ও সুচারু মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। বঙ্কিমের সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী, নসীরাম বাবুর বৈঠকখানা, সেই কমলাকান্ত সমস্তই বজায় আছে—বরং মনে হয় গ্রন্থকারের হাতে তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমুজ্জ্বল নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তী ঢং' আয়ত্ত করা বড় সহজ নয়, কিন্তু শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই দুরূহ পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 'নিরুপদ্রবী', 'সাবধান', 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন', 'মাঝামাঝি', 'সৈরিন্ধ্রী', 'নারীর শত্রু'—কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা বলিব?—প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সকলেরই পাঠ করা, স্মরণ করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ গ্রন্থ যে-কোন ভাষাকেই অলঙ্কৃত করিতে পারে। আমরা কমলাকান্তকে মাঝে মাঝে দেখিতে চাই এবং তিনি যখন মরেন নাই তখন আবশ্যক মত দেখা দিবেন এ ভরসা আমাদের হইয়াছে। —(আষাঢ়, ১৩৩৩)

বাঁশরী

"সমাজের নানাদিকে যে-সব কুসংস্কার রহিয়াছে, যে-সব গলদ রহিয়াছে তাহাতেই ঘা দিবার জন্য এই পত্রগুলি রচিত। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু লেখক যিনিই হউন, তাঁহার দেখিবার শক্তি আছে। আঘাত যে কোথায় কেমন ভাবে করিতে হয় তাহাতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা বড় অল্প নহে। তাঁহার বেদনা কখনো তীব্র শ্লেষের আকার ধারণ করিয়া দেখা দেয়, কখনো বা অশ্রু হইয়া গলিয়া পড়ে। সব স্থানে তাঁহার মতের সহিত আমাদের মত অবশ্য মেলে নাই, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি তাঁহার মতের ভিতর দিয়া দেশের প্রতি মমত্ব-বোধের ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। গ্রন্থের ভাব সর্ব্বত্র সহজ না হইলেও ভাষা বেশ সহজ, সরল, সরস।" —(৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩০)

বাসন্তী

"অমর কমলাকান্ত হাসি ও সরল ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া যে মর্ম্মবেদনা ঢালিয়া গিয়াছেন যুগে যুগে দেশের প্রাণের মধ্যে সে ভাবের অভিব্যক্তি চলিতেছে। সেই ভাব,

প্রাণের সেই সত্য মর্ম্মকথা লেখনীমুখে প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের মনে দাগ দেওয়াতেই এমন লেখার সার্থকতা। এ দায়িত্ব লইতে পারে সেই যে দেশকে, দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে—এবং সেই অনুভবের রূপ দিবারও শক্তি আছে। কমলাকান্তের সে শক্তি ছিল তাই কমলাকান্ত যুগে যুগে প্রাণবান থাকিবে। বর্ত্তমান পত্রের লেখক কমলাকান্ত নাম গ্রহণ করিয়া চির উজ্জ্বল কমলাকান্তকে ম্লান করেন নাই—বরঞ্চ সেই অমর লেখাতে আরও নূতন ভাব-সম্পদ সংযোগ করিয়া একটা সরস উজ্জ্বল সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সুচিন্তিত, সুলিখিত রসরঙ্গেভরা পত্রগুলির প্রত্যেকখানি পত্র পড়িতে পাঠক পাঠিকাকে ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট দিবে কিন্তু মনকে এতটুকু ভারাক্রান্ত করিবে না; নিজেদের সত্য অবস্থা, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা চিন্তা করিবার অবসর দিবে। পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ নামে রচিত হইলেও—সমগ্রভাবে বইখানি পড়িতে এতটুকু খাপছাড়া বোধ হয় না। যাঁহারা জাতীয় জীবন, সমাজ জীবন, নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন সময় একটুও চিন্তা করিবার অবসর পান এই 'কমলাকান্তের পত্র' অবশ্যই তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিতে পারিবে। এই পত্রের লেখকের সরল সবল রসভঙ্গভরা নানা বিষয়ের মত গ্রহণ করিতে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা শৈথিল্য করিবেন না—একথা জোর করিয়া বলা যায়।"

—(১৩ই পৌষ, ১৩৩০)

হিতবাদী

"বঙ্কিমবাবু তাহার 'বঙ্গদর্শনে' 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অনাস্বাদিত রসের সন্ধান পাঠকবর্গকে দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর পরে অনেকেই কমলাকান্তের অনুকরণে কমলাকান্তি ভাষায় নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল নকল 'কমলাকান্ত' পাঠ করিয়া আসল 'কমলাকান্তে'র কথা মনে পড়া ত দূরের কথা, অনুকরণকারীর অক্ষমতা ও ধৃষ্টতাই পাঠকগণের মনে পড়ে। সুখের বিষয় চারু বাবুর প্রকাশিত 'কমলাকান্তের পত্র'গুলি পাঠ করিয়া আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'কেই মনে পড়িয়াছে। 'কমলাকান্তের পত্র'গুলিতে গভীর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও আমরা সকল পত্রেরই সিদ্ধান্ত

বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ৩০খানির উপর আরও ২৩খানি পত্র সন্নিবেশিত হইল—তন্মধ্যে "যদি" ও "দূর নাহি দেখ তা" "ভারতবর্ষে" ও অবশিষ্ট "আত্মশক্তি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। মানুষের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বড় হইলে মূল্য বাড়িতে বাধ্য—সুতরাং মূল্য বাড়িল।

সমালোচক কমলাকান্তকে ঝাঁটার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—সে ঝাটার যতই প্রয়োজন হউক, কাহারও গায়ে লাগিলে "ষাট্ ষষ্ঠীর দাস" বলিতেই হয়; সম্মার্জ্জনীর হাওয়াও যার গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা আমি তাহাকে অগ্রেই বলিয়া রাখিতেছি—"ষাট ষেটের বাছা!"

প্রকাশক

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

যার "মুখবন্ধ" লেখবার কথা ছিল তার মুখ এখন বন্ধ; আমি সুধু এই পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হবো যে, "কমলাকান্তের পত্র" এই নামে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে "নবসঙ্ঘ" ও "আত্মশক্তি" পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল; একটি "নিবন্ধ" পত্রেও প্রকাশিত হয়। পর পর যেমন ছাপা হয়েছিল, এ পুস্তকে প্রবন্ধগুলি সেই পর্য্যায় রক্ষা করেই ছাপা হ'ল, কোন প্রকার ওলটপালট বা পরিবর্ত্তন করা হয়নি।

"মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে"—কমলাকান্ত সম্বন্ধে খোসনবীশ জুনিয়ার প্রদত্ত এ সংবাদটা সত্যও হতে পারে; কিন্তু সে মরেনি এটা ঠিক। যুগে যুগে সে বেঁচে থাকবে—আর তার বক্তব্য তারই মতন করে বলে' যাবে, তার ভুল নেই।

This fellow's wise enough to play the fool ;
And, to do that well, craves a kind of wit.
He must observe their mood on whom he jests
The quality of persons, and the time ;
And *not* like the haggard, check at every feather
That comes before his eye. This is a practice,
As full of labour as a wise man's art :
For folly, that he wisely shews, is fit ;
But wise men folly-fallen quite taint their wit.

—*Twelfth Night. Act 3. Scene 1.*

The people whose hearts are always aching
are the ones who joke most.

—*Mother by Maxim Gorky.*

সূচীপত্র

কমলাকান্তের পত্র

১

প্রসন্ন গোয়ালিনীর বাড়ী পুজা

সকাল বেলাই আফিমখোরের ঘুমের সময়, বেশ চিনি-ঘুমটি এসেছে-কি-আসেনি এমন সময় দরজায় ধাক্কা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নর মধুর গলায় কোন অনির্দ্দিষ্ট লোকের উপর গালি বর্ষণের সঙ্গীতে আমার ঘুমটা চটে' গেল, মেজাজটাও চটে' গেল—প্রসন্ন তখন বল্লে, "ওগো উঠেছ, এত বেলা হ'ল—এখনও ওঠ নি কি গো, আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে—"

সর্ব্বনাশের কথা শুনে চমকে উঠলাম—এনন অকালে ঘুম ভাঙ্গানটা সর্ব্বনাশের সূচনাই শাস্ত্রমতে বলে' থাকে; যা'হক দরজা খুলে' দিলাম, প্রসন্ন ঘরের মেঝেয় মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়ল।—বল্লাম, "হয়েছে কি, সর্ব্বনাশ কি, সর্ব্বনাশ কিসের—গরু মরেছে, না দুধ বেরালে খেয়ে গেছে?" প্রসন্ন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে একটা অযথা দুর্ব্বাক্য বলে' বল্লে—"তোমার কোন কালে আক্কেল হ'ল না, লোকে আমার অনেক পয়সা দেখেছে; কাল রাত্রিতে আমার বাড়ী ঠাকুর ফেলে দিয়ে গেছে— আমি এখন কোথায় যাই, কি করি!" আমি বল্লাম, "তা হ'লে আমার যে আক্কেল হয়নি সেটা রাগের মাথায়ই বলেচ; আমার কাছে না-হ'লে বুদ্ধি নিতে এসেছ কেন? দেখ প্রসন্ন, পরের ধন আর নিজের বুদ্ধি

সকলেই বেশী দেখে ; আর দুধে অনেক জল ঢেলেচ বা অনেক জলে দুধ ঢেলেচ, তাতে পয়সা করেচ কি না তা জানি না—তবু না হয় একবার মা'র পূজা কল্লে—তাতে ক্ষতি কি, পূজার পুণ্যি আছে ত ?" প্রসন্ন রাগিয়া বলিল—"তুমিও আমার পয়সা দেখচ, হা কপাল !" তখন আমি বল্লাম—"তবে এক কাজ কর, ঠাকুরখানার ত এখনও মুণ্ড বসেনি, ওটা একটা কাঠামই ধরিয়া লও—ওটাকে উনানজাত করিয়া ফেল, আপদ মিটে যাক !"—প্রসন্ন বল্লে, "তা কি হয় ?"—আমি বল্লাম —"এ-ও না ও-ও না—পূজো কর্ত্তেও ইচ্ছে আবার না-কর্ত্তেও ইচ্ছে, এতে আর আমি কি বলি বল।" প্রসন্ন বল্লে—"আমার যখন ইচ্ছে হয় তখন করবো, লোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জোর করে' পূজো করাবে এ কি কথা ?"—তখন আমি বল্লাম, "দেখ প্রসন্ন তুমি গয়লার মেয়ে সে তত্ত্বকথা তুমি বুঝবে কিনা জানি না—তবে আজকালকার সব পূজাই একরকম ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া পূজা বা ফেলা পূজা ; তোমার পাড়াপড়শি তোমার বাড়ী ঠাকুর ফেলে দিয়ে গেছে, আরসব না হয় তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা তাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গেছে এইমাত্র প্রভেদ,—মা'র রূপ, মা'র শক্তি, মা'র ঐশ্বর্য্য সম্যক হৃদয়ে ধারণ করে' মা'র আরাধনার কাল বহুদিন বাংলা দেশ থেকে চলে' গেছে, তা তুমি আর দুঃখ কর' না—ভক্তিভরে পূজা করগে, তোমার গয়লা-বংশ উদ্ধার হয়ে যাবে। তবে একটা কাজ কর্ত্তে হবে, একবার উকিল বাড়ী যেতে হবে—"

প্রসন্ন আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"পূজা করব ত উকিল বাড়ী যাব কেন ?—পুরুত বাড়ী বলছ বুঝি।"

আমি বল্লাম—"না না, আমি নেশার ঝোঁকে কথা কইচি না,

উকিল বাড়ীই যেতে বলছি।" প্রসন্ন হাঁ করে' রইল—আমি বল্লাম, —"হাঁ করে' থেক' না, মুখটি বুজে' আমি যা বলি তা কর—এরাজ্যে পূজার প্রথম ব্যবস্থা উকিল-মোক্তারেই করে' থাকে, তারপর পূজারীর কাজ সম্ভব হয়।" তখনও হাবা গয়লার মেয়ে বোঝে না, বল্লে, "উকীল বাড়ী পূজার ব্যবস্থা ত এই আমি নূতন শুনলাম।" আমি বল্লাম—"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী—প্রসন্ন, যে রাজ্যের যে ব্যবস্থা, আর যে কালের যে রীতি, দশপ্রহরণধারিণী মা আমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তোমার বাড়ী বিদেশ বিভুঁই থেকে আসবেন—তার একটা পয়ার করে' না রাখলে শেষে বিপদে পড়বে।"

"তোমার কথাবার্ত্তা আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না" বলে' সে গালে হাত দিয়ে বসে' রইল। আমি বল্লাম—"প্রসন্ন, তুমি যদি এত সহজে আইনের কথা বুঝতে পারতে তা'হলে আইন করাই যে বৃথা হ'ত—তা বুঝচ না। বুঝিয়ে বলি শোন—এই যে দেশটি দেখচ, যার একদিকে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী আর তিনদিকে পগার তোলা—এইটা দেশ, আর এর বাইরে যে বিশাল বাংলা দেশটা পড়ে' আছে, সেটা বিদেশ, সুদূর হিমালয়ের ত কথাই নাই ;—সেই দূর হিমালয়-গৃহ থেকে যে মা নেমে তোমার বাড়াতে আসবেন, তিনি ত বিদেশিনী বলেই পরিগৃহীতা হবেন—এই দেশে প্রবেশাধিকার লাভ কত্তে হলে তাঁর একটা ছাড়-পত্র চাই ; তারপর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে' আসবেন, বিশ জনের অধিক হলেই ত আইনের খেলাপ হয়ে যাবে। তার উপর আবার তিনি দশপ্রহরণ দশহাতে ধারণ করে' আসবেন, অস্ত্র-আইনের মধ্যেও পড়তে পারেন, এ সকল জটিল কথার মীমাংসা করবার জন্য একবার উকিলের বাড়ী যেতেই হবে।

প্রসন্ন। তুমি আফিঙের দর সস্তা দেখে এ দেশে এসে বাস কল্লে, আমি তো তোমায় বৃদ্ধ বয়সে ছেড়ে কোথায় গেলাম না, শেষে এমন দেশে এলে যে পূজা করতে গেলে উকিল বাড়ী যেতে হবে!

আমি। তা প্রসন্ন সব সুবিধা কি এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে মন্দের ভাল এই, এখানকার আইনগুলা প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে এক-একটা প্রবল হয়ে জেগে ওঠে, কোন্‌টা কোন্‌দিন জেগে উঠবে তা বলা যায় না, তাই আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।

প্রসন্ন। এই সব অদ্ভুত আইনের দরকার কি?

আমি। দেখ প্রসন্ন অনধিকার চর্চ্চা কর' না, তুমি আদার ব্যাপারী জাহাজের কি খবর রাখ? তার উপর তুমি গয়লার মেয়ে, দুধের ব্যবসাই বোঝ, রাজ্য পরিচালনার কথা কি জান?—এ যে-রাজার দেশ সে-রাজার রাজ্যে নাকি জনতা থেকেই ঘোর বিপ্লব হয়েছিল, সে আজ প্রায় দু'শ বছরের উপর, কিন্তু তা'তে কি এল্ গেল—এদের সেই দু'শ বছরের আগে যে ঘর পুড়েছিল—এরা এখনও তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। কোন রকম জটলা হলেই এরা আঁৎকে উঠেন—তা সেটা বন্ধু-ভোজনের জন্যই হউক, পূজা-পাঠের জন্যই হউক আর নৃত্য-গীতের জন্যই হউক।"

প্রসন্ন তখন হতাশ হয়ে বল্লে—"তা আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করে' উকিল বাড়ী যাই, কাজটা ভাগাভাগি করে' নাও—তুমি উকিল বাড়ী যেও, আমি পুরুত বাড়ী যাব এখন। কিন্তু এমন দেশে কি মানুষ বাস করে?"—এই বলিয়া প্রসন্ন বিষণ্ণ বদনে উঠিয়া গেল।
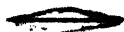
বিজয়া

সন্ধ্যার পর প্রসন্ন অতি ম্লানমুখে আমার কুটীরের দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, দূরে ঠাকুর-বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছিল ; শানাইয়ের করুণ সুর জনকোলাহল ভেদ করিয়া জানাইতেছিল—এ বৎসরের মত বাঙালীর পূজার অর্থাৎ দুর্গাপূজার উৎসব শেষ হইল।

প্রসন্ন কোন কথা না কহিয়া অতি ধীরে আমার কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া একটা গড় করিল! আমি প্রসন্নকে বলিলাম—প্রসন্ন! আজ সব ফ্যাসাদ মিটিয়া গেল ত?

প্রসন্ন। দেখ, যেদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া উঠানে ঠাকুরপ্রতিমা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে দেখিলাম সেদিন আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কত আর্ত্তনাদ করিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল কি বিপদেই পড়িলাম। আজও তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিতেছি না—কেন তখন আপনাকে এত বিপন্ন মনে করিয়াছিলাম। আজ ছুটিয়া আসিয়াছি—বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার ক্ষুদ্র কুটীর যেন কত বড় কত ফাঁকা মনে হইতেছে ; মনে হইতেছে যে, গ্রামের সমস্ত লোককে আমার উঠানে জড় করিলেও যেন সে ফাঁক ভরিয়া উঠিবে না। এমন নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান আমি কখনও কোথাও দেখি নাই। আমি সেখানে কেমন করিয়া থাকিব জানি না।

আমি। কোন্‌টা নির্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পাচ্ছ কি?—মনের ভিতরটা, না ঘরের ভিতরটা?

প্রসন্ন। কি জানি! আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই—আঁচল দিয়া প্রতিমার চরণ যখন মুছাইয়া লইলাম, তখন আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করিয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারি না—যেন আমারই মেয়ে আমার গৃহ শূন্য করিয়া স্বামীর বাড়ী চলিয়া যাইতেছে। সে কষ্ট কেমন তাহা, আমি মা নই, ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় ঐ রকমই। আমার মনে হইল, মা'র চোখেও যেন জল দেখিলাম! পাড়ার মেয়ে শ্বশুরঘর করিতে চলিয়াছে, মা'র চোখে জল, মেয়ের চোখে জল, দেখাদেখি আমারও চোখে জল আসিয়াছে, কিন্তু এমনতর কষ্ট তো তখন হয় নাই। এখন বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সব যেন শূন্য মনে হইতেছে।

আমি। এতগুলা টাকা যে বাজে খরচ হইয়া গেল, প্রসন্ন! সেটা কি একবারও মনে হচ্ছে না?

প্রসন্ন। মোটেই না। আমার মনে হইতেছে টাকা দিয়া কেনা যায় না এমন একটা-কিছু ভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম, আজ তাহা হারাইয়াছি, আর বুঝি তা কখনও ফিরিয়া পাইব না।

আমি মনে মনে এই মাতৃপূজার প্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম। বলিহারি তোমার রচনা। এই 'আভাঙ্গা' গয়লার মেয়ের মনকে কি আশ্চর্য্য উপায়ে তোমার শিক্ষা-পদ্ধতি তার এই দুনিয়ার চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্য ধনসম্পদের আবিল আবর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের দিকে তুলিয়া লইল; এ গয়লার মেয়ে স্বল্পকালের জন্যও তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশলে এমন এক

ভাব-রাজ্যে নীত হইল যে, সে আর মণিকে মণি বলিয়া মানিল না, টাকার চেয়েও একটা-কিছু বড়—একটা-কিছু প্রিয়তর ইষ্টতর জিনিষের ইঙ্গিত পাইল। বলিহারি তোমার কল্পনা। এই পার্থিব জীবনে পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-নারী সকলেরই তো ঐহিকতার অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিত্রাণ আবশ্যক। এই পরিত্রাণের কি অদ্ভুত পথই না তুমি আবিষ্কার করিয়াছ! বেদান্তের গভীর সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে যদি টোলের প্রথম পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে হইত, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই এক জন্মের সাধনায় বর্ণপরিচয়ও শেষ হইত না; কেবল তাই নয়, মানুষ তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য এক এক করিয়া চতুঃষষ্টিসহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াও বুঝি তৃপ্ত হইতে পারিত না। অথচ তাহার সে ক্ষুধা তাহাকে নিবৃত্ত করিতেই হইবে, নহিলে তাহার মুক্তি নাই। এই মুক্তি যদি তাহাকে বুদ্ধির ধাপে ধাপে উঠিয়া অর্জ্জন করিতে হইত তাহা হইলে তাহা চিরকালই অর্জ্জনের বস্তুই থাকিয়া যাইত, অর্জ্জিত আর হইত না। কেবল বুদ্ধি দিয়াই যদি তাহা অর্জ্জনসাধ্য হইত তাহা হইলে নিত্যানন্দ প্রভু লৌহহৃদয় জগাইমাধাইকে টোলে পড়িবারই পরামর্শ দিতেন, হৃদয়ের তন্ত্রীবিশেষে আঘাত করিয়া সেই লৌহহৃদয়কে কলধৌতে পরিণত করিতেন না। মানব-হৃদয়ের সেই নিগূঢ় রহস্যজ্ঞান লইয়া, হে শিল্পী তুমি যে মাতৃমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছ তাহা তুলনাতীত। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

৩

স্বপ্নলব্ধ রক্ষাকবচ

তখন একটু মৌজেই ছিলাম বলিতে হইবে, প্রসন্ন আসিয়া আমার দাওয়ায় খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিল—বলিল, গরুটা বড় ধ্যাড়াচ্ছে!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একনিমিষে ঘুরিয়া আসিয়া মনটা বেশ একটু তরতরে জলের স্রোতের মত স্নায়বিক হিল্লোলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল, প্রসন্নর গলার আওয়াজে একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—কতক তাহার কথার সায় হিসাবে এবং কতকটা স্বগত বলিয়া উঠিল—"আজকাল অনেকেই তাই কচ্চে বটে!"

তখনও প্রসন্নর মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখি নাই, যখন দেখিলাম, তখন আশঙ্কা হইল, বুঝিবা নেশার ঝোঁকে কিছু বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছি, বলিলাম, "কি প্রসন্ন! ভ্রু দুটা অমন কুঞ্চিত করিয়া আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছ কেন? আমি সজ্ঞানে আছি ত!"

প্রসন্ন বলিল—"তা বুঝতে পাচ্চি। আমি অনেকের কথা বলচি না—আমার মঙ্গলার কথা বলচি, গরুটা বড় ধ্যাড়াচ্চে—দুধ কমে' গেছে—"

আমি। হ্যাঁ সেটা ভাবনার কথা বটে—দুধ কমে' যাওয়াটা ভাবনারই কথা—কিন্তু ও-দুটা প্রক্রিয়া সঙ্গের সাথী—একটা হলেই আর-একটা 'কেন নিবার্য্যতে'। মানুষই বল আর গরুই

বল—ধ্যাড়ালেই অর্থাৎ দেহের রসের পরিপাক না হলেই—বুদ্ধি কম হবে, কাজ কম হবে, ফসল কম হবে, দুধ কম হবে—যার যেমন। কারণ শাস্ত্র বলেচেন—রসো বৈ সঃ, তিনিই রস, তিনিই গরুর বাঁটের দুধ—শিল্পীর রসোদগার, বিশ্বপ্রপঞ্চের সুসার, সৌন্দর্য্য।

প্রসন্ন। নাও কথা—এখনও ঘোর কাটেনি দেখচি—বলি গরুটার একটা ওষুধবিষুধ বাৎলে দিতে পার—যাতে তোমার ঐ রস না মাথা পরিপাক হয়ে যায়?

আমি। প্রসন্ন তুমি আমাকে এতদিনেও চিনলে না ত, এইটেই সবচেয়ে নিদারুণ ছুরিকাঘাত—(cruellest cut of all). আমি কি গো-বদ্দি? মানুষের ও-রোগ হলে বরং একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু গরু—ছি প্রসন্ন, তোমায় আবার বলি আমি গো-বদ্দি নই।

প্রসন্ন একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, হাজারহোক নিছক গয়লার মেয়ে বইত নয়, বল্লে—"কেউটে ধরতে পার আর হেলে ধর্ত্তে পার না; মানুষের বদহজম নিবারণ কর্ত্তে পার আর গরুর পার না?"

আমি। দেখ—আজ দেশসুদ্ধ সব বদহজমে ভুগছে, মন আর দেহ দুই শীর্ণ হয়ে যাচ্চে, রসের পরিপাক হচ্চে না, গায়েও গত্তি লাগচে না, মনেও নয়। বিরুদ্ধ ভোজন, অভোজন, স্বল্পভোজন — এ সবই বদহজমের কারণ।

প্রসন্ন। আমি তোমায় বদহজমের নিদান আওড়াতে বলচি না গো, কবিরাজ মহাশয়, আমাকে একটা উপায় বলে' দাও, গরুটা যাতে বাঁচে, দুধটা রক্ষা হয়—

হাজার হোক মেয়ে মানুষ, তাতে গয়লার মেয়ে, আমি যত

বিজ্ঞানটাকে বড় করে' দেখতে চাই, সে তত গোঁজে-বাঁধা-গরুর মত ঘুরে ঘুরে গোঁজের গোড়ায় চলে' আসে—অতএব গতিরুদ্ধ হয়ে, আমাকে গরুকেই কেন্দ্র করে' ভাবতে হ'ল আবার নেশাখোর বলে' গাল দেবে—আমি ঐ গালটা বড় বরদাস্ত করতে পারি না।

আমি বলিলাম—প্রসন্ন, কতরকম টোটকা আছে, তুক আছে, মাদুলী আছে, তাই একটা শিঙে বেঁধে দাও না, কিছুই কর্ত্তে হবে না—সব সেরে যাবে।

প্রসন্ন একেবারে আগুন হয়ে উঠল—তবে সে মেয়েমানুষ আগুন, খুব ভয়ের আগুন না হলেও যখন দপ করে' জ্বলে উঠে তখন ভয় লাগিয়ে দেয় বটে, বল্লে—"আমি টোটকা ফোটকা বুঝিনে—ওসব বুজরুকিতে কিছু হবে না—শেষে একদিন দেখবে, গরুর হাড় জুড়িয়ে গেছে, আর তোমার দুধ খাওয়াও ঘুচেচে।"

আমি একেবারে দমে' গেলাম—গয়লার মেয়ে টোটকা মানে না, মাদুলী মানে না, হল কি? বলিলাম—"প্রসন্ন তুমিও কি হাল ফ্যাসান মত কেবল বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান বই কিছু চাওনা নাকি?—কিন্তু তুমি কি বুঝ, ঐ ওদের বিজ্ঞানের ভিতর কতটা টোটকা আর কতখানি বিশিষ্ট জ্ঞান!"

প্রসন্ন। আমি অত বুঝতে চাই না, আজকাল গরুর গা ফুঁড়ে ওষুধ দেয়, আর গরু সেরে যায়, তার একটা ব্যবস্থা করতে পার?

আমি। সেটাও টোটকা তবে ভিতরের টোটকা, আর মাদুলি বাইরের টোটকা, এইমাত্র প্রভেদ। কিসে কি হয় তা যখন কোনটাতেই ঠিক জানা নেই, তখন ছুঁচের ডগা শরীরের ভিতর চালাইয়া দাও, আর বাহিরে গলায় মাদুলি করিয়া ঝুলাইয়া রাখ একই

কথা—শরীর-মনের দেবতা যদি ঔষধ গ্রহণ করিলেন ত ঔষধ ফলিল—আর না গ্রহণ করিলেন ত সব ঔষধ ভাসিয়া গেল। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ঔষধ গ্রহণ করান যখন মানুষের সাধ্য নহে—তখন মাদুলিও যা আর বিজ্ঞানসম্মত ঔষধও তাই। প্রসীদ প্রসীদ বলে' জীবনদেবতাকে প্রসন্ন কর, আর মাদুলি পর—এই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রসন্ন। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না—মিছে রাগ করিয়াই বা কি করি বল—প্রসন্ন হতাশ হইয়া বসিয়া রহিল।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম—প্রসন্ন, যাদের দেশে বিজ্ঞান রসায়ন ইত্যাদির বহু স্ফুরণের ফলস্বরূপ গতযুদ্ধে শত শত লোক মরিল—তাহাদের দেশে প্রতিদিনের কার্য্যে, গৃহস্থলাতে, সমাজে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, বেচাকেনার মধ্যে কত টোটকা, পদক, রক্ষাকবচ, Mascot ব্যবহার হয় তা তুমি জান? তুমি একেবারে বিজ্ঞানভক্ত বিদুষী হইয়া উঠিয়াছ, মানুষ যতদিন না সর্ব্বশক্তিমানের যুড়া হইয়া উঠিতেছে, ততদিন এসব চলিবেই চলিবে, তা কি তুমি জান? রোগ হইলে ডাক্তার ডাক—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই, ডাক্তারটা একটা চলতি রক্ষাকবচ মাত্র, রোগমুক্ত হওয়া-না-হওয়া যে দেবতার অনুগ্রহ, তাঁহার সহিত পরিচয় ডাক্তার বাবুর নাই, তবে তিনি উপস্থিত হইলে তুমি বেশী একটু বল পাও, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পার এইমাত্র; সব টোটকার উদ্দেশ্যও তাই—তোমাকে বল দেওয়া, ধৈর্য্য দেওয়া, দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার অধ্যবসায় দেওয়া ইত্যাদি।

প্রসন্ন এতক্ষণ হাবুডুবু খাইতেছিল, এখন একেবারে তলাইয়া গেল, কোন্ দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"প্রসন্ন, অমন চুপ করিয়া থাকা ত তোমাদের স্বধর্ম্ম নহে, যা-হয় একটা-কিছু বল, নহিলে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাই।" প্রসন্ন একেবারে মুখে ওলপ দিয়াছিল।

আমি বলিলাম—প্রসন্ন, দেখ তোমার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ দেওয়ায় বিপত্তিও আছে—অনেক সময় চিকিৎসাবিভ্রাটও হয়, বিপরীত চিকিৎসাও হয়—মাদুলি বা টোটকায় সে আশঙ্কা একেবারেই নাই। লাগিল যদি ত দৈবানুগ্রহে একেবারে রাতকে দিন করিয়া দিল—আর না লাগিল যদি ত কোন আশঙ্কা নাই। বিরুদ্ধ কিছু হইবার আশঙ্কা মোটেই নাই। একটা বিজ্ঞানের ঢেউ আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সনাতন ধর্ম্মের দেশ, অনেক ঢেউ কাটাইয়া আমরা আজ তিন হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছি—এ ঢেউটাও কাটাইয়া উঠিব। এই দেখনা সমগ্র দেশটায় যে অজীর্ণ রোগ ধরিয়াছে, ভালমন্দ কিছুই পরিপাক হইতেছে না—দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া যখন বোমা ফাটিল তখন একে আর হইয়া দাঁড়াইল। এখন দেশের মাথা যাঁরা, তাঁরা সকলেই বুঝিলেন যে বিজ্ঞান সম্মত হইলে কি হয় ওটা আমাদের ধাতুসম্মত নহে, অতএব পরিত্যাজ্য। সে পথ ত্যাগ করিয়া দেশের রাজাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈলাক্ত করিয়া (constitutional agitation) কার্য্য হাসিল করিবার ধূম পড়িয়া গেল—তাহার ফলে নূতন কাউন্সিল গড়িয়া উঠিল, তাহাও আজ মাকাল ফল বলিয়া পরিত্যাজ্য মনে হইতেছে, যে হেতু সেটাও আমাদের শরীর ধাতুর (constitution) অনুকূল নহে। কিন্তু এইবার যে 'পথ আবিষ্কৃত

হইয়াছে, প্রসন্ন, আর ভাবনা নাই, এই পথ প্রকৃষ্ট পথ, আমাদের ধাতুর অনুকূল পথ, আমাদের সনাতন পথ,—দেবতার শরণাপন্ন হও, আর মাদুলি পর, এপথে কোন ভাবনা চিন্তা নাই, বিপরীত ফলোদ্গমের কোন আশঙ্কা নাই, শত সহস্র লোক এই পথ অনুসরণ করিয়াছে, আর ভাবনা নাই।

প্রসন্ন হঠাৎ উঠিয়া তীরবেগে আমার উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল—"গরুটা ভাগাড়ে যাক, ভাল করে' দুধ খেয়ো 'খন"—এই বলিয়া আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি দেখিলাম—আমার উঠানটা ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত বিরাট হইয়াছে, কত নদনদী, কত পর্ব্বত, কত বন, কত নগরনগরী, কত গ্রাম, কত কুটীর, কত নরনারী কিলিকিলি করিতেছে, সব গান্ধীর টুপী পরিয়া, খদ্দর পরিয়া, নিশ্চিন্তমনে আপনাপন ছোটবড় কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আকাশ বাতাস ভরিয়া গান্ধীর নাম উচ্চারিত হইতেছে—সকলের গলায় এক এক গান্ধী-রক্ষাকবচ।

৪

মেকি

প্রসন্ন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"দেখ গা, কে আমার মাথা খেতে একটা মেকি টাকা দিয়েছে—চলচে না, কেউ নিচ্চে না, কি করি বল দেখি ?"

আমি। রোখ শোধ হ'য়ে গেছে, প্রসন্ন ; তুমি যেমন মেকি দুধ চালিয়েছ, সেও তেমনি মেকি টাকা দিয়েছে, মন্দ কি ? আঘ্রাণের মূল্য আওয়াজ, গন্ধের মূল্য শব্দ—সে গল্প ত জান—তেমনি জোলো দুধের মূল্য, মেকি টাকা, তা' ত ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু মেকি চলচে না, এটা ত নূতন কথা শুনলাম—চলতে চলতে তোমার কাছ পর্য্যন্ত এসে কি তার দম ফুরিয়ে গেল—তা'ত হতেই পারে না।

প্রসন্ন অভিমান-ভরে বলিল—আমি জোলো দুধই তোমায় খাওয়াই কি না ?—নেমকহারামি কোরো না।

আমি বলিলাম—না প্রসন্ন খাঁটি যদি কিছু থাকে ত সে তোমার দুধ, আর আমার আফিম, আর সবই ঝুটা।

প্রসন্ন। নাও, তোমার বাজে কথা রাখ, এখন টাকাটার উপায় কি করি বল দেখি ?

আমি। দেখ, আমরা তখন ছোট, আমাদের পাড়ায় এক বুড়ী ময়রাণী ছিল, সে যত অখাদ্য খাবার তৈরী করত, একদিন

তাকে বল্লাম, হ্যাগা তোমার এসব লক্ষ্মীছাড়া খাবার কেউ কেনে? সে বল্লে, 'বাবু জন্মালে মৃত্যু আছেই, ও-গুলা লক্ষ্মীছাড়াই হ'ক আর লক্ষ্মীমন্তই হ'ক যখন জন্মেচে তখন মরবেই।' তোমাকেও তাই বলি জন্মালে মৃত্যু আছেই ; এ আজব দুনিয়া ; যখন টাকাটি জন্মেছে, আর চলে' চলে' এতদূর এসেছে, তখন আরও অনেক দূর যাবেই।

তবে মেকিকে মেকি বলে' সত্য সত্য জানলে আর চলে না। মেকি বলে' জেনেচ কি অচল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মেকি বা মায়া বলে' বুঝেছ কি আর বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমার কাছে না-থাকার সামিল ; তুমি যে-মুহূর্ত্তে টাকাটাকে মেকি বলে' সন্দেহ করেচ অমনি তোমার কাছে সেটা আর টাকা নয়, টাকার রূপ থাকলেও সেটা টাকা ছাড়া আর-কিছু।

এখন কথা হচ্চে টাকাটি তোমার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিল কি প্রকারে। হয় কেউ মেকি জানিতে পারেন নাই নচেৎ না-জানার ভান করিয়াছেন, আর সাচ্চা টাকার দলে মিশাইয়া অন্ধকারে চালাইয়া দিয়াছেন। এই রকম করিয়া তোমাকেও চালাইতে হইবে। এই রকম করিয়া কত বড় বড় মেকি চলিয়া গেল। গেলিলিও অঙ্ক পাতিয়া জানিলেন যে পৃথিবী স্থিরা নহেন ; কিন্তু যতক্ষণ না তাহা না-জানার ভান করিলেন, ততক্ষণ তাঁর অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগৃহ হইতে অব্যাহতি হইল না। পৃথিবী অচলা এই বিশ্বাসের ভান করিবামাত্র তিনিও আলোর মুখ দেখিলেন, আর চিরদিনের মেকি মতটাও চলিতে থাকিল।

তোমরা যে টিপ পর, কাজল পর, পাতা কাট, আল্‌তা পর, গহনা পর, রঙীন শাড়ী পর—এটা কতখানি মেকি চালাইবার সরঞ্জাম

তা ত বুঝিতে পার ? আর এই সকল উপায়ে ত মেকি চলিয়াও যায় ! পরচুলা ও বাঁধান দাঁত, corset ও cosmetic, সে'ও ত চলে ! কেন চলে ? যে দেখে সে দেখিয়াও দেখে না, বা না-দেখার ভান করে—আর যে দেখায় সে সত্যকার দেখাটাকে ধূপছায়ার মধ্যে, আলো-আঁধারের মধ্যে যতটা পারে এড়াইবার চেষ্টা করে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে কত টিকি, তিলক, বহির্বাস চলে' যাচ্চে; কত public spirit, philanthropy চলে' যাচ্চে, ঐ পথে মেকি টাকাটা ত চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিয়া যাইবে, তুমি ভেব' না।

প্রসন্ন। তা বলে' কি লোকে ঘসে-মেজে-বাজিয়ে দেখে নেয় না বলতে চাও ?

আমি। সে দিকে, জীবনটা বড় ক্ষুদ্র যে প্রসন্ন, বাজিয়ে দেখতে দেখতে বাজি ভোর হ'য়ে যাবে, এ সুদীর্ঘ পথ আবার বাজিয়ে দেখতে দেখতে ফুরাবে না। আর বাজিয়ে দেখাও কি সোজা আর সুখের মনে কর ? বাজিয়ে দেখতে দেখতে যে কত মেকিই ধরা পড়ে যাবে তার ইয়ত্তা আছে কি ? সব ঝুটা হ্যায়—বলে' শেষে মানুষ পাগল হ'য়ে যাবে যে !

আর ঘসে-মেজে নেবারই যদি চেষ্টা করা যায় যেমন বিবেকের কষ্টি-পাথরে গিল্টি ধরা পড় পড় হয়েছে, অমনি চারিদিক থেকে হা হা করে' বলে' উঠবে—ওটা অপৌরুষেয় বেদবাক্য, ওটা mystery, ওটা লীলা, ওখানে ও কষ্টি-পাথর চলবে না ; ওখানে হৃদয় দিয়ে দেখতে হবে, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। অথবা—ওটা expediency বা practical politics, ওখানে অত idealistic হ'লে চলবে না। তুমি সেখানে কোন্‌টা মানবে ; দশজন ভক্তের রোমকষায়িত রক্ত-

চক্ষুগুলি মানবে, না তোমার বুদ্ধিকে মানবে? তুমি, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে' সুখের চেয়ে স্বস্তিকে, বোঝার চেয়ে অন্ধকারকেই বরণ করে' নিয়ে চির অন্ধকারের প্রতীক্ষায় বসে' থাকবে!

প্রসন্ন। তবে উপায় কি স্পষ্ট করে' বল না, আমি তোমার ও-সব কথা বুঝতে পারি না।

প্রসন্নর মত ধীর শ্রোতা পাইলে অনেকেই বক্তা হইতে পারিতেন এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বুঝিতে পারে না অথচ স্থির হইয়া শুনিয়া যায় এমন শ্রোতা কি মিলে? খুব ভক্তি অথবা খুব ভয়, অথবা দুই-এর সমবায় হইলে, তবে না বুঝিলেও লোক স্থির থাকিতে পারে; এখানে ভয়ও ছিল না ভক্তিও ছিল না, কেন না প্রসন্ন ভয় করিবার মেয়ে নয়,—আর আমার মত নীরস আফিংখোরকে ভক্তি করিবে কে?

প্রসন্ন। ওগো একটা উপায় বল, আমার ষোল ষোল আনা পয়সা জলে যাচ্চে? বেটারা দুধ খেয়েচে না····· খেয়েচে।

আমি। হাঁ তাই না হয় খেয়েচে। কিন্তু প্রায় বিনামূল্যে, তাতে তাদের তত বেশী লোকসান হয় নি যত তোমার হয়েচে। তুমি যদি টাকাটি চালাতে চাও ত চিরন্তন প্রথা অনুসারে, চক্ষু বুজিয়া গোটাকতক ভাল টাকার সঙ্গে মেকিটাকে চালাইয়া দাও, সৎসঙ্গে কাশীবাস, দশটার সঙ্গে চলিয়া যাইবেই। আর যদিই বা ধরা পড়, 'অবাক করেচে মা' বলিয়া আকাশ থেকে পড়িও, একটু আর্ত্তনাদ করিও, এবং বারান্তরে অন্যত্র চেষ্টা করিও—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রসন্ন। আমার ভয় করে, কে কি বলবে, কি মনে করবে!

আমি। তা হ'লে হবে না, বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে—বুক ফুলিয়ে চলতে হবে; এটাও একটা মেকি চালাবার প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুলবাসী গোপগোপীগণকে ইন্দ্র-দেবের বর্ষণবন্যা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা যদি বেদব্যাস বেপরোয়া হ'য়ে না বলিয়া, একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন, যে শ্রীকৃষ্ণের হাতের কব্জিতে পরদিন একটু চুনে-হলুদ দিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে তা'তে তাঁর বলবত্তার কিছুই কমি হইত না বটে, কিন্তু তাহার ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ণ লীলা না হইয়া বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব মধ্যে পড়িয়া যাইত; বেদব্যাসের অসমসাহসিকতার ফলে উহা তর্কের অতীত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ভয় পাইলে সব মাটি হইয়া যাইবে।

আর আগে যে সঙ্গ বা সঙ্ঘের কথা বলেছি—অমন মেকি চালাবার উপায় আর দুটি নেই। বুদ্ধদেবের আমল হ'তে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত কত সঙ্ঘ গেছে এসেছে, অমন মেকি চালাবার আড্ডা আর কোথাও হবে না। সাচ্চা লোক কেউ-না-কেউ সব সঙ্ঘেই ছিলেন, কিন্তু সেটা সঙ্ঘের গুণে নহে, সঙ্ঘ ছিল তাঁদের গুণে, একটার গুণে দশটা মেকি চলে' যেত ও যাচ্চে, আর দশটা ভাল টাকার সঙ্গে তোমার একটা মেকি চলবে না?

প্রসন্নর মন উঠিল না, সে বোকা গয়লার মেয়ে বলে' উঠল—অত-শতয় কাজ নেই, আমার পয়সা ত জলেই গেছে, আমি টাকাটা পুকুরের জলে ফেলে দেব, আপদ নিশ্চিন্দি!

৫

আঁটকুড়ী

আমি। তুমি অত রাগ করছ কেন তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না, প্রসন্ন।

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, তার গর্জ্জন তখন বর্ষণে পরিণত হইল। বুঝিলাম ব্যাপার কিছু গুরুতর; কারণ প্রসন্নকে শরতের নির্জ্জলা লঘু মেঘের মতো গর্জ্জন করিতেই শুনিয়াছি, বর্ষণ করিতে দেখি নাই। আর সে-মেয়ে গর্জ্জনেই কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছে, শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগের তার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। আজ তাহাকে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—বল কি গো, তুমি আমার রাগও বুঝনা, দুঃখও বুঝনা? আমাকে আঁটকুড়ী বলিয়া গাল দিল তা'ও বুঝনা? কেবল আফিং বুঝ আর মৌতাত বুঝ বুঝি?

আমি। তা বুঝি বৈকি; মিথ্যা বলি কেমন করে'! কিন্তু কি জান, হুকুমে রাগও হয় না, অনুরাগও হয় না। তুমি ক্রোধে অধীর হয়েছ বলে' কি আমিও তোমার মতো লাফাব?

প্রসন্ন। তা'ত বটেই, আমাকে আঁটকুড়ী না বলে' তোমাকে আঁটকুড়ো বলত যদি ত দেখতাম।

আমি। বলতই যদি, তুমি মনে কর কি আমি অমনি তোমার

মত ধেই ধেই করতুম? আচ্ছা আমাকে বল দেখি—তোমার ক'টি ছেলে?

প্রসন্ন। একটিও না।

আমি। ক'টি মেয়ে?

প্রসন্ন কর্কশ-কণ্ঠে বলিল—একটিও না—তা বলে' কি আবাগীরা আমাকে আঁটকুড়ী বলবে? ছেলে-মেয়ে হওয়া-না-হওয়া কি মানুষের হাত?

আমি। হাত যারই হ'ক, হয়নি যখন তখন হয়েছে বলা ত আর চলে না? তোমাকে কেউ যদি পুত্রবতী, জেয়ঁচ বলে—সেটা তুমি গালি বলে' না নিলেও বিদ্রূপ বলে' নিতে ত? বিদ্রূপ ত গালাগালিরই ছোট ভাই। সেইটাই বা কি করে' সহ্য করতে?

প্রসন্ন। তাই বা বলবে কেন?

আমি। তবে কি বলবে? ছেলে হয়েছে ত বলবে না, হয়নিও বলবে না! তোমার একটা স্বরূপ বর্ণনা ত আছে?

প্রসন্ন। তুমি যেমন ন্যাকা! ছেলে হয়নি আর আঁটকুড়ী বুঝি এক কথা?

আমি। ঠিক এক কথা নয় বটে; হয়নি বলে' তুমি যেন একটু ছোট, যেন একটু অপরাধিনী, অভাগিনী; আর যিনি বলেচেন, তাঁর ছেলে হয়েছে বলে' তিনি একটু বড়, একটু ভাগ্যবতী, এইটে যেন তিনি তোমাকে স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলেচেন, এইত? কিন্তু গোড়াকার কথাটা ত সত্য?

প্রসন্ন। সত্যি হলেই বুঝি সব হ'ল? বলার কি একটা ধরণ নেই?

আমি। ধরণ আছে বৈ কি? কিন্তু ধরণটা চাঁচাছোলা করবার জন্যে ত আর সত্যটাকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে না।

প্রসন্ন। তা বলে' কানাকে কানা, আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলে' তাদের মনে কষ্ট দেওয়া বুঝি তোমার শাস্ত্র?

আমি। না তা নয়, খোঁড়াকে দেখলেই—ওরে খোঁড়া, আর কানাকে দেখলেই—ওরে কানা বলে' সম্বোধন করতে হবে, তা বলচি না; কিন্তু তাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ধরণের খাতিরে কানাকে ত পদ্মলোচন, আর খোঁড়াকে গিরিলঙ্ঘনকারী বলা চলে না। সেটা বিদ্রূপও বটে অসত্যও বটে।

প্রসন্ন। তা বলে' কাটখোট্টার মত কেবল লোকের বুকের উপর দিয়ে চাবুক চালালেই বড় বাহাদুরী হয়, না? লোকে চোয়াড় বলবে না?

আমি। হয়ত বলবে। কিন্তু লোকে যদি বিচার করে' দেখে ত দেখবে, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়া বিনীতদের হাতে যত ঠকেচে চোয়াড়দের হাতে তার সিকির সিকিও ঠকে নি, চোয়াড়দের চিনতে, তাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে, আবশ্যক হ'লে তা হ'তে আত্মরক্ষা করতে, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না; কিন্তু বিনীতের মোলামত্বের অতলস্পর্শ ভেদ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই হাবুডুবু খেতে হয়, অনেক সময়ে তলিয়ে যেতে হয়। আমি বিনীতদের বড় ভয় করি—তারা বিনয়ের chloroform দিয়ে আমার কোন মর্ম্মস্থলে ছুরিখানি বেমালুম চালিয়ে দিয়ে বসবে, আমি জানতেও পারব না। সরলতাই যাদের বিনয়, তাদের কথা বলছি না। সাধারণতঃ বিনয় মানে, সবটা না-বলা বা বিষম ঘুরিয়ে বলা;

কোদালকে 'মৃত্তিকা-খনন-যোগ্য-যন্ত্র-বিশেষঃ' না বলে' 'কোদাল ইতি ভাষা' বল্লেই সর্ব্বনাশ। মনুষ্য প্রকৃতির সহ্য করবার দিক দিয়ে দেখলে, indirect ও direct taxationএ যে প্রভেদ, বিনয় ও স্পষ্টবাদিতায়ও তাই। Direct taxএর সূচীবেধ মানুষ সহ্য করবে না, পরন্তু indirect taxএর সমগ্র ফালটা চলে' গেলেও টুঁ শব্দ করবে না। তেমনি একবিন্দু সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'লে মানুষ শিউরে উঠবে, কিন্তু এক জালা মিথ্যা বিনয়ের শর্করা মিশ্রিত হ'লে চিনির পানা বলে' সমস্তটাই পান করে' ফেলবে।

প্রসন্ন একেবারে নিস্তব্ধ। আমি বলিলাম—প্রসন্ন, আঁটকুড়ী বলেছে বলে' তোমার গায়ে ঝাল লেগেছে কেন জান? কথাটা সত্য বলে'; তবে অপ্রিয় সত্য। কিন্তু সত্যের চেয়ে অপ্রিয় কিছু আছে কি? সত্য বলতে অপ্রিয়, সত্য শুনতে অপ্রিয়; 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—এ উপদেশ যদি মানতে হয়, ত সত্য বলাই হয় না। করুণা যে করে, আর করুণা যে পায়, উভয়ে ধন্য হয়—সে কেবল এ সংসার দুঃখের সংসার বলে'। তেমনি, সত্য যে বলে, আর যে শোনে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কষ্ট পায়—সে কেবল এ দুনিয়া মিথ্যার রাজ্য বলে'; এই মিথ্যার রাজ্যে তাই আদবকায়দার দরকার, সত্যরূপ কুইনাইনপিলকে আদবকায়দার শর্করাপ্রলেপ দিয়ে চালিয়ে দেবার জন্য। আমার ধারণা প্রকৃত সত্যরাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে, etiquette বলে' কিছু নেই, আদবকায়দা বলে' কিছুর প্রয়োজনই নেই। সেখানে কায়মনোবাক্যে দেবতারা সত্য ভিন্ন আর কিছুর আদানপ্রদান করেন না। তাঁরা সত্য বলেন, সত্য শ্রবণ করেন, সত্য মনন করেন, সত্যকে ধারণ করতে পারেন; তাঁদের আদব-

কায়দা বলে' যদি কিছু থাকে তাহাও সত্য; একটা অবগুণ্ঠন নয় আবরণ নয়। আর মানুষ সত্যের অনাবৃত জ্যোতি বরদাস্ত করতে পারে না বলে' একটু আদবকায়দার কুজ্ঝটিকায় ঢেকে তার প্রখর রশ্মিজালকে সংহত ম্লান করে' তাদের ক্লিষ্ট হৃদয় ফলকের উপযুক্ত করে' নেয়। সত্যের প্রকট উজ্জ্বল আলোক সহ্য করবার অক্ষমতাই আদবকায়দার আকাঙ্ক্ষাকে সৃজন করেছে।

প্রসন্ন তখনও নিস্তব্ধ।

আমি বলিলাম—রমণি, তোমার বক্ষে হাত দিয়ে দেখ, তথায় যে অমৃতের উৎস তোমার যৌবনের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত পরিপুষ্ট হ'য়ে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করেছিল, সন্তানের কুসুম-কোমল ওষ্ঠপুটে সংলগ্ন হয়ে সে অমৃতধারা যে তার শোণিতপ্রবাহ পরিপুষ্ট করে নি, তা'তে কি তোমার নারীজীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায় নি? প্রকৃতি তোমাকে নারী করেছিল কেন? পুরুষ বা নপুংসক করে' নি কেন? তুমি সন্তান ধারণ করবে, পালন করবে, পরিপোষণ করবে, এইজন্য। প্রকৃতি তোমাকে তাঁর সৃষ্টিরক্ষার যন্ত্র হিসাবে সৃজন করেছিলেন। তারপর, সমাজ তোমাকে না-হয় গোপজাতি, অমুকের কন্যা, অমুকের পত্নী করেছে; কিন্তু তুমি যে-জাতিই হও, যারই কন্যা হও, যারই পত্নী হও বা কারো পত্নী না-হও, তুমি মাতা হবার জন্যই রমণী হয়েছিল; আর তোমার জন্মের মৌলিক উদ্দেশ্য তোমা হ'তে সাধিত হয়নি বলে', ভাল শুনাক আর নাই শুনাক, সত্য সত্যই তুমি প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে' আজ আঁটকুড়ী!

প্রসন্ন এতক্ষণে মুখ খুলিল, কেননা, আঁটকুড়ী কথাটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না।

প্রসন্ন। মেয়েমানুষকে বিয়েই করতে হবে, আর ছেলে বিয়োতেই হবে, তারই বা মানে কি?

আমি। প্রসন্ন, আমার মত বুড়ো ভূশুণ্ডীকে আর ও-প্রশ্ন কর' না; অর্ব্বাচীনদের ও হেঁয়ালি বলে' ধাঁধা লাগাতে চেষ্টা কর'। সাত পাক্ দিয়ে বিয়ে করতে হবে কি না হবে, সেটা সমাজ বুঝবেন; কিন্তু মেয়েমানুষকে বিয়ে করতেই হবে—তা সাত পাকেই হ'ক, বিনি পাকেই হ'ক, আর বিপাকেই হ'ক। আর যতদিন পুরুষের উরুদেশ ভেদ করে' সন্তানের জন্ম, ও তর্জ্জনী হ'তে দুগ্ধক্ষরণ উপন্যাসের পৃষ্ঠা হ'তে নেমে এসে এই বাস্তবজগতে সত্য হ'য়ে না উঠবে, ততদিন মেয়েমানুষকে ছেলে বিয়োতেই হবে, আর ওটা একমাত্র তাদেরই কৃত মধ্যে পরিগণিত থাকবে।

প্রসন্নর চোখ তখন আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল—তবে কি যার ছেলে হ'ল না সে একেবারে দুনিয়ার বার হ'য়ে গেল? অনেক পুত্রহীনা কত সদাব্রত, কত দেউল, কত পুষ্করিণী করে' দিয়েছে, তা'তে কি লোকের উপকার হয় নি? কত পুত্রহীনা নারী ধর্ম্মের পথে, লোকহিতের পথে, কত কীর্ত্তি রেখে গেছে সেগুলা কি অপুত্রক বলে' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়?

আমি। তা কেন? এই তুমি, আঁটকুড়া হয়েও বা হয়েচ বলেই, এই যে নিরালম্ব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করছ, তাতে কি আমার উপকার হচ্ছে না, না তোমারই পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে না? যদি ক্বচিৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে—আমার এই দিগন্তবিস্তৃত বিদগ্ধ জীবন-মরুপ্রান্তরে তুমি যে ফলহীন রসাল, একক আমার মাথার উপর রোদ্রে শিশিরে পল্লবাস্তরণ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তার

কি মূল্য নাই? কিন্তু গাছে যখন ফল ধরে নি, তখন তার বৃক্ষ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অপূর্ণ থেকে গেছে, তা'ত বলতেই হবে। এখন গাছটাকে কেটে চেলাকাঠ করলেও হয়ত, কুমারের হাঁড়ি পুড়বে, ভাত সিদ্ধ হবে, চিতা জ্বলবে, একটা-না-একটা কাজে লাগবেই, কিন্তু তা'তে আম্রফলের রসাস্বাদ মিলবে কি?

নারীর অনেক কীর্ত্তি আছে, সেগুলা পুরুষের হলেও বিশেষ প্রভেদ হ'ত না। কিন্তু সুসন্তান প্রসব করে' তা'কে লালনপালন করে' নারী তা'কে মানুষ করে' তুলল, সে কীর্ত্তি তার একদিকে যেমন ভগবৎ প্রেরণা সম্পূর্ণ করল, অন্যদিকে তার নারীজীবনও সার্থক হ'ল। এর মত নারীর কৃত্য ও কীর্ত্তি আর কিছুই নাই।

প্রসন্ন মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করে' উঠে গেল; তারপর আমার সঙ্গে সে তিনদিন কথা কয় নি, কিন্তু ঠিক সময়ে দুধ দিয়ে যেত, একটি মিনিট এদিক-ওদিক হ'ত না।

২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

৬

সেবা

কামধেনু সংস্কৃতভাষার দৌলতে বাক্ ও অর্থের মধ্যে কোন নিত্য সম্পর্ক নাই ; কুলীন ব্রাহ্মণের বহুপত্নীর ন্যায় এক কথার বহু অর্থ। সুবিধামত যে কোন একটার সহিত কথাটা যোজনা করিয়া দেওয়া চলে। তবে উভয়ত্রই অর্থসঙ্গতির অভাব ঘটিলেও তর্ক কচ্‌কচির অভাব হয় না।

সেবা অর্থে পরের সেবাও বুঝায়, নিজের সেবাও বুঝাইতে পারে। ঠাকুরের সেবা অর্থে ঠাকুর ও পুরোহিতের উভয়ের সেবাই বুঝায় ; অর্থাৎ খাওয়া ও খাওয়ান দুই বুঝাইতে পারে এবং কার্য্যতঃ দুইই বুঝাইয়া থাকে।

প্রসন্নর বাড়ী দুর্গা প্রতিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সব ঠাকুরই লোকে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। নিঃসন্তান প্রসন্ন কার্ত্তিকের সেবা করিয়া ধন্য হইবে, এইজন্য পাড়ার লোকের ঘুম হয় নাই, তাই তাহারা বৎসরের শেষ ঠাকুরখানিও ফেলিতে ভুলে নাই। প্রসন্ন করিবে সুব্রাহ্মণের সেবা, আর গ্রামের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলে সেবা লইবেন, ইহাই যে সেবার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। যাহা হউক বলিহারি বোকা গয়লার মেয়েকে! সে সেই সব-প্রথম ঠাকুর ফেলার বেলা একটু যা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তারপর বারবার এ উৎপাতে সে

একেবারেই বিচলিত হয় নাই। ফেলা-ঠাকুরের পূজা যেন তাহার মৌলিক প্রথাই হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রত্যেক পূজাটাই সে খুব সমারোহের সহিত করিয়াছিল, গ্রামসুদ্ধ লোককে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কষ্টার্জ্জিত পয়সার প্রতি সে কি জন্য এত নির্ম্মম হইয়া উঠিল তাহা বুঝা গেল না; তবে ইহা বেশ বুঝা গেল সে যে ঠিক কত পয়সার মালিক চোরেও তা'র সন্ধান পায় নাই নতুবা এই ঘোরাল উপায়ে তাহার সৎকার করাইতে হইত না।

কিন্তু এত করিয়াও পাড়ার লোকে প্রসন্নকে নিশ্চিন্ত হইতে দিল না। যে সকল ষণ্ডামার্ক যুবকদের দল তাহার প্রতিমা পূজায় সহায়তা করিয়াছিল—মেরাপ বাঁধিয়া, তালপাতার ঘর করিয়া দিয়া, রন্ধন পরিবেশন ইত্যাদি ভূতের মত, রাত নাই দিন নাই, খাটিয়া ঠাকুর-সেবার সহায়তা করিয়াছিল—তাহারা এখনও প্রসন্নকে ছাড়ে না—বলে, তাহাদের একদিন ভাল করিয়া না সেবা লইলে তাহার সব পূজা পণ্ড, পাঠ পণ্ড, লোক-সেবা পণ্ড; যেহেতু তাহারা না থাকিলে তাহার এত করিত কে?

মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি, অর্থাৎ স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত নয়। অতএব আমি আফিংএর মৌতাতেই থাকি আর সজ্ঞানেই থাকি, আর আমার দ্বারা তাহার পরিত্রাণ সম্ভব হউক আর না হউক, প্রসন্নর মাথা আটকাইলেই আমার কাছে ছুটিয়া আসিবেই আসিবে। তাই দুধ দিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাকে আসিতে দেখিলেই আমি বুঝিতাম—প্রসন্নর মাথা আটকাইয়াছে।

ঠিক-দুপুর বেলা প্রসন্ন এক পাল পাড়ার ছেলে লইয়া আমার উঠানে আসিয়া উপস্থিত।—ব্যাপার কি?

প্রসন্ন। আর ব্যাপার কি—আমাকে ত ছিঁড়ে খেলে। দেখ যদি উপায় করতে পার।

প্রসন্ন এই বলিয়া আমার দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

১ম যুবা। ব্যাপার আর কি ঠাকুর মহাশয়! মাসী গ্রামসুদ্ধ লোকের সেবা নিল, আর আমাদের সেবা নিতেই যত আপত্তি!

আমি। কেন বাপ-সকল তোমরা কি সেবা নাও নি? তোমরা কি না-খেয়ে প্রসন্নকে অব্যাহতি দিয়েছ?

২য় যুবা। আমরা যা করেছি তার কি মূল্য আছে? উঠান চাঁচা থেকে 'আরম্ভ করে' ঠাকুর ঘাড়ে করে' বিসর্জ্জন দেওয়া পর্য্যন্ত, আমরা কি না করেছি? আর তা একবার নয়! গ্রামসুদ্ধ লোকজনের পরিচর্য্যা করা কি মুখের কথা? রাতকে রাত দিনকে দিন জ্ঞান না করে' আমরা যে বুক দিয়ে এত করলাম তার কি পুরস্কার নেই?

আমি। উঠান চাঁচা থেকে কেন বাপধন উঠান চষা থেকেই বল না? নাটের গুরু ত তোমরাই। ঠাকুরগুলো পর পর তোমরাই ত ফেলেছিলে?

৩য় যুবা। বলুন দেখি—এই উপায়ে গ্রামসুদ্ধ লোকের মধ্যে কি রকম সাড়া পড়ে' গেছে! গয়লার বাড়ী গ্রামসুদ্ধ লোকের সমাবেশ এ কি অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত? এ ডেমোক্রেটিক যুগ। আমরা এই নিচের দিক থেকে thin end of the wedge মিষ্টান্নের সঙ্গে প্রবিষ্ট করে' দিলুম। দেখুন এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভিতর থেকে সমাজের পরিবর্ত্তন চাই। বাইরের আমদানী করা Reform আর পরগাছা দুই সমান।

আমি। ডেমোক্রেটিক যুগ না বলে' মিষ্টান্নের যুগ বল্লে, বোধ হয় আরও ঠিক হত। যেহেতু গ্রামের লোক ডেমোক্রেসী খেতে আসে নি, মিষ্টান্ন খেতেই এসেছিল।

৩য়। আপনি বিষয়টাকে একেবারেই বুঝতে পারচেন না। যার জন্যেই আসুক, এসেছিল তো? আর দেখুন, আমাদের গ্রামের যুবকদলের কি শিক্ষাই না এ হতে হয়েছে। প্রথম, গ্রামের কা'কে ক'টি ছাদা দিতে হবে, কা'কে কি উপায়ে পবিতুষ্ট করতে হবে, কে ক'টা রসগোল্লা খেতে পারে, কে ক'দিস্তা লুচি খেতে পারে—এ সকল হাঁড়ির খবর পাবার অবসর কি ছাড়া যায়? তারপর, কার্য্যপটুতা লাভের এমন অবসর কোথায়? কার পর কি দিতে হয়, কতখানি দিতে হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, কর্ত্তাও অপদস্থ না হয় আবার ভোক্তারাও না বুভুক্ষিত র'য়ে যায়—এ সকল বিষযে পটুতা লাভের অন্য উপায় কোথায়?

আমি। বাপু! যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। গ্রামসুদ্ধ লোক মিষ্টান্ন খেতে এসেছিল। মিষ্টান্ন খেয়ে ঘরে গেছে। তোমাদের পরিবেশনের গুণে হয়ত কেউ কম বা কেউ বেশী পায় নি; কিন্তু তা থেকে মিষ্টান্ন-ভোজন-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ছাড়া যে আর কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে তা আমি মনে করি না।

১ম যুবা। যাই হ'ক। প্রসন্ন মাসা যখন এত করলে, আর আমাদের সেবা নিতেই তার যত কষ্ট! এ বড় অন্যায়।

২য় যুবা। আমরা এত পরিশ্রম করলুম তার বুঝি দাম নেই?

৩য় যুবা। না-না, আমরা দাম হিসাবে কিছুই চাইছি না। আমরা যে লোকশিক্ষা আর দেশ (আমাদের গ্রামটাই দেশ)

সেবার এই ব্যবস্থা করলুম, সেটা কি প্রকাশ্যভাবে,—পৃথক করে' —পরিস্ফুট করে' স্বীকার করা উচিত নয়?

প্রসন্ন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। আমি বলিলাম—সেবাকার্য্যের সবটাই তোমরা করেছ—এই তো তোমাদের কথা? কিন্তু মনে কর, প্রসন্ন যদি প্রথম খড়-জড়ান মূর্ত্তিটা উনানের ভিতর দিত, তা হ'লে তোমাদের দেশসেবার অবসর কোথা থাকত বাপু? প্রসন্ন যদি তার মুখে-রক্ত-ওঠা-পয়সা একটিও না ছাড়ত, তা হ'লে শুধু উঠান চেঁচে, সেই উঠানে উপবিষ্ট অতিথির মুখে সবুজ ঘাস আর মাটির ডেলা ভিন্ন কি দিতে বাপু? গয়লার মেয়ের কি সুবুদ্ধিটা তোমরা দিয়েছিলে? তার মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে একটি একটি করে' রোজকার করা টাকা যদি জলের মত সে ঢেলে না দিত, তবে তোমরা সুধুহাতে অষ্টরম্ভা ছাড়া আর কি কা'কে খাওয়াতে বাপু? আর দেশের লোকের সঙ্গে কি পরিচয়ই হ'ত বাপু হে? অতএব পরিস্ফুট করে' যদি কিছু স্বীকার করতে হয়, তবে আগে স্বীকার কর—প্রসন্নর হৃদয়, প্রসন্নর অর্থদান, প্রসন্নর ত্যাগ। তারপর পরিবেশন ও পরিচর্য্যার কথা তুলো। সেটা ভাড়াটে রাঁধুনি বামুনের মেয়ের দ্বারাও হ'ত। একজন কেবল পাকা ভাণ্ডারীর ওয়াস্তা বৈ তো নয়? আর হাঁড়ির খবর নিতে যদি সত্য সত্যই ব্যগ্র হ'য়ে থাক, তা হ'লে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ত সে কাজ করতে পার। তা'র জন্য ত বাবা, এত উঠান চাঁচার দরকার নেই—অত জল বেড়াবেড়ি করবার দরকার নেই।

৩য় যুবা। আপনি বলেন কি? ভাড়াটে লোক দিয়ে দেশসেবা? Horror of horrors!

আমি। কেন বাপধন, এ কি খেলা না মজলিস, যে প্রফেসনালের গায়ে গা ঠেকলে অ্যামেচারের মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে? না, খাঁ সাহেব পেশাদার গাইয়ে বলে' নিধুবাবুর আর সে আসরে হাঁ করতে নেই? যদি দেশসেবাই সত্যিকারের অভিপ্রায় হয় ত তার ভেতর আবার এ নূতন জাতবিচার, আর এ নূতন ছুঁৎমার্গ কেন?

৩য় যুবা। খেলা বা আমোদ নয় বলেই ত আমরা ভাড়াটে লোকের নামে খড়্গহস্ত হচ্চি। এ দেশসেবা—দেশের কাজ। যদি মজুরিই নিলুম ত কি হ'ল?

আমি। কাজটা ক্ষুদ্র ও সাময়িক বলেই হয়ত সামলাতে পেরেচে। মনে কর, দেশ বলতে তোমার গ্রামখানি না হ'য়ে যদি সত্যি সত্যিই সমগ্র দেশটাই হত, তা হ'লে কি যাদের ভাড়াটে বলে' নাক শিটকে উঠছ, তাদের সাহায্য না নিয়ে চলত? ইউরোপের এই যে এত বড় যুদ্ধটা হ'য়ে গেল, অবৈতনিক (ভলান্টিয়ার) যোদ্ধা নিয়ে যদি লড়তে হ'ত, তা হ'লে যুদ্ধ ফতে না হ'য়ে, দেশটাই ফতে হ'ত না কি? আর সৈনিকেরা বেতন নিয়ে যুদ্ধ করেছে বলে' কি তাদের জান দিতে যাওয়াটা দেশহিতৈষণাই নয়? না, সে দেশ-হিতৈষণা তোমার দেশহিতৈষণার চেয়ে মর্য্যাদায় কম বলতে হবে?

ছেলেগুলা মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। আমাব কানে যেন আসিল—বুড়া সেকেলে ফসিল (fossil), এ যুগের ধর্ম্ম কি বুঝবে?

প্রসন্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কে জানে, আমার ভয় করছে। ছেলেগুলো আমার ঘরে আগুন দেবে না ত! এত খরচ হ'ল—না-হয় ও-কটাকে একটা ভোজ দিলেই হ'ত।

৫ই পৌষ, ১৩২৯.

অহিফেন ব্রত

মগধ বা মালবের মাঠে আফিমের ক্ষেত যে দেখে নাই সে বৃথাই জন্মেছে বলব না ত কি? লাল, নীল, সাদা—রেশমের ফুলের মত ফুল মাঠ আলো করে' আছে; ফুলে ফুলে পালে পালে মৌমাছি সর্ব্বগায়ে পরাগ মেখে ফুলের বুকে লুটোপুটি খাচ্ছে; ক্ষণেক পরে ফুলের পাপড়ীগুলি ঝরে' পড়ল, আর অমৃতের আধার আফিমের ফলগুলি মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে উঠল; তারপর, বলিহারি মানুষের বুদ্ধি! সূচের ডগায় বিদ্ধ হ'য়ে সে অমৃতের উৎস খুলে' গেল, আফিমের জন্ম হ'ল।

স্বর্গে ছিল অহিফেন
মর্ত্তে আনিল কে?

সে প্রাতঃস্মরণীয় দেবদূতের নাম পুরাণে পাওয়া যায় না; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অহিংসা আর আফিম একই সময়ে একই মহাপুরুষের দ্বারা স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্ত্যে আনীত হয়েছিল। কারণ আফিমের সঙ্গে অহিংসার নিত্য সম্বন্ধ; যেখানে সত্যিকারের অহিংসা আছে, খোঁজ করলে জানবে, সেখানে অল্পবিস্তর আফিমের আমেজ আছেই আছে; আর যেখানে আফিম আছে—সেখানে অহিংসা থাকতে বাধ্য।

আফিমের যে কি শক্তি তা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় গভর্ণমেণ্ট বেশ জানেন ; আসাম তরাইএর দুর্দ্দান্ত নাগা কুকী প্রভৃতি জংলা-গুলোকে, বৎসর বৎসর আফিম সওগাৎ দিয়ে, বেশ শান্ত শিষ্ট করে' রেখেছেন ; তাদের পশুবুদ্ধি গিয়ে তারা লক্ষ্মী হ'য়ে আফিম খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। পঞ্জাব সীমান্তে পাঠানগুলোকে এখনও আফিম ধরাতে পারেন নি বলে', তারা সেই ইতিহাসের অরুণোদয়ের সময় যে পশুবৎ ছিল এখনও তাই আছে ; ছোট্ট ছোট্ট আফিমের গুলিতে যে শুভকার্য্য সম্পন্ন হ'ত, বড় বড় কামানের গোলাতেও তা হচ্চে না ; তারা যে জংলা সেই জংলাই র'য়ে গেছে—ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত ভারতবর্ষীয় মেষের পালের উপর পড়ে' নিয়তই হাঙ্গামা বাধাচ্চে। চীনেরা যতদিন বেশ নির্ব্বিবাদে আফিম সেবন কচ্চিল ততদিন কেমন নির্ব্বিবাদে সুড় সুড় করে' সব ইউরোপীয় পাদরী, ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ইউরোপীয় বণিকসঙ্ঘ চীনের সমুদ্রতীরে, চীনের main artery ইয়াংসি নদীর উভয় পার্শ্বে, ভাল ভাল জায়গাগুলি দখল করে' বসবার অবসর পেয়েছিলেন ; কেননা তখন চীন ছিল অহিংস ও অহিফেনসেবী। এখন চীন আফিং কিছু কম খাচ্চে ও সেই সঙ্গে কিছু কম অহিংস হ'য়ে উঠেছে ; Boxer rebellion থেকে সুরু করে' হিংসা বেড়েই চলেছে—foreign devilগুলোকে আমল দিতে বড় রাজী হচ্চে না।

কিন্তু গোড়ায় গলদ হ'য়ে গেছে ! এমন নির্ব্বিরোধী মোলায়েম জিনিষটার কিনা নাম রাখা হ'ল—অহিফেন। নামে কি এসে যায় যে বলে, সে নাম-রূপের গূঢ় মাহাত্ম্য ছাইও বোঝে না। What is in a name ; a rose under another name will smell

as sweet—এটা অর্ব্বাচীনের কথা, অরসিকের কথা। তা যদি হ'ত তা হ'লে—চাটুয্যে বাড়ুয্যে মুখুয্যে সব এক কথা হ'ত, বামুন শূদ্র এক হ'ত, কুলীন মৌলিক এক হ'ত—"বস্তুগত্যা" ত সব সেই মাতৃজঠরে দশমাস দশদিন যাপন, তারপর সুখ-দুঃখের দোলায় কিছুদিন দোল খাওয়া, অবশেষে বোড়াইচণ্ডীর ঘাটে একমুষ্টি ছাই। না, নামের মাহাত্ম্য মানতেই হবে; প্রসন্নকে আর কোন নামে অভিহিত করলে প্রসন্ন ত সাড়া দেবেই না, প্রসন্নকে যে জানে তার মনও সাড়া দেবে না, অন্য নাম প্রসন্নকে মানাবেই না। তা না হ'লে হিন্দুশাস্ত্রে নামকরণের এত পাকাপাকি ব্যবস্থা কেন? সে যাহোক, এমন মোলায়েম জিনিষটাকে যদি একটু মোলায়েম করে' বলা গেল, আফিম—তা'তে কি বৈয়াকরণের হাত এড়াবার যো আছে? সে ব্যক্তি ষষ্ঠীতৎপুরুষ প্রকরণ বার করে' বলবেনই—অহিঃ কিনা বিষধরঃ তস্য ফেনঃ। কি উগ্র, কি প্রচণ্ড, তীব্র নাম! *এই নামের দোষেই এমন পরম পদার্থের এত অনাদর, তাই লোকে এমন শান্ত শিষ্ট জিনিষটাকে আজ বিষ-নয়নে দেখে।*

আমি কিন্তু সকলকে একবার ধীরচিত্তে আফিমের বিচার করতে অনুরোধ করি, কারণ ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য। সে প্রাপ্য অধিকার থেকে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম কেহই বঞ্চিত নয়, আফিমই বা বঞ্চিত হবে কেন? তবে ন্যায়বিচার করা সকলের অধিকার নয়; এইখানেই যা গোল; কেননা যার আফিমে অধিকার নেই, সে তার ভালমন্দ বিচার করবে কোন্ অধিকারে? তারপর বিচারই বা হবে কি উপায়ে? চিনি যে মিষ্টি তা কি ন্যায়ের কচ্‌কচি দিয়ে বোঝা যায়, না বোঝান যায়? একথাবা চিনি গালে-

ফেলে দিলেই সব গোলমাল মিটে যায়। আফিম সম্বন্ধেই বা অন্য পন্থা হবে কেন?

অতএব বৈরাকীরণ মাথায় থাকুন, আপনারা একবার ন্যায়ের খাতিরে একটু একটু আফিম বদনে দিয়ে দেখুন। এই human test tubeএর ভিতর আফিমকে ফেলে একবার পরীক্ষা করুন; অহিফেন-মাহাত্ম্য চূড়ান্তরূপে অবধারিত হ'য়ে যাবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানযুগে আমরা non-violent non-co-operation আমাদের জীবনের, অন্ততঃ রাজনীতিক জীবনের, মূলমন্ত্র করেচি। এ মন্ত্রকে সার্থক করার প্রতি অহিফেনের যে কতখানি শক্তি তা একবার প্রত্যক্ষ করুন, এক কাজে দুই কাজ হ'য়ে যাবে।

বর্ত্তমান movementএ আফিম কতটা কাজে লাগতে পারে তা কেউ ভাল করে' ভেবে দেখে নি, আমি দেখিচি। আফিংএর সঙ্গে non-violence বা অহিংসার যে নিত্য-সম্বন্ধ তা পূর্ব্বে বলিচি। তারপর আফিমের সেবায় non-co-operationএরও খুব সুবিধা হ'তে পারে। একটু বেশীদিন এ দিব্যবস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লে, আফিম ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে non-co-operation করতেই হবে, bureaucracy ত কোন্ ছার! এবং দেশের লোক শ্রদ্ধাবান হ'য়ে যদি এই নিরুপদ্রব অহিফেন সেবায় মন দেয়, তা হ'লে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে স্বরাজলাভ অবধারিত। ছেলেবুড়ো, বিশেষ করে' বাবাজীবনেরা, যদি এক মনে এক প্রাণে অহিফেন ব্রত গ্রহণ করে, তবে আমি কমলকান্ত চক্রবর্ত্তী বলে' দিচ্ছি—৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজলাভ ঘটবেই ঘটবে; অন্যথা দিন পিছিয়ে দিতে হবে, আমি তজ্জন্য দায়ী থাকব না।

আর জাতিবিচার বা ছুৎমার্গ—এসব যে কোথায় তলিয়ে যাবে ডুবুরি নাবিয়ে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না। তার আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। আমি একবার রেলে চড়ে' নসীরামবাবুর দেশে পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমার পূজার নিমন্ত্রণ অর্থে অহিফেনের ভূরি সেবনের নিমন্ত্রণ; কেননা মৌতাতী লোকের শক্তিপূজার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। আমার সঙ্গে আমার দপ্তর, আর দপ্তরের ভিতর আমার আফিমের কৌটাটা; ষ্টেশনে যখন গাড়িখানা দাঁড়াল, আমার ঠিক খেয়াল ছিল না; যখন গাড়িটা ছাড়-ছাড়, আমার সংজ্ঞা হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। গাড়িখানা চলে' গেলে, আমার হাতটা খালি খালি বোধ হ'তে লাগল; তখন মনে করে' দেখি, আমার আফিমের কৌটা-সমেত দপ্তরখানা গাড়িতে রয়ে গেছে! বলা বাহুল্য আমার দপ্তরের জন্য মোটেই দুঃখ হ'ল না, যেহেতু যে-মাথা থেকে দপ্তরের লেখা বাহির হয়েছিল তা আমার স্কন্ধেই ছিল। কিন্তু আফিমের কৌটার জন্য আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! আমার তখন খোয়ারির সময় নয়, কিন্তু কৌটাটা হাতছাড়া হওয়ায়, আমার তখনই হাই উঠতে লাগল। সে যে কি হাই উঠা, আর কত বড় হাই উঠা, তা যে অহিফেনসেবী নয়, সে বুঝতে পারবে না; রাবণের রথ গেলবার জন্য জটায়ুও ততবড় হাঁ করে নি। আমি বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। সে অজ পাড়াগা, সেখানে কি দয়াময় সরকার বাহাদুর পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের জন্য আফিমের দোকান খুলেচেন? কোথায় যাই, কি করি! এমন সময় এক নূরদাড়িযুক্ত মুসলমান ভদ্রলোক (যাঁর পূর্ব্বপুরুষ হয়ত, যে চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী বক্তিয়ার খিলিজির সঙ্গে

বাঙ্গালা জয় করেছিল, তাঁদেরই অন্যতম) আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। নব্য ঐতিহাসিক হয়ত চমকে উঠে বলবেন—চোদ্দয় পদ্য মিলতে পারে, কিন্তু ১৪জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় হয় না; আর বাঙ্গালার মুসলমান শতকরা ৯৯ জন··· ···। সে প্রশ্ন এখন তোলা থাক। কিন্তু মানুষটা কি মোলায়েম, কি নরম, ঠিক আফিমের মতনই নরম আর মোলায়েম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমার 'আকর্ণ হাঁ' দেখে, যেন বড়ই ব্যথিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—মহাশয় (তাঁর পূর্ব্বপুরুষ, চতুর্দ্দশ অশ্বারোহীর অন্যতম, লক্ষণাবতীর রাজপথে ব্রাহ্মণ পথিককে ঠিক সে স্বরে সম্বোধন করেন নি) আপনাকে কিছু বিপন্ন দেখচি, আপনার শরীর কি অসুস্থ ?

আমি। অসুস্থ বলে'! একেবারে গত, মৃত !

মুসলমান। কেন বলুন দেখি ?

আমি। ঐ দেখুন গাড়ি ; (তখনও কপি বাঁদরের পশ্চাদ্দেশের মত গাড়ির রক্তবর্ণ পশ্চাদ্ভাগ দূরে লি-লি কচ্ছিল) ঐ 'অদয় অক্রূরের' রথে আমার কাল্চাঁদ, আমায় ফেলে কোন্ অজানা মথুরাপুরীর দিকে চলে' যাচ্ছেন ; তাঁর বিরহদুঃখে আমি কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকার মত মৃতপ্রায় হয়ে খাবি খাচ্চি !

মুসলমান। আমি তা বুঝেচি ; উঠুন, আমার সঙ্গে আসুন।

আমি। আজ্ঞে, আপনার কি আফিমের দোকান আছে ?

মুসলমান। আজ্ঞে না ; তবে আমিও মৌতাতী লোক, আপনাকে দেখেই চিনেছি—বলেই তিনি হাই তুলে, দু'টা তুড়ি দিয়ে মুখবিবর বন্ধ কল্লেন। আমিও চিনলুম !

এই হারুণ-অল-রসিদের সঙ্গে তাঁর দৌলতখানায় উপস্থিত হ'লে

তিনি অতি যত্ন করে' রূপার কৌটায় আফিম, রূপার গোলাপপাশে তোফা গোলাপজল, আর এক রূপার পাত্র আনলেন। আমাকে বল্লেন—মহাশয় সেবা করুন। আমি গোলাপজলে আফিম গুলে (বলা বাহুল্য একটু বেশী মাত্রাই) পান করলুম। ধড়ে প্রাণ এল। খাঁ সাহেবও একমাত্রা সেবন করলেন।

এখন বল ত—গোলাপজলও যে জল আমার সে জ্ঞান হরণ করলে কে? খাঁ সাহেবের সঙ্গে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কোন কৌলিক-সম্পর্ক থাকতে পারে না, তবে এত আত্মীয়তাই বা কোথা থেকে এল; খাঁটি বৈদিক আহার খেয়ে, খাঁ সাহেবের বক্তিয়ারি মেজাজে এত কমনীয়তা কোথা থেকে এল; সে এত ব্যথার ব্যথীই বা হ'ল কি করে'? বলতেই হবে সব অহিফেনপ্রসাদাৎ—এই অহিফেনপ্রসাদাৎ—বাঘে-গরুতে জল খাবে, তেলে-জলে মিশবে, সাপে-নেউলে সৌহার্দ্দ হবে, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই হবে! অতএব অহিফেন সেবা গ্রহণ কর।

মৌতাত বেশ জমে' এলে খাঁ সাহেবকে অভিবাদন করে', এবং একদিনের মত অহিফেন চাদরের খুঁটে 'বন্ধনং কৃত্বা', আমি নসীরামবাবুর বাড়ী যাত্রা করলুম; খাঁ সাহেব সদর দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন; অতি মোলায়েম ভাবে বল্লেন "গুণা নেবেন না, সেলাম।' আমি নমস্কার করে' মনে মনে বল্লাম, "অহিফেনো জয়তি।"

১৭ই মাঘ, ১৩২৯

"বাবা মেয়ে"

"সখি! নাহি জানন্ত সোহি পুরুষ কি নারী।" একথা কবিতায় বেশ শুনায়; কিন্তু পুরুষকেই বল আর রমণীকেই বল, বাস্তব-জীবনে, এ সন্দেহাভাস অলঙ্কারের মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে, পুরুষ বা নারী তা বরদাস্ত করতে পারে না। পুরুষকে রমণী আর রমণীকে পুরুষ বল্লে, উভয়ের পক্ষেই ব্যাজস্তুতির বিপরীতই বুঝিয়ে থাকে। সোজা কথায়—মেয়েমুখো পুরুষ আর মদ্দা মেয়েমানুষ এ দুটো কথাই গালাগাল।

মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নারীকে, অবলা, দুর্ব্বলা, weaker vessel, ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নারী, নারী হিসাবে, কোনদিনই অবলাও নয়, দুর্ব্বলাও নয়, weaker vesselও নয়। আমি প্রবলা, হরবোলা, হিড়িম্বা বহুত দেখেছি। তবে ও-সকল খেতাব যে নারীকে দেওয়া হয়েছে তার ভিতর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় বা যেরূপ দেখতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। 'নাই' বল্লে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা, দুর্ব্বলা হ'য়ে যাবে

এই দুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে ঐ সকল সুশোভন অভিধান দিয়ে থাকে। নারী প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবলা নয়।

তা বলে' নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয়। কবি বলেছেন—Woman is not undeveloped man, but other; ইহার বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ যাহাই থাকুক, ব্যবহারিক জীবনে, খেয়ালের বশে খানিকটা এ সাংঘাতিক সত্যকে ভুললেও, কার্য্যতঃ এক মুহূর্ত্তও ভোলা চলে না। আর কবির উক্তির প্রতিপ্রসবটা, এ পর্য্যন্ত কোন কবি লিপিবদ্ধ না করলেও, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলে' রাখলাম—Man is not developed woman, but other. ইহাই সহজ, অবিকৃত নৈসর্গিক অবস্থা।

মনু যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে আরম্ভ করে' সেকলে পর্য্যন্ত সকল সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ বিভাগ করেন নি; চুরি, জুয়াচুরি, খুন, জখম ইত্যাদির শাস্তিবিধানের সময়, জুরীর মন সুন্দর মুখ দেখে টলবার সম্ভাবনা থাকলেও, সংহিতাকারের মনে স্ত্রী পুরুষ প্রভেদজ্ঞান ছিল না। স্ত্রী-চোর ও পুরুষ-চোরের একই শাসনের ব্যবস্থা করা হয়েচে। অবলা বলে' কোনই ইতরবিশেষ করা হয় নি। মানবচরিত্র জ্ঞানের এমন পরিচয় কোন নিপুণ নাটককারের নাটকেও দেখতে পাই না। তবে স্ত্রী ও পুরুষের এমন একটা বয়স আসেই যখন উভয়েই অজহল্লিঙ্গ হ'য়ে যায়; যেমন আমি, আর প্রসন্ন। বৃদ্ধ কমলাকান্ত ঠিক শাতোঞাদি দ্বৈতবিরচিত সাংখ্যোক্ত পুরুষ না হ'লেও তার প্রকৃতির একটা দিক একেবারে মুছে গেছে বল্লে মিথ্যা বলা হয় না; প্রসন্নরও তাই; প্রসন্নও এক প্রকার নিরুপাধি নিরবচ্ছিন্ন মানুষমাত্র, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। এ অবস্থাটা নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-

সূচনামাত্র ; মানুষ যে জন্মাবধি তিল তিল করে' মরে, এটা সেই মৃত্যুরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র ; তথাপি এটা স্বাভাবিক ; বিকার হ'লেও অনৈসর্গিক নয়।

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ আর জীবন্ত নারী দুইটা স্বতন্ত্র জীব ; দুইটার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম : সে-ধর্ম্ম যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করে' দিয়েছেন ; তাদের শরীর মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুযায়ী করে' গড়েছেন। নারী যদি পুরুষসুলভ গুণের বা কার্য্যের অধিকার চায়, সেটা নারীস্বভাবের বিকার বা অস্বাভাবিক পরিণতি বলতেই হবে।

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ-আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক courtesy নয় ; কেননা স্ত্রীর স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধারণা। ইউরোপের অন্য কথা। বিলাতী Blue-stocking থেকে আরম্ভ করে' Golf, Cricket, Football, Tennis, Racing Championship-এ যে মা সকল প্রতিযোগিতা কচ্ছেন তাদের আর ঠিক মা বলা চলে না। সিগারেট মুখে দিয়ে বা বাঁধা হুঁকা হাতে করে' বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন) মা না বলে' বাবা বলাই ঠিক মনে হয় না কি ?

সুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যাচ্চে তা নয় ; অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনায় মাতৃহৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে, সন্তান-ধারণ-ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগী বৃত্তি সকল শুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় Sex সৃজন হচ্চে। কমলাকান্তের বঁধূ মিলল না বটে, আমার হৃদয় শুষ্ক বটে, কিন্তু আমার কথার কোন মূল্য নাই মনে কর' না। আমি বেশ দেখচি

যে, নারীর মাতৃত্বের বিকাশ না হ'লে বা তার অবকাশ না পেলেই, সে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চায়,—Suffragette হয়, politician হয়, সমাজ-সংস্কারক হয়, ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর, তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার বক্ষে শিশু মা বলে' তার মাতৃত্বকে জাগিয়ে তোলে, তখন তার পুরুষত্বের দাবী (যাকে সে মনুষ্যত্বের দাবী বলে' মনে করে) কোথায় ভেসে যায়। লণ্ডনের পথে পথে যখন Suffragetteরা হৈ হৈ করে' অতি অশোভনভাবে তাদের মনুষ্যত্বের দাবী ঘোষণা করে' গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম—হে ইংরাজ, মা সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর সোহাগ আর সন্তানের মুখচুম্বনের ব্যবস্থা করে' দাও, মা সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা-সকল আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ-সমাজ সেদিকে গেল না। তার উপর লোক-বিধ্বংসী সমরবহ্নি তাদের যৌন-সংহতি লেহন করে' নিয়ে গেল; সে ব্যবস্থা আরও সুদূরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছেচে।

আমি দেখেচি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে না বলে' স্ত্রীগণ পুংধর্ম্মী হ'য়ে উঠে; আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামী-সুখ মিলল না, বা সন্তানের কাকলিতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় সেই-খানেই মনটা হঠাৎ বহির্ম্মুখ হ'য়ে উঠে, হাল ফ্যাসানমত কথায় দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটি বিড়াল আছে, সে কখন কখন আমার দুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে; প্রসন্নর সে মার্জ্জারপ্রীতি, আমি বুঝতে পারি,

তার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের সন্তানপ্রীতিরই রূপান্তর, আর কিছু নয়। অনেক স্ত্রীসুলভ বাতিক (hobby) তাদের হৃদয়ের কোন-না-কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শূন্য কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যামাত্রেরই বিবাহ অর্থাৎ স্বামিসম্পর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। Courtship বা flirtationএর অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর যৌন-সম্মিলনের ইমারৎ তোলবার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই flirtation অর্থাৎ বন্ধুসম্মিলন বা বঁধু-সম্মিলনের 'বিষম ঘুরণ পাকে' হাবুডুবু খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে, মাতৃত্বে তথা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেচেন।

আমি তাই বলচি—মা সকল, মা হও। কাউনসিল বল, কোর্ট বল, সভা বল, সমিতি বল, বক্তৃতা বল, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও, ওসব পন্থা, মা হওয়ার আগে নয়। 'বাবা মেয়ে'র দলপুষ্টি করে' সংসারের সর্ব্বনাশ কর' না, দেশের সর্ব্বনাশ কর' না। আমি বলে' রাখলুম—পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী, the twain shall never meet.

২রা ফাল্গুন, ১৩২৯

৯

পাগলের সভা

নসীরাম বাবুর একটা অভ্যাস ছিল—তিনি প্রতি রবিবারে তাঁর সদর বাড়ীর উঠানে ভিক্ষার চালের ধামা নিয়ে বসতেন, আর ভিখারীদের নিজে হাতে মুষ্টিভিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ বলিত তাঁর এটা একটা বাই; কেহ বা বলিত বাই নয়, চাল; কেহ বলিত অন্যদিন দানের পুণ্যটা চাকর-বাকরেই নেয়, কর্ত্তা সপ্তাহের একদিন নিজেই সে পুণ্য অর্জ্জন করেন। নসীরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি আমাকে বলেছেন—সপ্তাহে একদিন গ্রামের গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, মন্দ কি? তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ত আর হয় না। তাদের সুখদুঃখের সংবাদ নিলে মনটা থাকে ভাল, অযথা গরম হ'য়ে উপর দিকেও যায় না, আর ম্রিয়মাণ হ'য়ে নিচের দিকেও নেমে পড়ে না; মন্দ কি?

নসীরাম বাবুর এই সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে কত জনের কত মত; তাঁকে বায়ুগ্রস্ত পর্য্যন্ত বলতেও লোকের বাধে নি। নসীরাম বাবুকে কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নি; আপনার মনে একটা অনুমান খাড়া করে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন পাগলামির বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যেহেতু সহজ মানুষের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। পাগল

আর সহজের মধ্যে ব্যবধান, কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে ব্যবধানের মত—সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞেয় ; কখন্ কৈশোর গিয়ে যৌবন এলো যেমন ধরা যায় না, সহজ মানুষ কখন্ পাগল হ'ল ঠিক সে সন্ধিক্ষণ অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ বুঝতে বা জানতে পারে না। কে পাগল আর কে সহজ তা'ও ঠিক ধরা কঠিন। যুক্তি, ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের আইন, চোখ চেয়ে অমান্য করলে যদি মানুষকে পাগল বলতে হয়, তা হ'লে নসীরাম বাবুর কার্য্যের সকল সমালোচকই পাগল ; যেহেতু তাঁরা সকলেই, কার্য্যমাত্রের কারণানুসন্ধানরূপ মনুষ্য হৃদয়ের প্রবলতম স্পৃহার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে', এক একটা মনগড়া অনুমান খাড়া করে' নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ; সে অনুমানের পশ্চাতে না ছিল যুক্তি না ছিল প্রমাণ। পাগলামী জিনিষটাই এত জটিল বা স্থিতিস্থাপক যে কাহাকেও পাগল বা সহজ বল্লে, সর্পে রজ্জুভ্রম হ'ল কি না বলা কঠিন।

নসীরাম বাবুর রবিবারের অতিথিদের মধ্যে কতকগুলি, যা'কে লোকে সচরাচর পাগল বলে, সেই পাগল ছিল ; কেহ কেহ আমাকেও সে দলভুক্ত করত। তথাকথিত সহজ ভিখারী বা ভিখারিণীগণ চলে' গেলে নসীরাম বাবু তবে পাগলগুলিকে ভিক্ষা দিতেন, এবং তাদের নিয়ে একটু রঙ্গরস করতেন ; ভিক্ষার শেষে নসীরাম বাবুর উঠানে একটি পাগলের সভা বসত বল্লে ভুল হয় না। সে সভার সভাপতি স্বয়ং নসীরাম বাবু, আমি দর্শক বা reporter মাত্র। আমি এক রবিবারের সভার proceedings report করছি।

নসীরাম বাবু। কি হে মাখন, কেমন আছ ?

মাখন অন্যমনস্ক ভাবে একটু হাসিল মাত্র। মাখন কোমরে

কাপড় না পরে' গলায় কাপড় পরে ; সে বলে কোমরে কাপড় জড়ালে অনেকখানি কাপড় বাজে নষ্ট হয় ; গলায় কাপড় পরলে, অল্প লম্বা কাপড়েই চলে,—মিছে বাজে খরচ কেন ?

নসীরাম বাবু। মাখন, সে দিন বাজারে মেছুনী মাগী তোমার গায়ে জল দিয়েছিল কেন হে ?

মাখন। আজ্ঞে, মেছুনী বেটী বলে আমি উলঙ্গ, আমার কোমরে কাপড় নেই বলে'। আমি বল্লাম, বেটী কোমরে কাপড় নেই ত কি হয়েছে, আমার দেহটা ত ঢাকা আছে ? বেটী তবুও বলে,—পাগলা, তোর গায়ে কাপড় থাকলে কি হয়, তুই ও-কাপড়ের ভিতর নেংটা। আমি বল্লাম—বেটী, তোর কোমরে কাপড় থাকলে কি হয়, তুইও কাপড়ের ভিতর নেংটা ! বেটী আমার গায়ে আঁস জল দিলে—বেটী পাগলী !

রতনা পাগলা ততক্ষণ একটু করা ইট নিয়ে নসীরাম বাবুর সান বাঁধান উঠানের খানিকটা লিখে লিখে ভরিয়ে দিয়েছে।

নসীবাবু। রতন কি লিখছ ?

রতন। আজ্ঞে বেটা জমীদার জমীদারই আছে ; রামা কেওরার উপর কি অত্যাচারটা করেচে বলুন দেখি ! বেটাকে হাজতের হুকুম দিলুম, আর ৩০৪ ধারা মতে তার উপর মামলা চালিয়ে দিলুম।

নসীবাবু। গ্রামের জমীদার হাজার হ'ক, তার অত করে' নিগ্রহ করলে—ভাল করলে কি ?

রতন। ভালমন্দ কিছু নেই ; তা বলে' আপনি যেন তার হ'য়ে সাক্ষী দেবেন না ; বিপদে পড়বেন বলে' দিচ্চি।

নসীবাবু। আরে তা কি আমি করি ! তুমি যখন দাঁড়িয়েছ

তখন কি আর জমীদার বাবুর রক্ষা আছে? তা, বাবু তোমার টাকা-গুলোর কি ব্যবস্থা করলে?

রতন। তারও পয়ার করেচি; সিভিল জেল ঠেলে দিচ্চি।

নসীবাবু। কত দিক করবে? ফাঁসিও দেবে, জেলও দেবে?

রতন। যেটা লাগে।

নসীবাবু। মাথাটা আজ একটু বেশী গোলমাল দেখছি না রতন?

রতন। মাথাটা আমার ঠিকই আছে, জানেন। আমি পাগল যা মনে আসে তাই বলি, আর আপনি যাকে যা মনে আসে তা বলেন না—এই মাত্র প্রভেদ। মনে মনে সবাই পাগল, রতনা কিছু ফাঁস।

শেষের কথাগুলো আবৃত্তি করতে করতে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আপনার গো ভরে উঠে' চলে' গেল, তাকে ফেরান গেল না।

গোপাল দে ছিল স্কুলমাষ্টার। ক্লাসে Goldsmith এর Village Preacher পড়াতে পড়াতে তার মাথা গোলমাল হ'য়ে যায়।

Those who came to scoff remained to pray এই ছত্রটা গুরুগম্ভীর ওজনে পাঠ করে' গোপাল একদিন ছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসা করলে—'বাহাদুরী কার?' ছেলেরা হাঁ করে' রইল। গোপাল বার বার উক্ত পদটি আপন মনে পাঠ করলে, যত পড়ে তত গরম হ'য়ে উঠে। শেষে আপন মনে বলে' উঠল—মুর্খকবি! কেন remained to pray?—আরে বেটা, সে কি তোর পাদ্রীর বাহাদুরী না those who came to scoff তাদের বাহাদুরী? তাদের ভিতর যে ছাইচাপা আগুন ছিল, তোমার পাদ্রীর বক্তৃতার ফুৎকারে সেই ছাইগুলো মাত্র উড়ে গেল—আর প্রচ্ছন্ন অগ্নির রক্তবিভা প্রকটিত হ'য়ে পড়ল; পাদ্রীর

ফুঁ আর তাদের আগুন। আগুন যদি না থাকত বা আগুন যদি নিবে গিয়ে থাকত, তুমি বেটা পাদ্রী ফুঁ পেড়ে পেড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করলেও আগুন জ্বলত না। ছাতারের বাসায় কোকিলের ডিম, সে ডিমের ভিতর কোকিলের কুহুতান সুষুপ্ত থাকে—ছাতারে তা দিয়ে ফোটায় বলে' কি তানের বাহাদুরী তার? ক্ষুদ্র বীজের ভেতর শেফালির সৌরভ নিদ্রিত, উড়ে বেটা গাছের গোড়ায় জল দেয় বলে' কি সৌরভের স্রষ্টা সে? জগাই মাধাই যদি খাঁটি সোনা না হ'য়ে প্রকৃতই খাঁটি লোহা হ'ত; তাদের লৌহহৃদয়কে গিল্টি করা চলত, সোনা করা সম্ভব হ'ত না। রত্নাকরের মুখে 'মা নিষাদ—' ইত্যাদি শ্লোক বহির্গত হ'ত না, 'মরা মরা' মন্ত্র আওড়ান সত্ত্বেও, যদি বাল্মীকির করুণা-বিগলিত-হৃদয় রত্নাকরের বুকে প্রচ্ছন্ন না থাকত; রামায়ণের মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত রত্নাকরের খুনে হৃদয়ের অন্তরতম স্তরে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, গুমরিয়া গুমরিয়া ঝঙ্কৃত হ'তই হ'ত। ন্যাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ—nothing comes out of nothing,—ছেলেরা বেগতিক দেখে হেডমাষ্টারকে খবর দিলে। হেডমাষ্টার গোপালকে ছুটি দিয়ে বাড়ী যেতে বল্লেন। গোপালের সেই ছুটীতেই ছুটি। সে অবধি 'বাহাদুরী কার?' গোপালকে এই প্রশ্ন করলে গোপাল বলত—"তাই ত, কার বাহাদুরী? কে জানে কার? যার তারই হবে।"—ইত্যাকার অসংলগ্ন প্রশ্ন করতে করতে আপনার অন্তরের মধ্যে ডুবে তলিয়ে যেত।

নসীবাবু বল্লেন—'গোপাল, বাহাদুরী কা'র বুঝতে পেরেছ?'

গোপাল নিরুত্তর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে; তার মুখে একটা নিদারুণ বিহ্বলতার ভঙ্গী ফুটে উঠল। তাকে আর কোন প্রশ্ন করা চলল না।

নসীবাবু। মধু, আজ গঙ্গাস্নানে যাবে না?

মধুসূদন দাস, জাতিতে মুচি, বললে—"বাবু, আমাকে রাগাবেন না"; সে কিন্তু তার আগেই রাগে গর্‌গর্‌ করতে সুরু করেচে।

নসীবাবু। চট কেন, মধুসূদন? এত লোক গঙ্গাস্নান করে, পতিতপাবনী গঙ্গা, গঙ্গায় নাইবে না ত কোথায় নাইবে?

— মধু। এজ্ঞে, তা জাননা? বাবু, ছাস্তর জাননা? শোন, হদে লাইবে, লদে লাইবে, পকুরে লাইবে, ডোবায় লাইবে, পাতকোয় লাইবে, দামোদরে লাইবে, রূপলারাণে লাইবে,—গঙ্গায় লাইবে না, ছরস্বতীতে লাইবে না, পদ্মায় লাইবে না,—মেয়ে মানুষকে মাথায় করবে? ছ্যাঃ—

নসীবাবু। মধু, গঙ্গা যে মহাদেবের জটায় ছিলেন তা জান ত? মহাদেব কেমন করে' মাথায় কল্লেন?

মধু। পিরীতে, পিরীতে—

মাখন মধুসূদনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল; মধুর কথা শেষ হ'লে "পাগল রে" বলে' হেসে উঠল।

আমি কিন্তু এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পাগল ও সহজের সীমানির্দ্দেশ করতে পারলুম না। লোকে এই লোকগুলোকে কেন পাগল বলে, আর তারা নিজেই বা কিসে সহজ, তার বিচার আমি করতে অক্ষম। প্রচলিত চিন্তাস্রোতের যারা উজানে যায় তারাই পাগল, আর সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়ে যারা আরামে ভেসে চলে তারাই সহজ, একথা কেহ স্বীকার করবে না। গড্ডলিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করে' নূতন পথ আবিষ্কার করতে গেলে বা

নূতন চিন্তার ধারা বহাতে গেলে, কখন্ মৌলিকতা ছাড়িয়ে পাগলামি এসে পড়ে, তা'ও আমি ঠিক বলতে পারলুম না। তবে আমি এই বুঝলুম যে হঠাৎ লোককে ক্ষ্যাপা বলা চলে না।

অবশেষে, যাঁরা নারীর মঙ্গল করবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে পুরুষ-জাতির তথা মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যস্ত, তাঁদের এই মধু পাগলার কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে অনুরোধ করি। রমণীমাত্রেই দেবী বলিয়া তাঁহাদিগকে মাথায় করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাতে প্রত্যবায়ই আছে। রমণীমাত্রেই যদি প্রচ্ছন্না দেবী হন, ত পুরুষমাত্রেই প্রচ্ছন্ন দেবতা। বলা বাহুল্য, দুইটার একটাও সত্য নহে। তাই রমণীকেও বলি, আর পুরুষকেও বলি, মাথায় কাহাকেও বসাইও না; তবে "পিরীতে" যে-খেলা খেলিতেই হইবে, তার চারা নাই।

৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯

খোদার উপর খোদকারী

কেউ বলতে পার, আমি কমলাকান্ত বলে' আফিম খাই, না আফিম খাই বলে' আমি কমলাকান্ত? প্রসন্ন দুধে জল দেয় বলে' সে প্রসন্ন, না প্রসন্ন বলে' সে দুধে জল দেয়? কেউ বলতে পার না তা আমি জানি, যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তার কারখানার ভিতরকার খপর কা'রও জানা নেই। কিন্তু তবু তোমরা খোদার উপর খোদকারী করতে ত ছাড়বে না— তোমরা নাক সিঁটকে বলবে—কমলাকান্ত লোকটা এদিকে বেশ বটে, তবে মানুষটা কিছু নয়, যেহেতু সে আফিংখোর। কিন্তু এটা ভেবে দেখ না কেন যে, আফিম খায় না এমন কমলাকান্ত হ'তে পারত কিনা, দুধে জল দেয় না এমন প্রসন্ন হ'তে পারত কিনা? খোদা স্বয়ং এ দুই বস্তুকে এক করেছে,—যথা কমলাকান্ত ও অহিফেন, তখন ও-দুটা পদার্থের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে বলেই ত। আর ঐ "খোর" বলে' যে গাল দাও, সেটা বাড়ার ভাগ; যেহেতু কমলাকান্ত ভাত খায়, তার বেলা ত কথার সামঞ্জস্য রেখে তাকে "ভাতখোর" বল না। বলবে "কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ", ওটা মনুষ্যসুলভ লক্ষণ, অতএব দোষ কিসের? কিন্তু জানিবা কমলাকান্তও অহিফেন-গত-প্রাণ, সেটাও তার লক্ষণ, অতএব তাকে আর আফিংখোর বলিও না।

যদি বল, কেন, খোদা ইচ্ছাময়, তিনি কি মৌতাতী নয় এমন

কমলাকান্ত, বা দুধে জল দেয় না এমন প্রসন্ন, ইচ্ছা করলে সৃজন করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন না তাই করেন নি; তা'হলে ত তিনি আরও কত অঘটন সংঘটন করতে পারতেন,—মেয়েমানুষের হিংসা করে না এমন মেয়েমানুষ সৃজন করতে পারতেন; বিষহীন গোখুরা সৃজন করতে পারতেন; শষ্পাহারী সিংহ, মাংসাশী ঘোটক সৃজন করতে পারতেন; অমর মানুষ সৃজন করতে পারতেন; সাদা কাফ্রী ও কাল সাহেব এ সবই পারতেন! পারতেন অথচ করেন নি, একথা আমি মানি না; করেন নি পারেন নি বলে', কারণ তাঁরও কাজের একটা বাঁধন আছে; তিনি খোদা বলে' ত নবাব সিরাজুদ্দৌলা নন্।

থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গকে শ্রেণীবিশেষ থেকে আমদানী করা হয় বলে', এক শ্রেণীর ছুঁচিবাইগ্রস্ত লোক আছেন, যাঁরা থিয়েটার দেখতে যান না। ছুঁচিবাইয়ের পশ্চাতে কি আছে আবিষ্কার করবার দরকার নেই; কিন্তু তাঁরা যে চোরের উপর রাগ করে' ভুঁয়ে ভাত খান, তা'তে চোরের বড় বয়েই গেল। তাঁরা একবার ভেবে দেখেন না, সমস্ত জীবনটা যাদের সুধু অভিনয় করেই কাটে, তারা অভিনেত্রী হবে না ত হবে কে? মল্ল কেন মল্ল হবে, উকীল কেন উকীল হবে, তাঁরা একথা কেন বলেন না বুঝতে পারি না। কেউ কি দেখাতে পারেন, কোনো দেশে, কখনও যুধিষ্ঠির আর সাবিত্রীকে নিয়ে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করে' নাট্যকলার পরিণতি হয়েছে? তা' হ'তে পারে না, আর হ'তে পারে না বলেই, হয় নি। Sarah Bernhardt—যাকে Divine Sarah বলে, বা Ellen Terry, বা সুকুমারী দত্তকে যদি সাবিত্রী হ'তে হ'ত, তা হ'লে আর অভিনেত্রী

হওয়া হ'ত না। হয় সাবিত্রী নয় অভিনেত্রী ; দুইই এক সঙ্গে, হ'তে পারে না, হয় নি, হবে না। অভিনেতা সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে যদি কেউ বলেন—তবে চুলোয় যাক অভিনয় ? যায় যাক ! কিন্তু সাবিত্রীকে অভিনেত্রী করলেও তাই হবে, অভিনয় চুলোয় যাবে। থিয়েটারকে ঠাকুরঘরের আইন দিয়ে বাঁধলে চলবে না। কারও কারও ধারণা থাকতে পারে যে, বিলেতে এমনটা হয় না ; তাঁরা ভুলে যান যে, "বিলেত দেশটাও মাটির, সোনার রূপোর নয়।" সেখানে Stage একটা profession বটে এবং honorable profession‌ও বটে ; কিন্তু honorable কেন ? নাট্যশালাটা কলাভবন বলে', ঠাকুর ঘর বলে' নয় ; নট ও নটীরা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির ও সাবিত্রী বলে' নয়। সেখানে গীর্জ্জার আইন Stageএ চালাবার ধৃষ্টতা কেউ রাখে না। সে দেশে নটীরা stage থেকে বাজারে আসে, এখানে বাজার থেকে stageএ যায়—আগু আর পিছু, এইমাত্র প্রভেদ। ফলে দাঁড়িয়েছে যে সে দেশের নাট্যকলা স্ফূর্ত্ত হ'য়ে সুন্দর হয়েচে, আর আমাদের দেশে যে ভ্যাংচান সেই ভ্যাংচানই র'য়ে গেছে।

আমি একবার মস্তবড় জায়গায়, মস্তবড় শোক সভায়, উপস্থিত ছিলাম ; মস্তবড় এক মহারাজা সে সভার সভাপতি ; মস্তবড় পণ্ডিত, মস্তবড় ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মাধিকার বক্তা। যে পুরুষসিংহের মৃত্যুতে এই শোক সভার অধিবেশন হয়েছিল, তাঁকে ত আমরা "তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার" পরিয়ে ভবনদী পার করে' দিয়েছিলুম। সেইখানেই যবনিকা পতন হ'য়ে, সব শেষ হ'য়ে গেলে আমার কিছু বলবার থাকত না ; কিন্তু শোক করতে গিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র সঙ্গে, খোদার উপর খোদকারী করতে দেখে, আমার পিত্ত

পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল। বক্তার পর বক্তা উঠে বলতে লাগলেন—নাটককারের নাটকগুলি চমৎকার, বঙ্গসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নস্বরূপ; তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যও অদ্ভুত—কিন্তু, নাটক ছেড়ে নাটককারের কথা ভাবলে, হৃদয়ে অনুশোচনা আসে, দুঃখ হয়;—নাট্যকার হিসাবে এতবড় হ'লেও মানুষটা এত হীন মনে হ'লে লজ্জা হয়।

আরে আমার লজ্জাবতী লতা! প্রভুদের এই sanctimonious scruples, এই ছুঁচিবাই দেখে, আমি হাড়ে হাড়ে জ্বলছিলুম—কেন আমি বক্তৃতা করতে শিখি নাই, তা হ'লে বাক্যের বন্যায় এই খড়কুটা আবর্জ্জনাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কালাপানিতে পৌঁছে দিতুম; অথবা যদি বাহুতে বল থাকত, ত টাউনহলের থামগুলোকে আলিঙ্গনে চূর্ণ করে', Samsonএর মত নিজেও চাপা পড়ে' মরতুম—এ অমানুষগুলোকেও চাপা দিয়ে মারতুম। তা হ'ল না; যেহেতু আমি সুধুই কমলাকান্ত মাত্র। নিন্দাস্তুতির অতীত হ'লেও, মৃত আত্মার তর্পণের জন্য একটা কথাও বলতে পারলুম না বলে' আমার চোখে জল এল।

কিন্তু এত বড় সভায় কি একটা মানুষ নেই—সবাই কি নিবিমিষ্যি আতপ তণ্ডুল ও অপক্ক কদলীভোজীর দল—এমন কেউ নেই যে বলে—হে পণ্ডিতম্মন্যগণ, এ অবিভাজ্য বিভাগ কি হিসাবে কর? এ যে অদ্বৈত, লেখের অন্তরালে লেখক, সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তরালে পুরুষ! একটা দূর করে' দিলে কি আর একটা টিঁকে? রাখ তোমার ছুঁচিবাই, তোমার শবব্যবচ্ছেদ। এমন সময় এক দিব্যজ্যোতি যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান হ'য়ে সেই বিশাল কক্ষতল কম্পিত করে' গর্জ্জে উঠ্‌ল,—'গিরিশ বাবুকে ভগবান একটা অখণ্ড মানুষ করে'

পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর দেহ-মন নিয়ে তিনি একটা গোটা মানুষ; কোন্ অধিকারে আপনারা সেই গোটা মানুষটাকে খণ্ড খণ্ড করে', তার হাতটা ন'ব, পাটা ন'ব না, মাথাটা ন'ব, ধড়টা ন'ব না, এই ব্যবস্থা করচেন? নিতে হয় সমস্তটা নিন, তাঁর নাটক নিন, মদের বোতলও নিন—আর সাহস থাকে ত সমগ্র মানুষটাকে পরিত্যাগ করুন—তাঁর নাটকগুলোকে বগলদাবায় করে' মানুষটাকে সারস্বত কুঞ্জ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বহিষ্কৃত করে' দেবার আপনাদের অধিকার নেই, সাধ্য নেই।' আমি বল্লাম -বহুত আচ্ছা, জীতা রও।

যিনি যুগের মানুষ, যুগাবতার, তিনি গিরিশ বাবুর 'চৈতন্য লীলা' নাটকের অভিনয় দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন; সংজ্ঞা হ'লে নাটককারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গিরিশ বাবু তখন জগাইএর ভূমিকা গ্রহণ করে' জীবন্ত জগাইরূপে গ্রীনরুমে অধিষ্ঠান কচ্চেন। যুগাবতার সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত; একদিকে মাতাল গিরিশ, আর-একদিকে সত্ত্বগুণের আধার পরমহংস দেব; তিনি সমগ্র মানুষটাকে দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন—মদের গন্ধে ভির্মি যান নি।

আমি তাই বলি, দু'শ মানুষ খুন কর, আর রামায়ণের বিগলিত করুণার প্রস্রবণ বহিয়ে দাও; দু'শ বোতল মদ খাও, আর বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, প্রফুল্ল, সিরাজুদ্দৌলা লেখ; দু'শ রজকিনী রামীর প্রেমে মজে' মজগুল হ'য়ে পদাবলীর লহরী ছড়িয়ে দাও, আমি তোমায় মাথায় করে' নাচব। "কে কাকে মারে, তিনিই মেরে রেখেছেন" বলে' খুনকে খুন নয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করব না; মদকে 'কারণ' বলে' মনকে আঁখি ঠারব না, আর রজকিনী রামীকে শ্রীরাধিকা প্রতিপন্ন না করে' তাকে রামী ধোপানীই বলব, এবং তার সম্পর্ককে দেহের সম্পর্কই

বলব। আধ্যাত্মিক, অহেতুকী, আত্মিক ইত্যাদির কুজ্ঝটিকা সৃজন করে' বুজরুকি করব না। কিন্তু খবরদার! প্রথমটা করেই শেষ করে' দ্বিতীয়টা পাওনা রেখে দিও না, রাসলীলা করে' শেষে গোবর্দ্ধন ধারণের বেলায় পেছিও না; লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করব!

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৯

১১

আবিষ্কার না বহিষ্কার

কত হাজার বছরের কথা—মাটির ভিতর এক রাজার কবর, কবরের ভিতর মণিমাণিক্য খচিত এক স্ফটিকের পেটারি, তার ভিতর রাজার নশ্বর দেহ—কত স্নেহের, কত ভক্তির, কত সোহাগের সৌরভে ভরপুর। এক দিন পেটের দায়ে মাটি কাটচে এক চাষা, কোদালের কোণ ঠং করে' লাগল সেই কবরের গায়; চাষা খুঁড়ে চলল, ভাবলে এইবার যক্ষের ধন বুঝি মিলল; খুঁড়ে বা'র করলে সেই স্ফটিকের পেটারি, খুলে ফেললে তার ডালা—কি অপূর্ব্ব সৌরভ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সে সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত রাজার, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি সে মণিমাণিক্যের—কিন্তু দেখতে দেখতে সে সৌরভ উপে গেল, রাজার ঘুমন্ত মূর্ত্তি উপে গেল, মণিমাণিক্য ধূলায় পরিণত হল; স্পর্শ করবার আগেই, আলো লেগে, বাতাস লেগে, চাষার লুব্ধদৃষ্টি লেগে যেন সব গলে' গেল, বাতাসে মিশিয়ে গেল। চাষা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখলে মাত্র!

পেটের দায়ে না হ'ক—আর পেটের দায়ে নয়ই বা কেন? একটু ঘুরিয়ে দেখলে, পেটের দায়েই—পুরাতন কবর খুঁড়ে পুরারত্ন বা'র করবার বড় ধুম পড়ে' গেছে। টাটকা কবর খুঁড়ে মড়া বা'র করে' যারা উদরস্থ করে, তাদের বলে ghoul. Ghoul এক রকমের প্রেতযোনি, আধা মানুষ আধা ভূত। পুরাতন কবর যারা খোঁড়ে

তাদের বলে পুরাতত্ত্ববিৎ—আমি বলি পুরা-ghoul. সত্যিকারের ghoulগুলো মড়া খুঁড়ে বা'র করে' খায়, পুরা-ghoulগুলো মড়া বেচে' তার অস্থি বেচে' তার ছাই বেচে' টাকা রোজকার করে, আর সেই টাকার বিনিময়ে রুটি ও পনির কিনে খায়, এই তফাৎ। আর রাজার কবরটা—কত স্নেহে স্নিগ্ধ, কত ভক্তিতে সুরভিত, কত মহিমায় মহিমান্বিত—রাজার কবরটা উপে যায় ; উপে যায় বই আর কি বলব ? সাত সমুদ্র তের নদী পার, কোথায় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের গুদামে খণ্ড খণ্ড, শত খণ্ড হ'য়ে শত গুদামে গস্ত হয়। সে থাকাকে যদি থাকা বল ত নিমতলার ঘাটের খেয়া পার হ'লেও, তুমিও থাক আমিও থাকি, সকলেই থাকি। পাঁচ ভূতের সঙ্গে মিশিয়ে থাকি ত ?—কিন্তু সে কি তোমার থাকা না আমার থাকা ? সে ভূতের থাকা, বলতে পার বটে। তেমনি সে পুরাতাত্ত্বিক গুদামে চাবিয়ে পড়ে' থাকাকে যদি রাজার থাকা বল, আমার আপত্তি নেই।

এই পুরা-ghoulদের উৎপাত হয়েছে সব চেয়ে বেশী দুটা দেশে—মিশরে আর ভারতবর্ষে। দুটাই পরাধীন দেশ, সুতরাং ভূতের উৎপাত ত হবারই কথা। কিন্তু সেটা যে ভূতের উৎপাত আমি কমলাকান্ত বললে ত কেউ শুনবে না—বলবে গবেষণা, পুরাবস্তু-আবিষ্কার, লুপ্ত-রত্নোদ্ধার ইত্যাদি। কিন্তু আবিষ্কার মানে ত আমি এতাবৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। শুনেছি সার উইলিয়ম জোন্স্ কারও কারও মতে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আবিষ্কার করেছিলেন। সে আবিষ্কারের মানে ঠিক পাতাল খুঁড়ে বা'র করা নয় ; তার মানে হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তথা ইউরোপে কারও জানা ছিল না যে, সংস্কৃত বলে' একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে ; তিনি জানলেন এবং তাঁর দেশের লোককে

জানালেন। কিন্তু জানলেন ও জানালেন বলে' কি যত পুঁথি আর পুস্তক জাহাজ বোঝাই করে' এদেশ থেকে নিউইয়র্ক, আর লণ্ডন, আর পারিস্, আর বার্লিনে নিয়ে গিয়ে গস্ত করতে হবে? আবিষ্কারমাত্রই বহিষ্কার বা সমুদ্র পারে চালান করে' দিতে হবে? যদি বল কেউ কি জোর করে' নিয়ে গেছে? কতক জোর করেই নিয়ে গেছে, কতক চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে গেছে, কতক পয়সা দিয়েও নিয়ে গেছে। আমি সবই জোর করে' নিয়ে যাওয়ার সামিল মনে করি। বুভুক্ষিতকে উদরের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য দু' পয়সার ছাতু কিনে দিয়ে, তার কুঁড়ে ঘরে সযত্নরক্ষিত অমূল্য পুঁথিখানা দেশের কুল রাজ্যের কুলে পাচার করে' দেওয়াকে আমি জোর করে' নিয়ে যাওয়াই বলব। জোরটা সরাসরি পুঁথিখানার উপর না পড়ে' তার উদরের উপর অর্থাৎ তার প্রাণের উপর পড়ল, এইমাত্র প্রভেদ। আর ক্ষিদে বহু রকমের হ'তে পারে—পেটের ক্ষিদে, যশের ক্ষিদে, খেতাবের ক্ষিদে ইত্যাদি।

মাটির ভিতর থেকে বা মাটির উপর থেকে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করায় আবিষ্কারকের কোন স্বত্ব জন্মায় তা আমি মানি না। লড়ায়ে হারলে বিজিতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে বিজেতার স্বত্ব আমি মানি। মিসরবাসী তেল-এল-কেবিরের যুদ্ধে হেরেচে, বাঙ্গালী পলাসির যুদ্ধে হেরেচে; তার জন্য বিজেতার দাবী, পরাজিত মিসরবাসী ও বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী মানতে বাধ্য; কিন্তু সে দাবীর কথা না তুলে' যদি কেহ আবিষ্কারকের দাবীর কথা তোলে, আমি তাকে প্রতারক বলব। মহমুদ সোমনাথ লুঠ করে' লুণ্ঠনলব্ধ রত্নসম্ভার গজনি চালান করেছিল, আবিষ্কারকের বুজরুকি করেনি। আর লুণ্ঠনকার্য্যটা জয়ের অব্যবহিত পরেই কর, আর র'য়ে-বসে' সুবিধামত করতে থাক, একই কথা।

'কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করে' বল, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব। আর আবিষ্কার করলে যদি স্বত্বই জন্মায়, আমি বলব আবিষ্কার করা ব্যবসাটা ছাড়! এ তোমার মাটি খুঁড়ে কয়লা আবিষ্কার করা নয়; নিয়ে যাও তুমি কয়লা, নিয়ে যাও তুমি সোনা, আর তাঁবা, আর লোহা, আর টিন—তা'তে ভারতবর্ষ গরীব হবে না; কিন্তু আবিষ্কার আর পুরাতত্ত্বের নামে কবর খুঁড়ে মহাপুরুষের অস্থি—আর মন্দির হ'তে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি,—মন্দিরগাত্র হ'তে অপূর্ব্ব চিত্র আর কারুশিল্পের নিদর্শন জাহাজে বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেও না, তা'তে ভারতবর্ষের যে দীনতা আসবে তার সীমা নাই; ঐ অস্থি, ঐ প্রতিমূর্ত্তি, ঐ শিল্প-মহিমা ভারতকে একদিন প্রাচ্যদেশের তীর্থস্থান করেছিল, ভবিষ্যতের সে সম্ভাবনাকে একেবারে অসম্ভব করে' দিও না।

লর্ড কর্জ্জনের আইন পুরাবস্তুকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেচে; পুরাবস্তু অর্থে মাটির উপর বা গুহার মধ্যে যা কিছু দৃশ্যমান; সেগুলিকে নষ্ট করার বা বিকৃত করার প্রতিষেধক কতকগুলি আইন-কানুন হয়েচে। তা'তে কবর খুঁড়ে অস্থি বা ভক্তগণ-স্থাপিত মূর্ত্তিকে, স্থানচ্যুত করে' গুদামজাত করার কোন প্রত্যবায় হয় নি। ভারুটের বৌদ্ধস্তূপের বিচিত্র শিল্প-সম্পত্তি কলিকাতার যাদুঘরে জমা করা দেখলে, চিৎপুরের ট্রামের ঘর্ঘর, বেচা-কেনার কোলাহল কচ্‌কচি, ধূম ও ধূলার অন্ধকারে, খাঁচার ভিতর বন্দী কোকিল বা পাপিয়ার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে; মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ থেকে বঞ্চিত করে' যে হৃদয়হীন তাকে চিৎপুরের জাফ্রিঘেরা বারান্দার ভিতর পিঞ্জরবদ্ধ করেচে তাকে অভিসম্পাত করতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় বন্দী পাখীগুলোর মত বন্দী পাথরগুলোর প্রাণ আর্ত্তনাদ করচে! তাই আমি বলি

যেখানে যা পাও বা আবিষ্কার কর, সেইখানেই যত্ন করে' সংরক্ষণ কর ; স্থানচ্যুত করে' সংরক্ষণ, ইতিহাসেরও মাথায় পা দিয়ে ডুবান। খরচে কুলাবে না—পয়সা নেই, সে সব বাজে কথা। যদি সে খরচ না যোগাতে পার, আবার বলি, আবিষ্কার করা ছেড়ে দাও। যেখানকার জিনিষ সেইখানেই থাক, এতদিন ত ছিল, আরও কিছুদিন থাক। ভক্তের আরাধনার বস্তু ভক্ত যেখানে স্থাপন করেছিল—সেই জল স্থল আকাশ নদ নদী বৃক্ষলতা তারই মধ্যে থাক ; সেখান থেকে তুলে এনে গুদামঘরে পুরে রাখলেই কি ভক্তের বুকে, আর সেইসঙ্গে ইতিহাসের বুকে ছুরি দেওয়া হয় না ? তুমি বলবে ভক্ত কই ? সে ঠিক কথা, ভক্ত নেই, ঐতিহাসিক আছে। মুসলমান ভাইসকলের প্রতাপে কোন নিভৃত জঙ্গলের ভিতরকার একটা ক্ষুদ্র দরগার একখানি ইষ্টক সরিয়েছ কি কানপুরী দাওয়াইএর ব্যবস্থা। মুসলমান ভাইগণের এই জবরদস্তি ভাবকে কেউ কেউ fanaticism বলেন ; কিন্তু এই fanaticism পুরাবস্তু সংরক্ষণকল্পে লর্ড কার্জ্জনের আইন অপেক্ষা বলবান। কিন্তু আমরা জবরদস্ত নই—আমরা উদার, আমরা মহান, আমরা সনাতন ! ইটালি যখন অষ্ট্রীয়ার কুক্ষিগত, গ্রীস যখন বারভূতের সম্পত্তি, তখন ঐ দুই দেশের পুরাবস্তু নিয়ে অনেকেই ছিনিমিনি খেলেছিলেন—যে যা পেয়েচেন লুটে নিয়ে গিয়েছিলেন ; ইটালিকে এখন সে সকল art treasure ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্চে ; ভারতের লুণ্ঠিত রত্নরাজি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কবে হবে ? কে করবে ?

২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৯

১২

"নিরুপদ্রবী"

অহিফেন প্রসাদাৎ আমি বহুদিন যাবৎ প্রায় সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ব্যাপারের সঙ্গে অসহযোগ এবং খুব নিরুপদ্রব অসহযোগ করে' বসে' আছি; কেবল একটি জিনিষের সঙ্গে করি নাই, কেননা করিতে পারি নাই, সেটি প্রসন্নের মঙ্গলা গাইয়ের দুধ। এবং আমার বিশ্বাস যতক্ষণ দুধে হাত না পড়ে, ততক্ষণ নির্ব্বিবাদে অসহযোগ নীতি খুব নিরুপদ্রব ভাবেই অনুসরণ করা চলে। পেটে খেলে পিটে সয়; কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই প্রাণধারণের উপায়ীভূত দুধ বা ভাত বা দুধ-ভাতের উপর কেহ উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন আর উপদ্রুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিরুপদ্রব থাকা চলে না। যদি সে নিদারুণ অবস্থাতেও সে বা তারা নিরুপদ্রব থাকে, তবে বুঝতে হবে যে সে বা তারা সব উপদ্রবের বাহিরে গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ গতাসু হয়েছে।

বার্ণহাডির War is a biological necessity-মন্ত্রের উপাসক জার্ম্মাণ জাতি ফরাসির ঠেলার চোটে মন্ত্রটাকে পাল্‌টে নিয়ে Non-violent non-co-operation is a logical necessity এই নূতন রূপ প্রদান করায় আমার বড় আনন্দ হয়েছিল; আমার নিরুপদ্রব অসহযোগনীতি যে কতখানি প্রসারলাভ করল তা ভেবে আমার মনে গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম; কিন্তু তখন একবার ভেবে দেখবারও

প্রবৃত্তি হয়েছিল, এমন দুর্দ্দান্ত জাতটা একমুহূর্ত্তে এতটা নিরীহ হ'য়ে গেল কেন? দেখলাম আমারও যে-দশা জার্ম্মাণিরও সেই দশা। প্রথম, আমার মত জার্ম্মাণি অহিফেন ধরিয়াছে, অর্থাৎ আমার মত জীবন সংগ্রামে হারিয়া যুদ্ধ করার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়, আমার মত তাহার সুবুদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটনাস্রোত যেদিকে বহিয়া চলিয়াছে তাহার উজানে গিয়া হাত পা ক্লান্ত করা নিষ্প্রয়োজন—টানে যেখানে লইয়া চলে চলুক—চেষ্টা করিয়া লাভ নাই—এই রকমের একটি খুব গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বন্যা দেশটার একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে। তৃতীয়, আমার মত তার এখনও দুধে হাত পড়ে নাই, অর্থাৎ ঘরে ভাত যথেষ্ট আছে তাই "কে যায় সাগর পার", এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। চতুর্থ, আমার মত সে নখ-দন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে; কালীপূজার পাঁঠাবলিতে তার কোন ইষ্ট নাই, সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। নখদন্তহীনের ধর্ম্ম নিরুপদ্রব অসহযোগ, তাই সে আজ নিরুপদ্রব অসহযোগী।* অবশেষে, আমার মত পৃথিবীতে স্বর্গটা নামিয়া আসিবে এই বিশ্বাস জার্ম্মাণির হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আফিম সেবনের যেটা পরম পরিণতি তাহাই ঘটিয়াছে।—

A day must come, asserted the Chancellor (Cuno), when honest agreement between equal nations would replace military dictation. He saw, as the other side must see, that unarmed Germany could not be conquered by arms. Till then the Germans must endure.

এ কথা এক কমলাকান্ত ও কমলাকান্তধর্ম্মী পুরুষের মুখেই শোভা পায়। কেবল এক মন্ত্র কমলাকান্ত বিশ্বাস করে যে, সেদিন আসিবে

যেদিন মানুষে মানুষে তফাৎ থাকিবে না,—সকলেই মৌতাতী হইবে। আর হাতিয়ার থাকিলেই মানুষকে বশ করা যায় না ; নিরস্ত্রকে কাটিয়া ফেলা চলে কিন্তু conquer করা চলে না। তবে ভূতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কমলাকান্তকে তথা তার মত নিরুপদ্রবীকে endure করিতে হইবে—অর্থাৎ সহ্য করিতে হইবে, এবং ধৈর্য্য ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কেননা, না বাঁচিয়া থাকিলে স্বর্গ নামিয়া আসিবে না, তাহাকেই স্বর্গারোহণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমার মৌতাত যখন পাতলা হইয়া আসে, তখন আমার নিরেট অর্থাৎ জমাট বুদ্ধিটাও একটু তরল হইয়া পড়ে এবং সন্দেহ সুবুদ্ধির মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে জ্বালাতন করে ; তাহার কোন প্রতিকার না করিতে পারিয়া আমি একমাত্রা আফিম চড়াইয়া সে সন্দেহকে ঘুম পাড়াইয়া দি। সন্দেহটা এই—জার্ম্মাণি যে আমার অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়া আমাকে এবং নীতিটাকে ধন্য করিয়াছে সেটার শেষ পর্য্যন্ত মান রাখিবে ত ? তার মান রাখিতে হইলে দুইটা কার্য্য করিতে হইবে ; এক, ফ্রান্সের দাবী শেষ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করা, আর শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ না করা। কারণ ফ্রান্সের দাবী গ্রাহ্য করিয়া একটা মিটমাট করিতে রাজি হইলে, অথবা অস্ত্রের মুখে ফ্রান্সের ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর দিলে, অসহযোগ পণ্ড হইয়া গেল। মনে কর ঘরে চোর ঢুকিয়াছে, ঘটীই লউক, আর বাটীই লউক, আমাকে নিশ্চেষ্ট হইয়া চোরের সুপ্ত বিবেক যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ চুপ করিয়া নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া শুইয়া চোরকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে, তবে আমি নিরুপদ্রব অসহযোগী। চোর চোর করিয়া চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক ডাকিয়াছি কি (চোরের গলাটেপা ত দূরের কথা) আমার

ধর্ম্মও গেল, জিনিষও গেল, চোরকে সাধু করাও হইল না! জার্ম্মাণি শেষটা সেই প্রকার ছেলেমানুষী করিয়া সব পণ্ড করিয়া ফেলিবে না ত? মাঝে মাঝে guerilla warfareএর ধুয়া তুলিতেছে, শেষে শত্রুর গায়ে সত্য সত্যই হাত তুলিয়া বসিবে না ত?

আর যদিই বসে, নিরুপদ্রবতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার আমার অনেক পন্থা আছে, সেজন্য আমি ভাবি না। প্রথমেই আমি বলিব East is East and West is West, the twain shall never meet—সুবুদ্ধি হইয়াছিল তাই জার্ম্মাণি আমার আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রাখিতে পারিবে কেন? জার্ম্মাণি গরু খায়, শূয়র খায়, আমি চতুষ্পদের মধ্যে আর সব খাই বটে (অন্তত যতদিন দাঁত ছিল খাইতাম) কিন্তু ও-দুটো বাদ; আর দ্বিপদের মধ্যে যেটা সব চেয়ে জঘন্য, অর্থাৎ মুরগী, তাহা আমি স্পর্শ করি না, মুরগীর ডিমও খাই না, যদিও হাঁসের ডিমে আমার আপত্তি নাই। এ সব মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিতে যে কার্য্যের পার্থক্য হইবেই তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৯

১৩

যে হেতু আমরা ভাই ভাই

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—রাঢ়ীর সঙ্গে বারেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ, মনের ভিতর বেশ তফাৎ করে' রেখেচি, যদিও মুখে খুব ভদ্রতা করে', অর্থাৎ চালাকি করে' বলি—আমরা ভাই ভাই।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—ছত্রিশ জাতের খোপের ভিতর পুরে' ভাইগুলিকে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করে' রেখেছি ; খোপের বা'র হ'য়ে ভাইটি আমার খোপের দিকে এসেছেন কি অমনি চঞ্চুর আঘাতে তাঁকে দূর করে' দিয়ে বলি—"খোপের মাহাত্ম্যটা না মানলে সমাজ ছড়িয়ে পড়বে, খোপটা আছে বলেই আমরা আছি, নহিলে কবে আমাদের এই পারাবত গোষ্ঠিকে বেরালে শেষ করে' দিত, অতএব খোপের বাহিরে আসিও না।" মাথার উপর যে বাধাহীন আকাশ বলচে—আমি আছি, আমি বাধাহীন বলেই তোমরাও আছ, সে অশরীরী বাণী—খোপের ভিতরে বসে' শুনেও শুনচি না। ভাই ভাইএর জীবনস্রোতের অবাধ প্রবাহে যতকিছু বিঘ্ন সৃজন করতে পারি, তা বেশ বুদ্ধি করে' সৃজন করেচি—শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাকে আষ্টেপিষ্টে শৃঙ্খলিত করেচি।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—বেহারী ভাই বরাকর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলচেন, প্রবেশ নিষেধ—Behar for the Beharees ; উড়িয়া ভাই বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে বলচেন—Orissa

for the Oryas—আসামের ভাই সকল বলতে স্থরু করেছেন—Assam for the Assamese আমরা বাঙ্গালী এখনও মুখ ফুটে বলি নি—Bengal for the Bengalis, কিন্তু বল্লুম বলে' আর দেরী নেই। আঁতের কালি মুখে ফুটে বেরুবেই, কিন্তু সে সত্যকথা গোপন করে' তথাপি বলব—যেহেতু আমরা ভাই ভাই—

মুসলমান ভাই যখন Corporation বা Legislative councilএ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের (Communal representation) আবদার করচে, তখন মুসলমান ভাইএর ভ্রাতৃবৎসলতার অভাব দেখে আর্ত্তনাদ করলে চলবে কেন? বুকের উপর হাতটা দিয়ে একবার বুঝলেই বুঝা যাবে, যে ভাইএর এই আবদার অপেক্ষা গণতন্ত্রের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের প্রকৃত কারণ কি! পেটের জ্বালায় মুসলমান ভাই যখন গোমাংস খাওয়া হ'তে বিরত হ'তে পারবে না, তখন তুমি হিন্দু ভাই, তার পেটের জ্বালাটাকে না মেনে, গোমাতার প্রতি অধিকতর স্নেহবান হ'য়ে, ভাইএর চেয়ে গরুকে অধিক ভালবাসলে, মুসলমান ভাই যদি বলে—রইল তোমার হিন্দু-মুসলমানের একতা,—তা'তে আঁতকে উঠলে চলবে কেন? ভাইএর পেটের জ্বালায় প্রাণ কাঁদল না—যত দুঃখ গো-বধে। ভাইএর চেয়ে গরুর আদর, তথাপি বলবে—যে হেতু আমরা ভাই ভাই—

এ ভণ্ডামি, এ আত্মপ্রতারণায় কে প্রতারিত হবে? রাজাও নয়, রাজরাজেশ্বরও নয়। অতএব অভিনয় ছাড়—এক সানকিতেই খাও, আর বক্তৃতা-মঞ্চে পরস্পর জড়াজড়ি কর, এ অভিনয়ের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত একদিন করতে হবে। ভাইএর প্রতি ভাইএর প্রকৃত মনোভাবটা লুকিয়ে রাখচ, কেবল স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করবার সাহস

নেই বলে' ত? আমি বলি এটা একটা উৎকট ব্যাধি; রোগ চাপলে মজ্জায় গিয়ে পৌছায়; রোগের স্বচ্ছন্দ বিকাশ হ'তে দাও—হয় রোগ যাবে, নয় রোগী যাবে। কিন্তু চেপে রাখলে রোগীকে রক্ষা করে ধন্বন্তরীরও সাধ্য নাই। নয়ত সুচিকিৎসক ডাক, সময় থাকতে ডাক, যদি উপায় হয়।

এই বিপুল বৈচিত্র্যময় দেশের অতীত ইতিহাসে ভাই ভাইএর মিলন ঘটাবার বহুবার চেষ্টা হ'য়ে গেছে। একজন বলেচেন—"আমার ভাই হবে ত হও, নইলে তোমায় কতল করব।" বলা বাহুল্য তা'তে ভাই ভাইএ মিলন হয় নি। আর-একজন বলেচেন—"আমার এই ছত্রিশ খোপের দরজা খুলে দিলাম, যে আসতে চাও এস, এ ছত্রিশ খোপের একটা খোপে তোমার স্থান করে' দেব।" তা'তেও সে ছত্রিশ কর্ত্তে ছত্রিশই র'য়ে গেছে, ভাই ভাইএ মিল হয় নি।

আমি বৃদ্ধ কমলাকান্ত ঠিক খোলসা করে' বুঝে উঠতে পারচি না কি করলে, এ ভাই ভাইএর বিরোধজনিত যে পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি বৃদ্ধ আমি ভীতু, যুবা যে সে নির্ভীক; যুবা বলবে ভয় কি? আমি বলব ভরসা কিসের? যৌবনের রোগ বড়কে ছোট করা; বার্দ্ধক্যের রোগ ছোটকে বড় করা; দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত জঞ্জাল, যৌবন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে; বার্দ্ধক্য চুল চিরে দেখবে, সাবধানে পা ফেলবে, একটা কাঁকর পায়ে ঠেকলে চমকে উঠবে; যৌবনের ব্যাধি দুরাশা, বার্দ্ধক্যের ব্যাধি নৈরাশ্য; যৌবনের ব্যাধি বন্ধনহীন স্বাচ্ছন্দ্য, বার্দ্ধক্যের ব্যাধি শাস্ত্র; যৌবনের খরস্রোত পাহাড় কেটে তীর বেগে ছোটে, বার্দ্ধক্যের মন্থর গতি, পথশ্রান্ত হ'য়ে সমতল ক্ষেত্রে শতধারায় বিভক্ত হ'য়ে সাগরে মিশিয়ে গিয়ে বাঁচে।

অতএব এস যৌবন, এস রাজপুত্র, এস ভিখারী, এস জ্ঞান, এস মমতা, তোমাকে আমি এ ভারতভূমির মহিমাময় যুগে দেখেছি, আবার তোমার আগমন প্রতীক্ষা করে' বসে, আছি—এস, এস। ভাইএর সঙ্গে ভাইএর মিলন ঘটিয়ে দাও—কারণ আমরা যে সত্যই ভাই ভাই। ভয়ঙ্করের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভীত ভীতের হাত ধরে' ভরসা পায়, নির্য্যাতনের চোটে মানুষে মানুষে মিল হয়, উদরের জ্বালায় লোকে একজোট হয়; কিন্তু যেমন ভয়ের কারণ দূরে যায়, নির্য্যাতনের জ্বালা প্রশমিত হয়, উদরের জ্বালা নেভে, তখন আর কেউ কা'কেও চেনে না, তখন আবার মানুষ নিজ মূর্ত্তি ধরে, মুখে বলে ভাই ভাই, মনে মনে ছুরি চোকাতে থাকে। তাই ডাকছি তোমাকে, হে রাজপুত্র! তুমি যে জ্ঞান যে মমতা নিয়ে মানুষের ভিতর সুধু মানুষটাকে দেখেছিলে, দেখিয়ে দিয়েছিলে—যে জ্ঞানের মহিমায় জাতি বর্ণ দেশ কাল সব ভুলে গিয়ে, মানুষ আপনার মানুষত্ব ফুটিয়ে তুলেছিল—সেই জ্ঞান ও মমতা নিয়ে, হে রাজপুত্র, হে ভিখারী, আর একবার এসো, এসো—দেখিয়ে দাও আমরা সত্যই ভাই ভাই।

২৫শে চৈত্র, ১৩২৯

১৪

সাবধান!

[ফরাসডাঙ্গার গৌর-বিল প্রতিবাদের আড্ডায় পঠিত]

যে হেতু এই সভায় স্বাধ্যায়ী চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, অহিফেনসেবী হইলেও, সনাতন ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী বলিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিবার অধিকারী বিধায়, সশরীরে উপস্থিত হইতে অপারগ হওয়ায়, পত্র দ্বারা আমার বক্তব্য বলিয়া পাঠাইলাম, ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

আদাবন্তে চ মধ্যে চ, আমার মূল কথা আমি গৌরবিলের একান্ত বিরোধী ; এবং এ সভায় বাদী অথবা তদীয় অলি অছি উপস্থিত না থাকিলেও, বিচারকার্য্য এক তরফাও যখন হইবার আইন আছে, আমি একজন প্রতিবাদী হইয়া আমার বক্তব্য আপনাদিগের নিকট পেশ করিতেছি ; আপনারা বিচারকর্ত্তা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ যদ্রোচতে তৎ ক্রিয়তাম্। বাদী যথাকালে ছানি করিতে পারেন, যদি তাঁর অভিরুচি হয়। অতএব এক তরফায় দোযো নাস্তি।

আমার এই গৌরবিলের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি—এ গৌর কে? তার পরিচয় কি? অজ্ঞাতকুলশীলস্যামলং দেয়ো ন কস্যচিৎ,

অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলশীলকে কথনও আমল দিবে না, এই শাস্ত্রবচনাৎ— প্রথমেই অনুসন্ধান করে' দেখা উচিত এ গৌর কে? ইনি কি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র গৌরচন্দ্র, যিনি নদীয়ায় পূর্ণচন্দ্ররূপে উদিত হ'য়ে আচণ্ডাল মুসলমানে পর্য্যন্ত প্রেম বিলিয়েছিলেন? না, তিনি নন্ নিশ্চয়; যেহেতু নদীয়ার চাঁদ দিল্লীতে উদিত হয়েছিলেন তস্য প্রমাণাভাবাৎ। তবে ইনি কে? আমরা কেহই "তাঁরে চোখে দেখিনি, সুধু বাঁশী শুনেছি", অর্থাৎ তাঁর বক্তৃতা পড়েছি; আরও শুনেছি "সে থাকে গোকুলে", অর্থাৎ Legislative Councilএ, যথায় বহু গো-কুল একত্র হয়েছেন। অতএব অপরিচিত ব্যক্তিকে কোনমতেই আমল দেওয়া উচিত নহে।

কিন্তু নদীয়ার গৌরচন্দ্রের সহিত এই গৌরের নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর একটু সাদৃশ্য লক্ষিত হচ্চে, যার জন্য তাঁর রচিত বা উদ্ভাবিত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা খুব তীব্র হওয়া উচিত। নদীয়ার গৌরচন্দ্র প্রেম বিলিয়েছিলেন যাকে-তাকে; যে চেয়েচে সেই পেয়েচে, যে চায় নি সেও' পেয়েচে। এমন দো-চোকো ব্রত করে' হয়েছিল— এলাহি কারখানা; হিন্দু-মুসলমান সব এক গাড়ে হ'য়ে গিয়েছিল, হিন্দুধর্ম্মের মূল যে 'জাত' তা কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল, তার ঠিকানা ছিল না, নেড়ানেড়ির সৃষ্টি হয়েছিল। নাগপুরী গৌরেরও মতলব ভাল নয়, ঐ রকম এলাহি কারখানা করবার একটা মতলব তাঁর বিলের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। বিলের বক্তব্যটা ঠিক আমার জানা নেই, জানবার দরকারও নেই, কিন্তু জাত-টাত আর থাকবে না, যে যাকে পাবে ধরে' ধরে' বিয়ে করবে, এই রকম একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটবে শুনচি, অতএব বিলের বিরুদ্ধে আমি Protest কল্লাম।

আর একবার জাতের মাথা খেয়ে ছিলেন বুদ্ধদেব, যিনি আমাদের দশ্ অবতারের এক অবতার। বুদ্ধদেব লোকটা বড় জবরদস্ত ছিলেন, —হাজার হোক রাজার ছেলে ত! চাতুর্ব্বর্ণ্য নষ্ট করে' দেশটার খুব উন্নতি হয়েছিল শুনিচি ; কিন্তু ধর্ম্মটা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। দেশ উন্নত হ'য়ে ত কোন লাভ নেই, ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে যে পরকাল নষ্ট হ'ল, তার হিসাব ত কেউ রাখে নি! তাই শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভব হ'ল ; তিনি আবার নষ্ট জাত উদ্ধার কল্লেন ; হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বৌদ্ধধর্ম্ম বাপ্ বাপ্ করে' "চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপানে" গিয়ে আশ্রয় নিলে ; যে যে দেশে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেগুলো আজ পর্য্যন্ত স্বাধীন, (ব্রহ্মদেশ মাত্র কাল পরাধীন হয়েচে) আর আমরা হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই লাথির পর লাথি, আর জুতার পর জুতা খাচ্চি ; কিন্তু বদ্ধজীব আমরা, আমাদের বুঝা উচিত, আমাদের পরকালটা কি রকম পাকা হ'য়ে গেছে, আর ইহকালে কি অমূল্য নিধি আমরা লাভ করেচি—"চাতুর্ব্বর্ণ্যে"র স্থলে আমরা "ছাত্রিশবর্ণ্য" পেয়েছি ; এই "ছাত্রিশবর্ণ্য"টা যে নষ্ট করবে তার বুদ্ধদেবের ন'গুণ পাপ হবে,—(চার নয় ছত্রিশ)—যে রক্ষা করবে তার শঙ্করাচার্য্যের ন'গুণ পুণ্য হবে ; দেশটা উচ্ছন্ন যাবে তার জন্য ভাবলে চলবে না, (ইহলোকের খেলা আর ক'দিন ?) আমাদের পরকালটা যে ন'গুণ উজ্জ্বল হবে সেটা ভুললে চলবে না।

এই "ছাত্রিশবর্ণ্য"টাকে রক্ষা কি করে' করা যায় "প্রশ্ন ইহাই এখন"। প্রশ্ন বড়ই সঙ্গীন ; কেননা ম্লেচ্ছ শিক্ষা ও সংস্কারের সংস্পর্শে এসে অবধি আমাদের সনাতন শিক্ষা-সংস্কার কি রকম আমাদের অজ্ঞাত-সারে যে বদলে যাচ্ছে তা একটু প্রণিধান করে' দেখলেই বুঝা যাবে।

প্রথমতঃ, ভূদেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি কি রকম শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়েচে লোকে? অথচ এককালে ব্রাহ্মণের পদাঘাত বুকে ধারণ করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে ব্রাহ্মণ ঠিক একালের ব্রাহ্মণের মত নয় হয়ত; কিন্তু ব্রাহ্মণের আবার রকমফের কি? ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, গলায়-পৈতে বামুন নয়, সে ত একটা হেঁয়ালীর কথা! ম্লেচ্ছ-সংস্কার বশতঃ শূদ্র আবার ব্রাহ্মণের জাতি-বিচার করতে বসেচে, এর চেয়ে অধঃপতন কি হ'তে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, গুরুপুরোহিতের প্রতি অশ্রদ্ধা। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে why and wherefore জিজ্ঞাসা করতে শিখে, গুরু-পুরোহিতের আর সে আদর নাই; "গুরুগ্ গাই" ত উঠেই গেছে, গুরু পুরোহিতের সুধু নিজ নিজ ব্যবসায়ে আর পেট ভরে না; তাঁদের "আরও আরও কার্য্য" করতে হচ্ছে। কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন!

তৃতীয়তঃ, দেশে বহুবিবাহরূপ কন্যাদায় প্রশ্নের যে সুন্দর সমীচীন মীমাংসাটা অনাদি কাল থেকে চলে আসছিল, ম্লেচ্ছ সংস্কারের তাড়নায়, তার বিরুদ্ধে লোকমত বলে' একটা মত খাড়া করে', তাকে নষ্ট করা হয়েছে। উচিত ছিল, বহু বিবাহটা কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বজায় রাখা, উপরন্তু সকল জাতের মধ্যে প্রসার করে' দেওয়া; তাতে কুলীনের ছেলের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'য়ে যেত বটে, কিন্তু সমাজের কি উপকারটা না হ'ত? এক একটি পুরুষের ডজন ডজন স্ত্রীর ব্যবস্থা থাকলে, এতদিন কন্যার বিবাহ problemটা solve হ'য়ে যেত, আর এই আক্রাগণ্ডার দিনে স্বামীগণের এক একটা ছোটোখাটো জমীদারির ব্যবস্থা হ'য়ে যেত। ম্লেচ্ছ-সংস্কারের ফলে সে শুভ ব্যবস্থা হ'তে পেলে না!

এ ত গেল প্রচ্ছন্ন আক্রমণ, surreptitious attacks.

খোলাখুলি রকমে তিন তিন বার হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ আক্রান্ত হয়েছে ; একবার হয়েছে, যখন আইন করে' সতীদাহ উঠিয়ে দেওয়া হয় ; সেই অবধি ভারতে সতীধর্ম্ম একরকম উঠে গেছে বল্লেই হয় ; এখন যা আছে সব ঝাঁকড়ে সতী, কেননা রাং কি সোনা পুড়িয়ে যাচাই করে' নেবার ত উপায় নেই ; এটা কি সমাজের কম ক্ষতি !

তারপর বিধবা-বিবাহ বিধি ; এ কি কম সর্ব্বনাশের কথা ? সতীদাহ ত বন্ধ, তারপর গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্, সতীর পুনশ্চবিবাহ-ব্যবস্থা ! এতে হিন্দু সমাজের উচ্ছন্ন যাবার আর কি বাকি রইল ?

তারপর সম্মতি আইন ; রজঃস্বলা হবামাত্রই হিন্দুধর্ম্মমতে গর্ভাধান করতে হবে। শাস্ত্র বলচেন, প্রকৃতি বলচে, স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হবামাত্র গর্ভাধান কর, তা' স্ত্রীর বয়স ১০ই হ'ক, আর ১১ই হ'ক, আর ১২ই হ'ক ; কিন্তু আইন তা করতে দেবে না। ফল হয়েছে এই যে, ঠিক শাস্ত্রমত ছেলে না হওয়ায়, যত অকালকুষ্মাণ্ডের জন্ম হচ্ছে।

বার বার তিন বার ! আর নয়। ম্লেচ্ছ রাজা, ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন রাজদরবার, সে রাজা বা রাজদরবারের কি অধিকার আমাদের সামাজিক-জীবনের বা ধর্ম্ম-জীবনের উপর হাত দেয় ? হ'লই বা আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ! জাত গেলে ধর্ম্ম কোথা থাকে ? সেই জাত পাকে-প্রকারে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েচে ! কেহ বলবেন, এতে সমাজের উপকারই হবে ; হয়ত হবে, কিন্তু জাত যাবে যে, ধর্ম্ম যাবে যে, পরকাল যাবে যে, তার কথা কে ভাবচে ? আপনারা ভাবচেন, আর আমি কমলাকান্ত ভাবচি, তাই ভরসা ! থাক্ ধর্ম্ম যাক্ প্রাণ ! বার বার তিনবার হ'য়ে গেছে, বস্ আর না, আমরা গোরের বিল চাই না। এ সময় যদি আমরা আলগা দিই, বার বার

চারবার হবে, তারপর আর ঠেকান যাবে না, সমাজ গড়ের মাঠ হ'য়ে যাবে, কোন বাচবিচার থাকবে না, আবার বুদ্ধ চৈতন্যের যুগ ফিরে আসবে, তা হ'লে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকবে না, অতএব হিন্দুধর্ম্মও থাকবে না—সাবধান !

১৪ই চৈত্র, ১৩২৯

———

১৫

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞানে মোক্ষ, বিজ্ঞানে ভবযন্ত্রণার পরিসমাপ্তি; বিজ্ঞানে সাজুয্য, সালোক্য ইত্যাদি পরলোকের পারিতোষিক মিলে; কিন্তু ইহলোকে সুধু বিজ্ঞানে বড় সুবিধা হয় না। ইহলোকের দেবতাগণের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্তির জন্য, বিজ্ঞানের উপর বিজ্ঞাপনের বাহার চড়াতে হয়; বিজ্ঞান না থাকলে সে বাহার আরও একটু খোলতাই করে' দিতে হয়, তা হ'লেই সাজুয্য বা সালোক্য মিলতে পারে—যেহেতু স্বর্গের দেবতা অন্তর্যামী, ইহলোকের উপরওয়ালারা অন্তর্যামী ত নহেনই, বরং তাঁরা জেগে ঘুমান। চোখে আঙ্গুল না দিলে তাঁদের ঘুম ভাঙ্গে না—এই চোখে আঙ্গুল দেওয়ার নামই বিজ্ঞাপন।

নীলকমল পাগল, তাই বলেছিল যে, তার অধিকারী মহাশয় তার গুণের আদর করেন বলে' তাকে আদর করে' ১০ টাকা মাইনে করে' দিতে চেয়েছিলেন। গুণ অনেকেরই আছে, কিন্তু অধিকারী মহাশয়েরা পারতপক্ষে তা' স্বীকার করতে প্রস্তুত নন্, আদর করা তো চুলোয় যাক। এই জীবন-রঙ্গমঞ্চে অনেক নটেরই কিছু-না-কিছু গুণপনা আছেই আছে, বা গুণের খোশনাম আছে; কিন্তু অধিকারী মহাশয় তা বুঝেন না! গুণ থাকলেই গুণের খোশনাম থাকে না;—অনেকে মদ না খেয়ে মাতাল, আফিম না খেয়ে মৌতাতী,

ধন না থেকেও ধনাপবাদগ্রস্ত ; আবার গুণ থাকতেও অনেকের "কোন গুণ নাই, তার কপালে আগুন।"

অন্তর্যামী জানলেই হ'ল, আর কেহ জানল আর না জানল যাদের একই কথা, সে পরকালগস্ত খেয়ালীদের কথা ছেড়ে দিলাম। যাঁরা নটরাজ মানেন না, অধিকারী মহাশয়কেই মানেন, তাঁদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সদুপদেশ আমি মৌজের মাথায় বলে' যাচ্চি শ্রবণ কর। কবি বলেচেন—Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. এই তৃতীয় শ্রেণীর greatness কি উপায়ে লাভ করা যায়, আমি তার কতকগুলি মুষ্টিযোগ বলব মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যারা great না হয়েও great হ'তে চায়, এবং যারা চায় না, উভয় শ্রেণীর লোকেরই উপকার হবে।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে শতকরা ৯৯ জনের বড় হওয়া-না-হওয়া বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। কবি বলেছেন—Sweet are the uses of adversity, কিন্তু আমি বলি,—Sweeter are the uses of advertisement. বিজ্ঞাপন আর hypnotism একই মূল সূত্রের উপর অবস্থিত। ঘুমাও-ঘুমাও-ঘুমাও পুনঃপুনঃ বলতে বলতে হাত-চালা দিয়ে যেমন hypnotiser ঘুম পাড়ায়, কানের কাছে কেবল ঘুম, আর ঘুম, আর ঘুম, ঘুমন্ত স্বরে ধ্বনিত হ'তে হ'তে যেমন সত্যিই ঘুম আসে—ঘাটে মাঠে পথে আকাশে বাতাসে কেবল তোমার গুণের কথা, তোমার রূপের কথা, তোমার ঐশ্বর্য্যের কথা, তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা, তোমার শৌর্য্যের কথা, তোমার লেখনীচাতুর্য্যের কথা—তুমি যেটাকে ফুটিয়ে তুলতে চাও,—ক্রমাগত চিত্রিত, বিচিত্রিত,

কতবড় সাধু, বা কতবড় পণ্ডিত, তা' বেশ স্পষ্ট করে' বলে' দাও, এবং অপরের নাম দিয়ে সে paraটি সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দাও। সংবাদ পত্রের authentic মানে একটা নাম আর ঠিকানা, সুতরাং সে authenticity দেবার ভাবনা নেই; তোমারই রচিত para তোমার গুণ দুনিয়ায় ছিটিয়ে দেবে, এবং কোন-না-কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে সে বীজ পড়ে' অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হ'য়ে উঠবে। একজন খোসামুদে কোন লোহার কার্ত্তিক বাবু সম্বন্ধে বলেছিল—"বাবুর রংটা শ্যামবর্ণ হ'লে কি হয়, রংএর জলুস কি রকম!"—এইখানেই advertisementএর মূল তত্ত্ব ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে; এই রংএর জলুসটাই বিজ্ঞাপনের আখ্যান বস্তু, শ্যামলিমা নয়। তোমার সকল চাটুকারের মূল চাটুকার তুমি স্বয়ং, তুমি যেমন তোমার খোসামোদ করতে পার, এমনটি আর কেউ পারে না; সুতরাং তোমাকেই চাটুকারের চটুল বাক্যের ফোয়ারা ছুটাতে হবে, তোমার শ্রাদ্ধ তোমাকেই করতে হবে। চক্ষুলজ্জা করলে চলবে না; আর সংবাদ পত্রের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার চোখাচোখি যে হবেই তার ত কোন কথা নেই, অতএব চক্ষুলজ্জা কিসের? মনে রাখবে এ যজ্ঞে, তোমার বকলম ঋষি, তুমি দেবতা, ও "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" মন্ত্র।

একজন নাচতে জানত, কিন্তু লোকে জানত না যে সে নাচতে জানে; তার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু একজন তাকে বল্লে—Wherefore are these things hid? Wherefore have these gifts a curtain before them? Why dost thou not go to church in a galliard and come home in a coranto? Is it a world to hide virtues in? এ উপদেশ অমূল্য;

নাচতে নাচতে গির্জ্জায় যাওয়াটা হয়ত শোভন নয়, কিন্তু শোভন-অশোভন অত বিচার করতে গেলে, গুণের প্রচার কি করে' হয়?

প্রচারের আর একটা পন্থা আছে—সেটা একটু বাকা; যখন সোজা আঙ্গুলে ঘি বা'র হয় না, তখন আঙ্গুলটাকে বাকানর বিধি আছে; এও সেই প্রকার। সোজাসুজি উপায়ে যখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল না তখন কবি বলেচেন—Put thyself into the trick of singularity—অর্থাৎ যদি বাঁ দিকে টেরী কাটা চলতি ফ্যাসান হয়, ত তুমি কাটবে ডান দিকে; যদি টিকি রাখা রেয়জ হয়, তুমি টিকি কেটে ফেলবে; চা খাওয়া প্রথা হ'লে তুমি চা ছেড়ে দেবে, and vice versa; দেখবে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই হবে, লোকে বলবে—লোকটার চিন্তার, চরিত্রের বিশিষ্টতা আছে—independence of character আছে। কিন্তু independence কথাটার বড় চড়া গন্ধ, অনেকের নাকে সহ্য হয় না, অতএব এপথে একটু বিপদও আছে! মোট কথা তবে এই singularity যদি গড্ডলিকা প্রবাহের অনুকূল স্রোত ধরে' চলে তা হ'লে বিপদ খুব কম, যথা—বিলাত প্রত্যাগত হ'য়েও যদি মুরগী না খাও, ডাক্তারী বিদ্যা শিখেও যদি মাদুলির মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, Astronomy পড়েও যদি 'মঘার' আঘাতে ভয় কর, নিজে সাহেব সেজেও যদি গৃহিণীকে পর্দ্দার ভেতর পুরে রাখ, তা হ'লে এ trick of singularity তোমার মৌলিকত্ব, তোমার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় প্রদান করবে; কারণ কুসংস্কার ত্যাগে ও কুসংস্কার পোষণে উভয়ত্রই মৌলিকত্ব থাকতে পারে।

এর চেয়ে বিজ্ঞাপনের আর একটা সহজ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ

উপায় হচ্ছে, কোন উদীয়মান জ্যোতিষ্কের উপগ্রহ-রূপ ধারণকরা; তার এ ধার-করা-আলোয় উজ্জ্বল হওয়ার একটু নিগ্রহের সম্ভাবনাও আছে,—জ্যোতিষ্ক নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলে, নিজেকেও নিষ্প্রভ হ'য়ে যেতে হবে। অতএব একটু বুদ্ধি করে' বস্তু চিনে নিতে হবে; আর যদি ভুলই হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে নিভবার আগে যখন প্রদীপ হাসতে থাকবে, সেই সময়ে তাকে পরিত্যাগ করে' অপর কোন উদীয়মান নক্ষত্রের অন্বেষণে ফিরতে হবে; সেখানে কিছু মমতা করলে চলবে না, কেননা যে দেশের ও দশের মাঝে একজন হ'তে চায় তার মমতা বা চক্ষুলজ্জা প্রভৃতি বালাই থাকলে চলবে না।

এইবার বিনয়ের নানা ভঙ্গীর কথা বলব।

একবার গুণ জাহির হ'য়ে গেলে, অর্থাৎ আমার এই মুষ্টিযোগটা লাগলে, তারপর বিনয় কাজে লাগতে পারে; যখন লোকে তোমারি প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে গড়চে, তোমারি ছবি টাঙ্গাচ্চে, তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করচে (হয়ত তোমারই ব্যবস্থামত), তখন তুমি খুব বিনয়ী হ'য়ে বলবে—হাত দুটা কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে, ঘাড় নুইয়ে, ভূমি-সংলগ্ন-দৃষ্টি হ'য়ে—"আপনাদেরই কৃপা, আমি অতি অকিঞ্চন, এটা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করচেন না, আমায় উপলক্ষ করে' আপনারা আমার জাতকে, আমার সম্প্রদায়কে, আমার professionকেই সম্বর্দ্ধনা করচেন"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত দেবতার পশ্চাদ্ভাগ দগ্ধ করে' সুদূর আমেরিকা থেকে বা home থেকে লম্বা খেতাব 'জুগাড়' করে' আনিয়ে, সেটা ব্যবহার না করায়, পরম পবিত্র বিনয় প্রকাশ পায়; আজকাল খেতাব পরিত্যাগে কিছু সম্মান বেশী; একেবারে পরিত্যাগ যদি নাও করতে পার,

খেতাবটা ব্যবহার না করে’ যদি বল—“আমি অতবড় খেতাবের উপযুক্ত নই”—খেতাবটা ব্যবহার করার চেয়ে বেশী মান অর্জ্জন করবে।

যদি তুমি লেখক হও, অর্থাৎ বই লিখে ছাপিয়ে থাক—নিজের নামসইকরা ভূমিকায় বিনয়ের বন্যা বহিয়ে দিয়ে—প্রকাশকের নাম দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পিটতে পার, এও একরকম বিনয়। আর-একরকম বিনয়, চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে ভোজ দিয়ে গললগ্নীকৃতবাস হ’য়ে অতিথিগণের সমক্ষে বলা—‘বিদুরের খুদ, কিছু মনে করবেন না’; অথবা বৈদ্যনাথ কি সিমুলতলায়, দুতলা বাড়ী তৈরী করে’ মর্ম্মরে মুড়ে দিয়ে, দরজায় মর্ম্মর-ফলকে লিখে দেওয়া—‘নন্দন কুটীর’। এই রকম বিবিধ ক্ষেত্রে তোমার সুনামের সোনায় বিনয় সোহাগার কাজ করবে। একেই বলে ‘বড় হবি তো ছোট হ’, অর্থাৎ ছোট হওয়ার ভাণ কর; তা না করে’, সত্য সত্য ছোট হলেই ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।—ইতি বিজ্ঞান-বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্য-কথা

২১শে চৈত্র, ১৩২৯

১৬

ঐহিক ও পারত্রিক

এই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সুখদুঃখের আলো-আঁধারে দিশেহারা, আশা-নিরাশার নাগর-দোলায় দোলায়মান মনুস্য-জীবন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন অবসন্ন হ'য়ে যায়, আন্তরিক চেষ্টার ফসল যখন ফলে না, আন্তরিক স্নেহ-ভক্তির যখন প্রতিদান মিলে না, সুচিন্তিত কার্য্য-শৃঙ্খলা যখন অর্দ্ধপথে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে ছিন্ন হ'য়ে যায়, মানুষ তখন হালে পানি না পেয়ে, এই দুস্তর ভবসিন্ধু পারে এক সুখরাজ্যের কল্পনা করে' ধৈর্য্য ধরে' থাকে—যে সুখরাজ্যে তার সকল অতীত চেষ্টার ফল থরে থরে সাজান আছে, ইহজীবনের সকল ব্যর্থতা যেখানে সাথক হ'য়ে উঠবে, প্রত্যেক স্নেহবিন্দুর প্রতিদান মিলবে, এ জীবন-মরুভূমির সকল উত্তাপ, সকল নীরসতা অপগত হ'য়ে যেখানে সুধু শান্তি, স্বস্তি, চরিতার্থতা, সৌন্দর্য্য চির-বিরাজমান থাকবে।

স্বর্গের কল্পনাটাই আমার ছেলে-ভুলান "রূপকথা" বলে' মনে হয়, তা সে কল্পনাময় সুখস্থানকে—**Atlantis** বল, **Heaven** বল, **Empyrian** বল, **Valhalla** বল, বেহেস্ত বল, আর বৈকুণ্ঠই বল। বয়স হ'লেও মানুষ শিশুই থাকে; রোরুদ্যমান ছেলের হাতে পিটে দিলে সে যেমন শান্ত হয়, জীবনের কষাঘাতে দীর্ণ-পৃষ্ঠ মানুষ স্বর্গরূপ মোয়া হাতে প[illegible] আশ্বাস মাত্র পেয়েই, তেমনিই শান্ত পরিতৃপ্ত হয়।

এ জীবনের কষাঘাত সে বড় আশায় বুক বেঁধে সহ্য করে' যায়। আইনতঃ ১৮ বছর বয়স হ'লে মানুষ সাবালক হয়, কিন্তু আমি দেখচি মানুষ as such আজ পর্য্যন্ত সাবালক হয় নি। কারও কারও মতে নাবালক থাকাটাই মনুষ্যত্ব; আর সাবালক হওয়াই মনুষ্যত্বের বিকার; জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াটা যে মানব-গোষ্ঠীর আদি পুরুষের প্রথম ও প্রধান অপরাধ বলা হয়েছে, সে গল্পের মূলে এই তত্ত্বই নিহিত রয়েচে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন যুগের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বর্গের কল্পনা, সেই সেই দেশ, ও যুগ, ও জাতির বিশিষ্টতা নিয়ে রচিত। কিন্তু একটু প্রণিধান করে' দেখলেই বুঝা যাবে যে, সকল স্বর্গের কল্পনাই যার যেখানে ব্যথা—যে ব্যথার আর প্রতীকার হল না, বা যার যেখানে আনন্দ,—যে আনন্দের সমাপ্তি মানুষ চায় না, তার কল্পিত স্বর্গে সে ব্যথার অবসান, আর সে আনন্দের অফুরন্ত আয়োজন। ঐহিক জীবনের শেষ হয়, মানুষ মরে—স্বর্গে মানুষ দেবতা হ'য়ে যায়, মরণের অতীত হয়। দিনরাত খেটে খেটে মানুষ পেটের অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না—স্বর্গরাজ্যে আহারের মোটেই অভাব নেই। এ জীবনে পরস্পর দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা কলহ, এই অন্ন নিয়ে,—স্বর্গরাজ্যে সে অন্ন-সমস্যার সমীচীন মীমাংসা হ'য়ে গেছে, অমৃত ভাণ্ড অফুরন্ত, পান করবামাত্র পরিতৃপ্তি, সুতরাং প্রতিযোগিতা নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই। এ জীবনে ছোট বড়, যুবা বৃদ্ধ, সুরূপ কুরূপ, ধনী দরিদ্র, কত রকমের পার্থক্য, কত প্রকার শ্রেণীবিভাগ—স্বর্গে সব সমান, সব একাকার,—সব সুন্দর, সব যুবা, সকলেই রক্তাম্বর-পরিহিত, চতুরস্র।

দুঃখের বিষয় কেউ স্বর্গ হ'তে ফিরে এসে সে দেশটার first-hand *পরিচয় দেয় নি!* আমি আফিমের (*যে দিব্যবস্তুটা অমৃত বা* ambrosiaরই পার্থিব সংস্করণ) মৌজে কতবার "অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী" পার হ'য়ে সে দিব্যদেশে গিয়েছি—মৌজ ফুরালে আবার ফিরে এসেছি। আমি কিন্তু সে দেশের খুব বেশী সুখ্যাতি করতে পারলুম না। দেশটা বড়ই একঘেয়ে। দেশটা খুব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কোথাও মলামাটি নেই, কোথাও একটু হেলাগোছা নেই—যেন একটা খুব বড় রকমের Whiteaway Laidlawর দোকান—সেখানে যেন সদাই মৌজ—সেখানে খোঁয়ারির হাই উঠে না—সদাই ভরপুর নেশা। খানিকক্ষণ থাকতে ভাল, কিন্তু শীঘ্রই অরুচি জন্মে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসাটা মন্দ নয় কিন্তু বেশী দিন থাকা চলে না—অনন্ত জীবনের কথা ত দূরে! আমি যতবার গেছি, কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসতে পথ পাই নি। আমার এই বিচিত্র, সুখে-দুঃখে বিজড়িত, মলামাটি মাখা,—কষ্টের মধ্যে সুখের, অভাবের মধ্যে পূর্ণতার, অসাফল্যের মধ্যে সাফল্যের, খোঁয়ারীর মধ্যে মৌতাতের, সম্ভাবনা মাত্র নিয়ে যে জীবন—ক্ষণিকের হ'লেও, যে আনন্দ প্রদান করে, অমৃতের মধ্যে তার সন্ধান মিলে না। সম্ভাবনার যে উন্মাদ আনন্দ, তা অমৃতের মধ্যে নেই, আফিমের মধ্যে আছে। সেখানে সবই হ'য়ে গেছি, কিছু হ'তে বাকী নেই; সবটাই সম্পূর্ণ, সেখানে গল্পটা শেষ হ'য়ে গেছে। আমার জীবন সম্ভাবনা নিয়ে, আমার জীবন-নাটকের যবনিকা পড়ে নি, পড়বে না; আমি যাব, আর-এক কমলাকান্ত আসবে। সেখানে কমলাকান্ত এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তার আর পরিবর্ত্তন নেই। সে একটা জ্যান্ত mummy হ'য়ে পড়ে থাকা মাত্র।

এখন পৌরাণিক যুগ গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ এসেছে; স্বর্গের কল্পনাটাও একটু বদলে গিয়ে নতুন মূর্ত্তি ধরেছে। নক্ষত্রলোকের পরপারে স্বর্গকে আর বিজ্ঞানের telescopeএ দেখা যাচ্ছে না; তাই মানুষ আপনার গৃহস্থালীর ভেতর, আপনার রচিত সমাজ-দেহের ভেতর, রাষ্ট্র-বিস্তারের মধ্যে, স্বর্গের ভিত গাড়তে সুরু করেচে। Valhalla, বা Empyrianএর কল্পনা ছেড়ে দিয়ে, মানুষ Utopiaর নূতন বনেদ্ খুঁড়তে আরম্ভ করেচে।

Some day here and everywhere Life, of which you and I are but anticipatory atoms and eddies, Life will awaken indeed, one and whole and marvellous like a child awakening to conscious life.

এ সেই পুরাতন কল্পনা নূতন আকারে হাজির করা হয়েছে মাত্র, এ কল্পনার মূলে সেই আকাঙ্ক্ষা—সম্পূর্ণ হ'লেই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি ও যবনিকা পতন। Serenity, beauty, all the works of men—in perfect harmony—minds brought to harmony—an energetic peace—confusions dispersed—a world of spirits—crystal clear.

সুধু অমৃত ও চতুর্হস্ত আর রক্তাম্বর বাদ, আর-সবই সেই পুরাতন কথা। বৈজ্ঞানিক Utopiaয় কি থাকবে আর কি থাকবে না, তার বিশেষ বিবরণ এই—

Here was no yelping and howling of tired and irritated dogs, no braying, bellowing, squealing, and distressful outcries of uneasy beasts, no farm-yard

clamour, no shouts of anger, no barking and coughing, no sounds of hammering, beating, sawing, grinding, mechanical hooting, whistling, screaming, and the like, no clattering of distant trains, clanking of automobiles, or other ill-contrived mechanisms, the tiresome and ugly noises of many an unpleasant creature were heard no more. In Utopia the ear, like the eye, was at peace. The air which had once been a mud of felted noises was now a purified silence.

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ মোটের মাথায় যা ছিল, এখনও তাই রয়েছে, অতএব ৩০০০ হাজার বৎসর পরেও তাই থাকবে না কেন? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাই থাকবে, সেই মৃত্যু, সেই ব্যাধি, সেই ভূমিকম্প, সেই ঝঞ্ঝাবাত, সেই বিষধর সর্প, সেই অগ্নুৎপাত, জলে স্থলে সেই হিংস্র পশু পক্ষী—সুধু মাঝখান থেকে মানুষ দেবভাবাপন্ন হ'য়ে যাবে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। যে উপায়ে ভূতল রসাতলে না গিয়ে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হ'তে পারে তা' আমি জানি। তবে মানুষ যদি চিরদিন নাবালক থেকেই সুখী হয়, দিদিমার গল্পেই যদি তার শান্তিলাভ ঘটে, আমি তাকে নূতন পন্থা বাৎলে দিয়ে বিব্রত করতে প্রস্তুত নই; আর পথ বাৎলাতে গেলে নিজের বিপদও কম নয়!

২৮শে চৈত্র, ১৩২৯

১৭

বাস্তু

বাস্তু প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাস্তু-দেবতা, বাস্তু ঘুঘু আর বাস্তু-সাপ।

বাস্তু-দেবতা সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন, যথা—"পূর্ব্বকালে অন্ধকগণকে বধ করিবার সময় শূলী শম্ভুর ললাটের স্বেদ-বিন্দু ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলে পর, তাহা হইতে এক করালবদন প্রমথের উদ্ভব হয়। সেই ভূতযোনি জন্মিবামাত্র সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। সমর ক্ষেত্রে নিপতিত অন্ধকগণের রুধির স্রোতে পিপাসা নিবৃত্তি না হওয়ায়, সেই প্রমথ প্রমথনাথের ধ্যানে নিমগ্ন হয়; আশুতোষ তাহার নিদারুণ তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া বলেন 'বরং বৃণু'। প্রমথ বলিল 'ভূমণ্ডল হইতে ত্রিদিব পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাস করিতে পারি এই বর প্রদান করুন'; আশুতোষ বলিলেন 'তথাস্তু'। তখন সেই প্রমথ নিজ দেহ বিস্তার করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবাসুর সকলেই ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পিশাচকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া নিশ্চল করিয়া ফেলিলেন। তখন পিশাচ বলিল 'হে দেবগণ, আপনারা ত আমার চলৎ-শক্তি হরণ করিলেন, আমি কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিব?' তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা বলিলেন, 'তুমি আজ হইতে বাস্তু-দেবতা হইলে, তোমার প্রীত্যর্থে যে বাস্তু-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই বলি অর্থাৎ উপকরণ তোমার ভোজ্য হইল।'

বিচক্ষণ দেবতাসকল এই প্রকারে আপনাদের বিপত্তি মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।”

পুরাণকার মাত্রেই রূপক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত; সোজা কথা সাদা রকমের বলা তাঁদের ধারা নয়। কিন্তু এ রূপকের গূঢ় তাৎপর্য্য কাহারও বুঝতে বাকি থাকবে না। আমাদের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির উপদেবতা-স্বরূপ যে ভূস্বামিকুল নিরীহ রায়তের স্কন্ধে ভর করে' পুরুষানুক্রমে খোস মেজাজে দিনপাত করে' আসচেন, তাঁহাদেরই লক্ষ্য করে' যে এই রূপক রচনা করা হয়েচে, তার আর ভুল কি? আশুতোষরূপী রাজস্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রাজস্বের পাকা বন্দোবস্ত করে', সেই ভূস্বামীদিগকে Rent Collector এর পদ থেকে উন্নীত করে', বাস্তু-দেবতা বানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচেন, সেই বাস্তুগণ সমস্ত দেশটাকেই আচ্ছন্ন করে' রেখেচেন। আর 'বাস্তু মধ্যে তু যো বলিঃ' তাঁদেরই প্রাপ্য হ'য়ে রয়েচে। সে বলির অন্ত নেই;—চাষা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবে, তার জন্য বাস্তু-দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে হবে, রোদ্রে শিশিরে চাষা ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করবে, তার অগ্রভাগ তাঁকে দিতে হবে – ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর বাস্তু-কপোত বা ঘুঘুর কথা বলি শ্রবণ কর। এই বাস্তু-ঘুঘু নানা জাতীয়—পক্ষিতত্ত্ব-বিশারদ লাহা মহাশয় জানেন, যথা—তিলে-ঘুঘু, পাঁড়-ঘুঘু, রাম-ঘুঘু ইত্যাদি, তফাৎ মাত্র রঙে, না হ'লে সবই ঘুঘু। এই কপোতকুল যে ভিটায় চরতে আরম্ভ করে, তাব আর নিস্তার নাই। এই কপোতকুলের কবলে পতিত হ'য়ে আজ

পর্য্যন্ত কেহ যে মুক্তিলাভ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরা এক আড়ি দিয়ে তিন আড়ি গ্রহণ করে। এরা মহা-জন, গরীবের প্রতি অনুগ্রহ করতে পশ্চাৎপদ নয়; তবে সকল ঐহিক অনুগ্রহ যেমন মূল্য দিয়ে শোধন করে' নিতে হয়, ইহাদেরও অনুগ্রহ শতকরা ২৫ বা ৫০ হিসাবে, ত্রৈমাসিক বিশ্রাম সহ (quarterly rest) ব্যাজ দিয়ে কিনতে হয়। আর একবার সেই মহাজনগণের আটাকাটিতে পড়লে, মরেও নিস্তার লাভ করা যায় না। বাস্তু-দেবতার বলি যোগাতে যোগাতে নিঃস্ব চাষী এই কপোতকুলের কবলে না পড়েও পারে না। দুঃখ এই যে, এ পর্য্যন্ত এমন পাখ-মারা কেহ জন্মাল না, যে এ ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দিয়ে চাষীকে মুক্ত করে। দেশের প্রাণ সে বেচারা, ধুঁয়ার ছলনা করে' নয়, সত্য সত্যই চোখে ধোঁয়া দেখে' আর কেঁদে' দিন কাটায়।

তারপর বাস্তু-সাপের কথা। এ সাপ অজর অমর, এমনকি সনাতন বল্লেও চলে। বিষধর হলেও ঘরের কোণে বহুকাল বাস করার জন্য গা-সওয়া হ'য়ে গেছে; ক্রমে ল্যাজ খসে' যাচ্ছে বটে, কিন্তু বিষের কিছু কমতি হয় নি। এ সাপকে ignore করে' চলে' গেলে, তোমার গা ঘেঁসে গেলেও, একবার ফোঁসটি পর্য্যন্ত করবে না, কিন্তু অসাবধানে ল্যাজে পা দিয়েছ কি অমনি ফণা বিস্তার করে' দংশনোদ্যত হবে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ! এ বাস্তু গৃহ-দেবতারূপে ঘরে ঘরে বর্ত্তমান, দেশব্যাপী পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের আশ্রয়ে ইহার বসতি, অন্ধকারই ইহার শক্তি, বাস্তু মারলে গৃহস্থালীর অকল্যাণ এই অন্ধ বিশ্বাস ইহার জীবনধারণোপায়। ফোঁসের ভয়ে কেউ কিছু মুখ ফুটে বলতে পাচ্চে

না, কিছু করা ত দূরের কথা, কিন্তু তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে এই প্রার্থনা উত্থিত হ'তে আরম্ভ হয়েচে :—

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালীয়হ্রদং,
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।

৫ই আশ্বিন, ১৩৩০

———

১৮

মাঝামাঝি

মুখুয্যে মহাশয় একজন 'স্ব-ভাব' মৌতাতী, বড় উমদা লোক। 'স্ব-ভাব' মৌতাতী কা'কে বলে বোধ হয় তোমরা জান না। লিভারে ব্যথা, বা অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য, বা রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে এলে পর যারা উপদ্রবী liquid fire পরিত্যাগ করে' নিরুপদ্রব অহিফেন ব্রত গ্রহণ করে তারা 'ভঙ্গ'। অন্ধকার হ'তে আলোয় আসলে, অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, আধ্যাত্মিক বা আত্মিক কারণ ছাড়া আরও আরও কারণ থাকতে পারে বলে', অনেক সময় সে আলোয় আসাকে সৎ-সাহসের পরিচায়ক বলে' না ধরে' নিয়ে, লোকে অধঃপতনের কারণই বলে' থাকে। মৌতাত সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের সেইরূপ ধারণা; অহি-ফেনের সঙ্গে যার অহেতুকী প্রেম, 'কারে পড়ে' প্রেম নহে, তাকেই বলে 'স্ব-ভাব' মৌতাতী, আর সব 'ভঙ্গ'।

সেই মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ি একবার কুটুম্বিতা করতে গিয়েছিলুম। সায়াহ্নে তাঁর বৈঠকখানায় বহুলোকের সমাগম হয়; বলা বাহুল্য সকলেই মৌতাতী—স্ব-ভাব ও ভঙ্গ উভয়বিধ। মুখুয্যে মশায় সকলকে "আফিং সেবন হয়েচে ত?"—বলে' স্বাগত জিজ্ঞাসা কল্লেন। সকলেই সস্মিত মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জ্ঞাপন কল্লেন যে সে শুভকার্য্য যথাবিধি ও যথাকালে সম্পন্ন হয়েচে। একটি ভদ্রলোক কেবল অতিশয় চিন্তান্বিত হ'য়ে বল্লেন "দেখুন বড় মুস্কিলে পড়েছি।"

মুখুয্যে। মুস্কিল কিসের? মুস্কিলে আসান 'কাল'-মাণিকপীর ত আছেনই, তার আর ভাবনা কি?

ভদ্রলোক। আজ্ঞে, মুস্কিল কি জানেন? আমি ঠিক ৪টার সময় আফিং খাই; ৪টা ত অনেকক্ষণ বেজেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মৌতাতও হয় নি, বেয়াড়াও ধরে নি; আফিং খেলাম কি না ঠিক বুঝতে পাচ্চি না!

মুখুয্যে। এ ত বাস্তবিকই মুস্কিলের কথা বটে! এখন পুনশ্চ খেলেও মুস্কিল, না-খেলেও মুস্কিল? খাওয়া, আর না-খাওয়া ত জানতাম ন্যায়শাস্ত্রের Excluded middle; কিন্তু এখন দেখচি তা নয়, এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থাও আছে—যথা, আফিং খেয়েও যদি মৌতাত না হয়, অথবা আফিং না-খেয়েও যদি খোঁয়ারী না ধরে! উপায়?—অনেক বিচার বিতর্কের পর (যে হেতু where many meet there is wisdom, আর সে many যদি মৌতাতী হয় তা হ'লে ত কথাই নেই) স্থির হ'য়ে গেল যে এক মাত্রা সেবন করাই বিধি—যদি দোকরই হয়—অধিকন্তু ন দোষায়।

কিন্তু আমি সেই মুহূর্ত্তে এই 'মাঝামাঝি'র সমস্যা ভাবতে লাগলুম,—দেখলুম যে, যেখানে 'মাঝামাঝি' সেইখানেই মুস্কিল। Golden mean বলে' একটা অবস্থা আছে, সেটা half-way houseএর মত, মধ্যপথে ক্ষণিক বিশ্রামের স্থান হ'তে পারে, কিন্তু গন্তব্যস্থান, পথের শেষ, goal হ'তে পারে না। কাছে ও দূরে, অন্তরে-বাহিরে, আমি কোথাও মাঝামাঝি ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে' দেখতে পেলুম না। প্রসন্ন খাঁটি দুধের সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোদক মিশ্রিত করে' যে মাঝামাঝি পদার্থ সৃষ্টি করে, তা'তে দুগ্ধ এবং গঙ্গোদক উভয়েরই

মাহাত্ম্য নষ্ট হ'য়ে যায় ; golden mean বলে' প্রসন্নকে কেউ মার্জ্জনা করে না, মুখে কা'রও বলতে সাহস হ'ক আর নাই হ'ক। শাদায়-কালায় মিশিয়ে যে চুনোগলি, এণ্টালি প্রভৃতির সৃষ্টি, সে-সকল মাঝামাঝি জীবের গুণাগুণ যারা জানে তারা বলে—give me a true-born Englishman or an unadulterated native but not one who is neither fish nor flesh nor a good red-herring. অশ্বতর golden mean হ'লেও প্রকৃতির ত্যাজ্যপুত্র।

জল ও স্থলের মাঝামাঝি যে জিনিষ তার নাম কর্দ্দম; জলে সাঁতার কাটা চলে, স্থলে দৌড়ান যায়; কিন্তু হাতিও 'দঁকে পড়লে' কাবু হ'য়ে যায়—এমনকি ব্যাংএও লাথি মেরে যেতে পারে।

সত্যি ও মিথ্যা ছেলেবেলা মনে করতুম চিন্তারাজ্যকে dichotomy করে' ভাগ করেচে। কিন্তু 'ক্রমশো বিজ্ঞতমঃ' হ'য়ে বুঝলুম যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি একটা খুব প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে, সেখানে সত্যের শুভ্রতা বিনয়ের কলপ দিয়ে মলিন করা হয়েচে, এবং মিথ্যার মালিন্যকে সততার চূণকাম করে' বেশ ধবলতা দেওয়া হয়েচে; এই সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি ক্ষেত্রে যে খেলোয়াড় জয়যুক্ত হ'তে পারে সে কুরুক্ষেত্র বা ওয়াটারলু-জয়ী অপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি যে ত্রিশঙ্কু রাজার পারলৌকিক অবস্থানমার্গ—যে রাজ্যটা হওয়া আর না-হওয়ার মধ্যবর্ত্তী, যে রাজ্যের নাম বাঙ্গালায় বলে 'হইলে-হইতে-পারিত', আর ইংরাজিতে বলে fool's paradise, যে রাজ্যের যাত্রী আমরা অনেকেই, তার খুব বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন হবে না।

শত্রু ও মিত্রের মাঝামাঝি এক জীব থাকেন তাঁর নাম নিরপেক্ষ

neutral—যিনি কারও অপেক্ষা করে না, যিনি ঐহিক সম্পদে এতই উচ্চে অবস্থিত যে কারও অপেক্ষায় না থাকলেও চলে, তাই তিনিই নিরপেক্ষ। অথবা যিনি neutre অর্থাৎ ক্লীব, তিনিই neutral, জোর করে' 'হাঁ' কিম্বা 'না' যাঁর বলবার সাহস জুয়ায় না তিনিই neutral.

এই neutrality ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মধ্যে নানা রূপ ধারণ করতে পারে—যথা, benevolent neutrality, বা armed neutrality; কিন্তু যে প্রকারের neutralityই হ'ক, যিনি নিরপেক্ষ বা ক্লীব (neutre) তিনি উভয় পক্ষেরই শত্রু; সুতরাং বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকে বুঝেই রাখে—**He who is not for us, is against us.** ইহাই নিরপেক্ষতারূপ মাঝামাঝি অবস্থা বিষয়ে নিরাপদ পন্থা।

রেলে তৃতীয় শ্রেণী আছে, দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, আর মাঝামাঝি শ্রেণী অর্থাৎ intermediate class আছে। এই মাঝামাঝি শ্রেণীর যে কি নিগ্রহ তা যে রেলপথে যাতায়াত করেছে সেই জানে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে মাঝামাঝি শ্রেণীকে তাড়াতাড়ির সময় চেনা যায় না; ষ্টেসনে গাড়ি থামলেই আত্মরক্ষার জন্য মাঝামাঝি শ্রেণীর লোকদের "দেড়া দেড়া" বলে' চীৎকার করতে হয়। তা'তে দুটা অনর্থ ঘটে—একতো, তৃতীয় শ্রেণীর লোকতাড়ানর জন্য তাদের বিরাগভাজন হ'তে হয়; তারপর, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হ'তে তারা যে উঁচু, এই অভিমানটা প্রত্যেকবারই প্রকট হ'তে হ'তে অন্তর্নিহিত উত্তাপটা বেড়ে গিয়ে তাঁদের নৈতিক অবনতি সাধন করে। মাঝামাঝি শ্রেণীকে চিরদিনই—রেলের গাড়িতেই হ'ক বা জীবনের পথেই হ'ক, এই রকম আপনাদের বিশেষত্বটা জাহির করবার জন্য সদাই সজাগ

থাকতে হয়, পাছে গোলা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তাঁদিকে কেউ চিনতে না পারে এইজন্য সদাই self-conscious হ'য়ে ত্রস্ত হ'য়ে, শিউরে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে হয়; তা'তে সকলদিকেই অস্বস্তির কারণ হ'য়ে উঠে।

Genius যে তার সাতখুন মাপ; সে Convention মানে না, সে গতানুগতিক নয়—সে বেপরোয়া, আপনার পথ আপনি কেটে চলে। আর যে Genius নয়, গোলালোক, সে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে' যায়। কিন্তু যে intermediate classএর লোক, অর্থাৎ গোলালোক'ও নয় এবং Genius'ও নয়, সে সদাই অসুখী, আর তার ঝাঁজও অসহ্য। কবি বলেচেন—Unpretending mediocrity is good, and genius is glorious; but a weak flavour of genius in an essentially common person is detestable. It spoils the grand neutrality of a commonplace character, as the rinsings of an unwashed wine-glass spoil a draught of fair water.

ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি যে স্তর, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক, তাদের মত হতভাগ্য কি কেউ আছে? ধনী যে সে potential energyতে ভরপুর; দরিদ্র যে সে তার হাত পা নিয়ে kinetic energy নিয়ে বলবান, সে দিন আনে দিন খায় বটে কিন্তু কারও মুখাপেক্ষা করে না, দরকার হ'লে গতর খাটায়, আবার দরকার হ'লে চুরি-ডাকাতিও করে বা ভিক্ষা করে; কিন্তু মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক cannot beg, nor can they steal; অনেক সময় গতর

খাটাতেও নারাজ, সুধু মস্তিষ্ক চালনায় যা হয়। দুর্দ্দিনে ইহারাই বেশী কষ্ট পায়, ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়।

জানা আর না-জানার মাঝামাঝি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাও কি ভয়ানক! কবি বলেছেন—Where ignorance is bliss 'Tis folly to be wise—ইহার অর্থ—এ নয় যে, অজ্ঞানতা ভাল জ্ঞানের অপেক্ষা; ইহার অর্থ—যখন অজ্ঞানতাই সুখের তখন জ্ঞানী হওয়া মূর্খতা। অজ্ঞানতা সুখের কখন? যখন জানা-না-জানার মধ্যস্থলে থেকে মানুষ হাবুডুবু খায়, তখনই বরং অজ্ঞান তিমিরই ভাল। কেননা অন্যত্র কবি বলেছেন—Drink deep or taste not the Pyerian spring; আমাদের চলিত কথায়ও বহুকালের অভিজ্ঞতা এই ভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে—

যে বুঝেচে সে মজেচে
যে বুঝেনি সে আছে ভাল
যে আধ বুঝেচে তারি প্রাণ গেল।

একচ্ছত্রী নিরঙ্কুশ সম্রাট যাঁর ইচ্ছাই আইন,—আর সকল শাসন-ক্ষমতার প্রস্রবণরূপী জনশক্তি, তার আদেশ ও ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে শাসনযন্ত্র—এই দুই ধারার,—Autocracy ও Democracyর, মধ্যবর্ত্তী একটা খিচুড়ী আছে যার নাম Limited monarchy. এ মাঝামাঝি ব্যবস্থার যে বাহার তার খরচ অনেক; সে খরচ বাজে খরচ বলে' দুই একটা দেশ ছাড়া আর সব বড় দেশ থেকে সে শ্বেত-হস্তীর পূজা উঠে গেছে।

স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে Protectorate; মহাযুদ্ধের পর Protectorate কথাটার কাকু ধরা পড়ে যাওয়াতে,

আর একটা কথা তার পরিবর্ত্তে ব্যবহার আরম্ভ করা হয়েচে— Mandatory ; বস্তু একই, অর্থাৎ দেশটা দেশবাসীরই রইল—কেবল চাবিকাটিটা Mandatory, অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা ভারপ্রাপ্ত, তাঁদের আয়ত্বের ভিতর থাকল। এই রকম Protectorate বা Mandatory ইংলণ্ডেরও আছে, ফরাসিরও আছে, ইটালিরও আছে। ফরাসির Mandatory আনাম প্রদেশ, সেখানে রাজা আছেন, তাঁর দরবার আছে—তিনি আইনে সর্ব্বশেষ স্বাক্ষর না করলে আইন মঞ্জুর নয়—কিন্তু মঞ্জুর না করাও তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষ নয় ; এই যে Duality বা দ্বৈতবাদ, কাগজে কলমে ইহার একটা অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু আনামবাসীদের জীবনে ইহার কোনই সার্থকতা নাই ; যদি কিছু থাকে তা অর্থনষ্ট ও মনোকষ্ট দুই একসঙ্গে ; কেননা মোটা মোটা মাহিনার বড় ছোট মেজো ফরাসি কর্ম্মচারী দেশের অর্থ শোষণ কচ্চেন, আর দেশের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে। মাঝামাঝি থাকার পূর্ণ প্রতিফল তারা পাচ্চে। এইরকম সকল Protectorateএরই দুরবস্থা।

আমাদের দেশে Bureaucracy অর্থাৎ Autocracyর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে', Democracyর দিকে শাসন-যন্ত্রটাকে নিয়ে যাবার জন্য, মধ্যপথে, Auto-democracy (জানি না এ কথাটা চলতি কি না) বা Diarchy নামধেয় একটা নবীন পদ্ধতির experiment চলেচে। বেওয়ারিশ রোগীর উপরই হাসপাতালে experiment চলে। আমরা বেওয়ারীশও বটে, রোগগ্রস্তও বটে ; তাই আমাদের উপর এই উদ্ভট শাসন-পদ্ধতির experiment চলেচে—দেখা যাক রোগ গিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে আসে, কিম্বা রোগ ও রোগী দুইই যায় !

কেহ কেহ বলেন যে এটা transitional period. আরে বাবা, গচ্ছতি ইতি জগৎ, এর স্থিতি বলে' কিছু নেই, এটা সকল মুহূর্ত্তেই চলবে, এর সকল মুহূর্ত্তই transitional. সৃষ্টির মুহূর্ত্ত থেকে লয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্তটাই একটা বড় বিরাট transition ; এর স্থিতি বলে' যদি কিছু থাকে সেই শেষে যখন finish বলে' গ্রন্থ শেষ হ'য়ে যাবে। আর মানুষের জীবনে এই যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ যাকে স্থিতি বলা হয়েছে, সেটা মাঝামাঝি অবস্থা ; এবং মাঝামাঝির সকল দুঃখ তার ভিতর আছে। কবি বলেছেন—From the great deep to the great deep he goes, এই দুই অতল-স্পর্শের মধ্যস্থিত—অনাদি অতীত ও অনন্ত অনাগতের মাঝামাঝি দুর্দিনের ঘূর্ণিপাকে কি আলোড়ন বিলোড়ন, এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ যোজকের মধ্যে কি নাবাউঠা, কি টানাটানি,—'মাঝামাঝি'র সমস্ত দুঃখের কি একত্র সমাবেশ! এ দুঃখের একমাত্র ঔষধ আমি জানি, যদি কেউ চাও ত আমি দিতে পারি।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০

১৯

বলা ও করা

আজন্ম শুনে আসচি যে "বলা সহজ, করা শক্ত"। প্রবচন মাত্রেই যেমন আধা-সত্য এটাও তাই। কিন্তু সত্যের চেয়ে আধা-সত্য মারাত্মক হ'লেও যেমন চলতি বেশী, এ আধা-সত্যটারও চলন লোকের মুখে মুখে। সত্যের একটা পরীক্ষা (সেটা চূড়ান্ত পরীক্ষা না হলেও) লোকের মুখেই হ'য়ে থাকে—দাদা কি বলেন, গুরুজী কি বলেন, অমুক মহামহোপাধ্যায় কি বলেন, অমুক ন্যায়পঞ্চানন কি বলেন, শেষ মনু কি বলেন, যাজ্ঞবল্ক্য কি বলেন—যে হেতু জ্যান্তর চেয়ে মরার কথার বেশী জোর—আর মুখের যুক্তি অপেক্ষা লিখিত তথা ছাপিত যুক্তির জোর নিশ্চয়ই বেশী। ফরাসীতে বলে—parole s'en vole, ecrit reste—কথা হাওয়ায় উড়ে যায়, লেখা থাকে। লেখা তথা ছাপার যেমন একটা গুণ স্থায়িত্ব, তেমনি একটা দোষ উড়ে না যাওয়া। যে কথাটা শূন্যগর্ভ বলে' একদিনে হাওয়ায় উড়ে যেত, সেটা ছাপা হ'লে অন্ততঃ এক বছর বেঁচে থাকবে ; আর যদি কোন স্থানে চাপা পড়ে থেকে, উই আর ইঁদুরের হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গিয়ে, দু'শ বৎসর পরে তার resurrection হয়—তা হ'লে সেটা আরও দু'শ বছর বেঁচে থাকবার মত পরমায়ু লাভ করবে। ছাপাখানার যদি কিছু দোষ থাকে ত এই অপদার্থকে পদার্থত্ব দিয়ে মূল্যবান করে' তোলা—অন্য

কোনদিক দিয়েও যদি না হয় ত অন্ততঃ ঐতিহাসিক তথ্য বলে' তার কদর হবে।

কিন্তু আমি বলছিলুম—লোকে যে বলে "বলা সহজ, করা শক্ত" —সেটা আধা-সত্য। বলাও যে এক রকমের করা, তার কথা পরে বলছি। আমি দেখছি করা সহজ, বলাই শক্ত। সম্ভাব্যের অতীত যা তা করতে কেউ পারবে না, কিন্তু যেটা বলা কিছুই অসম্ভব নয় সেটাও সকলে বলতে পারে না। চুরি করার চেয়ে, চোরকে চোর বলা শক্ত; আইন বলেচেন—the greater the truth, the greater the libel; অতএব সত্যকথা বলিচি বলে' পার পাবার জো নেই; বরং মিথ্যা বলে'—চোরকে সাধু বলে', বেঁড়েকে চামুরে বলে', পার ত পাওয়াই যায়, উপরন্তু কিছু লাভও হ'য়ে যেতে পারে। দুনিয়ায় দুষ্কার্য্য বলে' যে শ্রেণীর কাজ লোকে করে তার তালিকা অফুরন্ত, দুষ্কার্য্য হ'লেও লোকে করচে,—কিন্তু সে দুষ্কার্য্যের ব্যাখ্যা বা পরিচয় যে দেবে তার উপর দুনিয়াসুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। অতএব আমি যদি বলি করা সহজ বলেই লোকে করে, আর বলা শক্ত বলেই লোকে বলতে পারে না, তা হ'লে কি ভুল হবে?

করার দোষ কথার জালে ঢাকা দেওয়া যায়, কিন্তু বলার দোষ কাজ দিয়ে ঢাকা যায় না। তা হ'লে কোন্‌টা বলবান—করা না বলা? মনে কর প্রসন্ন দুধে জল দিয়েছে, তোমার সাহস থাকে ত তুমি হয় ত বলে ফেললে "দুধটা পাতলা হয়েচে"—তার উত্তরে প্রসন্ন তোমাকে দুটা দুর্ব্বাক্য বলে', বা পাওনা টাকার তাগাদা করে' (যেটা দুর্ব্বাক্য অপেক্ষা বেশী বেদনাদায়ক) তোমাকে চুপ করিয়ে দিতে পারে; অথবা যদি সে ভাল মেজাজে থাকে, নতুন গরুর দুধ একটু পাতলাই

হবে—ইত্যাকার কৈফিয়ৎ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করে' দেবে ; মোটের মাথায় দুধে জল দেওয়া কার্য্যটাকে কথার জালে ঢেকে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু যদি সে ধর্ম্মরক্ষা করে' সত্যি কথাই বলে' ফেলে—তাঁরপর তিন দিন খাঁটি দুধ যোগালেও তার দুধে জল দেওয়ার অপবাদ ঢাকা পড়বে না। ছোট বড় সব কথায় ও সব কাযেই এই রকম। যুদ্ধে হেরে ভাল করে' despatch বা communique লিখতে পারলে গাধা-হারও ঢাকা দেওয়া যেতে পারে ; অনেক যুদ্ধ এই রকম বাক্য দ্বারাই জয় করা হয়েচে। জাল করা ত সব যুগে সব দেশে সব স্থলে অন্যায়, কিন্তু জাল করে' ক্লাইভ যে কৈফিয়ৎ দিয়েচেন তা'তে ক্লাইভকে জালিয়াৎ বলতে এক জনের মাত্র সাহস হয়েচে ; সে কৈফিয়ৎটা এই যে, উমিচাঁদের মত দুষ্ট লোককে জব্দ করতে তাঁকে যদি দশবার জাল করতে হয়, তা হ'লেও তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। জাল করার চেয়ে এই বলে' কৈফিয়ৎ দেওয়ার বাহাদুরী বেশী নয় কি ?

সেইজন্য বুদ্ধিমান লোকে বেশী কথা কয় না, যা করবার তা করে' যায়। কারণ করায় যদি কিছু গলদ বেরিয়ে যায় ত কথা দিয়ে সে গলদ সংশোধন করে' নেবার উপায় থাকে ; কিন্তু কথা, হাতের ঢিল, ছেড়ে দিলে আর তাকে ফেরাবার উপায় থাকে না, কথা দিয়েও নয়, কাজ করেও নয়। নীরব সাধনার অনেক সময় গূঢ়তত্ত্বই এই।

কথায় বলে the less said the sooner mended, তার মানে, কথার ছাপ মুছে না, সে ছাপ যত গভীর হ'য়ে বসে, তাকে মুছে ফেলা তত শক্ত ; অতএব, যা কর তা কর, কথা কয়ে কার্য্যের প্রকৃতি বা উদ্দেশ্যটাকে প্রকট করে' দিও না, যদি কোন সময়ে বিপরীত মত জাহির করতে হয়—তা ঘটে উঠবে না। কাজের প্রকৃতি মল্লিনাথের

টাকায় বদলে যেতে পারে, কিন্তু কথার অর্থ খুব বেশী বদলান যায় না। এ তুনিয়ায় অনেক সময় কতবার পা পিছলে পড়ে যেতে হয়, কিন্তু কোন কথা না বলে' ঝেড়ে উঠে পড়তে পারলে, পড়ে যাওয়াটার নানা interpretation দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু হুঁচট্ খেয়েছি বল্লে আর 'শয়নে পদ্মনাভ' বলা চলবে না। অতএব Thou shalt not speak out এইটা তুনিয়াদারীর একাদশ Commandment হওয়া উচিত।

সে দিন বাঙ্গালার একজন বিরাটপুরুষ একখানা অগ্নিগর্ভ পত্র লিখে তাঁর উপরওয়ালাকে জানিয়ে দিলেন যে, সব হুকুম বা সকল আবদার, সব মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। পত্রখানার ভাষা নিয়ে ও ভঙ্গী নিয়ে কতই না আলোচনা গবেষণা হ'য়ে গেছে। যারা পত্র-খানার ধরণটা পছন্দ করেন নি, তাঁরা যদি তাঁদের মনোমত একখানা খসড়া করে' ছাপিয়ে দিতেন তা হ'লে ঠিক বোঝা যেত তাঁদের কিরূপ রুচি ও শক্তি; তাঁদের টিপ্পনী থেকে ঠিক বোঝা গেল না যে, কি হ'লে তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু ধরণটা যা'ই হ'ক, পত্র লেখকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, প্রতিপক্ষ যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করতে অপারগ হয়েছেন— তাতেই তাঁর আঘাতের বেগ ও লক্ষ্য যে সম্পূর্ণরূপ সময়, ব্যক্তি ও বিষয়োপযোগী হয়েছে তার আর ভুল নেই। ঘুষিটা চোখে না মেরে, পিঠে মারা উচিত ছিল, অথবা ঘুষি না মেরে চড় মারা উচিত ছিল, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। অথবা কড়া কথা না বলে' তুটা মিছরীর ছুরি হানলে মন্দ হ'ত না, এ তর্কও কোন কাজের নয়। যে হেতু দেখা যায়, যেখানে কাজের প্রতি আস্থা কম, সেইখানেই কায়দার প্রতি দৃষ্টি বেশী; আর সত্যিকারের প্রাণ যেখানে নেই, সেইখানেই আচারের আড়ম্বরই সর্ব্বস্ব।

কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু বড়, যা কিছু কাজের, তা কথা থেকে সুরু হয়েছিল ; সে কথা বজ্রের মত দিগন্ত ধ্বনিত করে', কাপুরুষকে কম্পিত করে', অপরাধীকে ভৎর্সিত করে', অজ্ঞানকে নাড়া দিয়ে, ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছিল : শব্দব্রহ্ম জেগে উঠে, সুপ্ত জগৎকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে শব্দের পশ্চাতে অগ্নি ছিল, তেজ ছিল, প্রাণ ছিল—সুধু প্রতিধ্বনি মাত্র ছিল না।

শূন্যগর্ভ প্রান্তরের পরপার হ'তে প্রতিধ্বনি আসে ; শূন্যগর্ভ মানস-ক্ষেত্র হ'তে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। আমাদের জীবনটাই প্রতিধ্বনিময় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; কোথায় কবে কোন্ ধ্যানলব্ধ মন্ত্রের উদাত্ত স্বর ধ্বনিত হয়েছিল—আমাদের শূন্য মানসক্ষেত্র হ'তে তার প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি শোনা যাচ্ছে। যে যেদিক থেকে হাঁক দিচ্ছে, অমনি আমাদের শূন্য জীবন-প্রান্তরের এক প্রান্ত হ'তে, তার প্রতিধ্বনি উত্থিত হচ্চে : কিন্তু প্রতিধ্বনি, প্রাণহীন অসম্পূর্ণ মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী : আমাদের হৃদয়ের সাড়াও তাই—প্রাণহীন ও মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। কোন ডাকই আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগাতে পাচ্ছে না, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনিতেই সব মিলিয়ে যাচ্চে। আমাদের মুখের কথা সেই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ; এই অর্থে আমাদের পক্ষে কথা কহা সহজ, কাজ করা শক্ত। কিন্তু যে-বাক্য অত্যাচারের মস্তকে বজ্ররূপে পতিত হয়, অসত্যের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে' অন্যায়ের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে' তার দানব মূর্ত্তি প্রকাশিত করে' দেয় সে-বাক্য জ্ঞানের পরিপূর্ণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও অকুতোভয়ে স্ফুরিত হয়। সে-বাক্য অমূল্য !

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০

২০

মা ভৈঃ

চারিদিকে সাড়া পড়ে' গেছে, "নারী জেগেচে", ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী নেই; আমি কিন্তু দেখছি, "নারী রেগেচে", তার সঙ্গে ভারত উদ্ধারের কোন সম্বন্ধই নেই। কেউ কেউ বলবেন—রেগেই যদি থাকেন—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত হ'তে পারে? হাঁ তা পারে; কিন্তু অনুগ্রহ করে' যদি নিদ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে, ত রেগে কি লাভ?

সতী একবার রেগেছিলেন—আশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা করে', দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা দেখিয়ে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে', পিতৃগৃহে অনাহূত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন—ফল হয়েছিল পিতার অজমুণ্ড, যজ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামীর স্কন্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিক দিগন্তে ছড়িয়ে চতুঃষষ্ঠী পীঠস্থানের সৃষ্টি; কিন্তু ধ্বংসলীলার সেইখানেই অবসান হয় নি—প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গিরিরাজ-গৃহে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ, এবং পরিত্যাগের পর পুনর্মিলন হ'য়ে তবে সে নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড়ভোলা নয়, এমনকি আফিমখোর কমলাকান্ত পর্যান্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্চে।

কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভাবনার বিশেষ কারণ দেখচি না। প্রথম কারণ, মা-সকল তাঁদের নিজের মামলার ওকালতি নিজেই আরম্ভ করে' দিয়েছেন। এই অসমসাহসিকতার কাজ পুরুষও করতে সাহস করত না। মোকদ্দমা চালাতে হ'লে উকীলের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। ধর্ম্মাধিকরণের কাঠগড়ায় ফরিয়াদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে, নিজের মামলায় নিজে সওয়াল জবাব করা, প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির অন্যতম পরিচয় বলে' আমার আশঙ্কা হয়। ফল যে খুব সম্ভব মোকদ্দমায় হার, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয় না। অতএব স্বামী তথা আ-স্বামীগণকে আমি আশ্বাস দিয়ে, 'মা ভৈঃ' বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্চি না।

মা-সকল যে সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেচেন, বা জেগেচেন, যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্চে—সাম্য—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকরণ, equality of the sexes. এই equality বা সাম্য, আপাততঃ এমনই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে হচ্চে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চলতে পারে তা মনেই আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে আছে—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই genus homo এই পর্য্যায়ভুক্ত ; তা ছাড়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নেই বল্লেই হয়—সামাজিক বা পারিবারিক unit হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন জীব।

ভিন্ন হ'লেই ছোট বড় হ'তে হবে, তার কিছু মানে নেই ; বোম্বাই আম আর মর্ত্তমান কলা, দুটা ভিন্ন ফল,—কিন্তু কে ছোট কে বড়, ও-প্রশ্নের কোন মানেই হয় না ; দশ টাকায় এক মণ চাল,—দশটা টাকা, আর এক মণ চাল, দুই তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু দুটা

এক বস্তু নয়। অতএব দেখা যায়, ভিন্ন হ'লেও তুল্য-মূল্য হ'তে পারে; কিন্তু তুল্য-মূল্য বলে' এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা—ভিন্নধর্ম্মী বলে' কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়; তুল্য-মূল্যই যদি হয় তা হ'লেও এক নয়।

People do not realise that equity and equality are not the same thing, that equality may co-exist with difference, and is not secured by sameness, and that just as the heart and the liver may each be considered "equals", tho' performing different functions, so the equality between men and women may, after all, best be secured by not striving for identity.

স্ত্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথা বলেন, তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে, মা-সকল "রেগেছেন", জেগেছেন একথা বলতে পারব না।

তারপর স্বাধীনতার কথা; মা-সকলের আব্দার এই,—কেন স্ত্রী পুরুষের অধীন হ'য়ে, আজ্ঞাবাহী, পুতুল-নাচের পুতুল হ'য়ে থাকবে! এখানেও আমি "রাগার"ই লক্ষণ দেখতে পাই—"জাগার" লক্ষণ দেখতে পাই না। প্রথম কথা, গৃহস্থলীটা প্রাচীন Sparta রাজ্যের মত যুগ্ম রাজার রাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? দুইএ এক না হ'য়ে গিয়ে দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) "স্বতন্ত্র উন্নত" হ'য়ে গৃহস্থলীকে যদি Democratic নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তা হ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশান্তি লাভের আশা

করা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, যে অধিকাংশ স্থলে একের প্রাধান্যই বলবান হ'য়ে ওঠে—তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেরই হ'ক, অথবা স্ত্রী পুরুষ দুইএ মিশে এক হয়েই হ'ক; কিন্তু যেখানে Dual sovereignty সেইখানেই বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ। মা-সকলের এটাও দেখা উচিত যে ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তার চেয়ে কিছু কম স্বাধীনতা স্ত্রীগণ অন্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন না।

তবে মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ ব্যভিচারী হ'লে তার সাতখুন মাপ, কিন্তু রমণীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য একটু পদস্খলন হলেই, সে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তার এতটুকু অপরাধেরও মার্জ্জনা নেই। মা-সকলের এ কথাটা একটু খোলসা করে' বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে' দেওয়া যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তা'তে আমার আপত্তি নেই, আমি বরং তার খুব পরিপোষণ করি। কিন্তু পুরুষের বেলা আইনটা যেমন আলগা, নারীর বেলাও, সমানাধিকরণের নিয়মে, তেমনি আলগা কেন হবে না—মা সকলের যদি এই অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বলব না ত কি? আর রাগের সঙ্গেই বুদ্ধিনাশ, আর তারপর—বিনাশ।

সাম্যবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর যাই করুন, ব্যভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে' দেখা যায়, তা হ'লে সে পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় না। Nothing will equalise the offence, however you equalise the penalty. For nothing can equalise its 'consequences' or

the degree of wrong that may be done by one to the other.

স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে নিজে উপায়ক্ষম হ'ন, এবং তদনুযায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ শূন্য—সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেই খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট করেও, কোনদিন এ পর্য্যন্ত তার গৃহিণীকে বলেনি—"আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে' নাও।" পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই বলতে হবে; কিন্তু যদি ঐটে অছিলে মাত্র করে' নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ পরিষ্কার করে' নিতে থাকে, তা হ'লে পুরুষ বেচারীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হবে।

তারপর মা-সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেরিয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প বলে' কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যাঙ্কের দাওয়ান থেকে আরম্ভ করে' কোদাল-পাড়া পর্য্যন্ত, সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এ দেশে উপস্থিত এসে লেগেছে, সে দেশে factory girl থেকে আরম্ভ করে' ছুতার, রাজমিস্ত্রি, chauffeur, গাড়োয়ান, মেয়েরা সব কাজই কচ্চে, আবার member of Parliament-ও হয়েচে। স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদে কার্য্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী "স্বাধীন" বলে' পুরুষের অধীনতা পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারে নি।

কেন পারে নি তার কারণ বলচি। স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, সেটার নাম—মৈত্রী। এই মৈত্রীর ক্ষুধা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, উভয়েরই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে; স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক—কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কন্দর থেকে চিরদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হচ্চে, সে আহ্বানকে কানে তুলা দিলেও, শুনতে হবে. কেননা সেটা বাইরের আহ্বান নয়—সেটা ভিতরের ডাক।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

২১

সৈরিন্ধ্রী

আমি একদিন প্রসন্নকে বল্লুম—স্বাধীন হ'বে, প্রসন্ন? প্রসন্ন হাঁ করে' রইল। প্রসন্ন মনে কল্লে হয়ত আমি নেশার ঝোঁকে কথা কচ্চি—তা নয়; আমি আবার বল্লুম—প্রসন্ন, স্বাধীন হবে?

প্রসন্ন। আমি আবার কার অধীন? আমি কার খেয়ে রেখেছি যে, পরের এস্তাজারি করতে হবে?

আমি। তবুও স্বাধীন হ'লে—যা খুসী করবে, যেখানে খুসী যাবে।

প্রসন্ন। আমি কোথা যাই না? আমায় আটকে রাখে কে? আমাকে বেঁধে রেখেছে কে? আমি হাটে যাই, মাঠে যাই, তীর্থে যাই, মেলায় মচ্ছবে কোথা যাই না—

আমি। তা বটে, কিন্তু তবু তুমি স্বাধীন হ'লে আর এক রকম হ'য়ে যাবে—স্বাধীন হ'য়ে যাবে।

প্রসন্ন। সে কি রকম?

আমি। বুঝতে পাচ্চ না—স্বাধীন না হ'লে স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলতে কি, প্রসন্নর কথায় আমারই মনে ধাঁধা লাগতে লাগল, স্বাধীন হ'লে এর বেশী প্রসন্ন আরও কি হ'তে পারত? লড়াইএ যেত—না বক্তৃতা করত?

প্রসন্ন। হাতে-পায়ে বেড়ির মধ্যে ত তুমি। বুড়ো ব্রাহ্মণ কোন যোগ্যতা নেই—নিজের ভালমন্দ জ্ঞান নেই—যেন কচি ছেলে—যেন পাগল—তুমিই ত আমার বুড়ো বয়সের সব চেয়ে বড় বাঁধন—তা ছাড়া আমার মঙ্গলা আর-একটা বাঁধন, বাঁধনের মধ্যে ত এই দুই।

আমি। গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ—প্রসন্ন ঠিক শাস্ত্রসম্মত হিন্দু জীবনই ত যাপন কচ্ছ। প্রসন্ন, তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না, তুমি তরে' গেলে—তুমি স্বাধীন হও আর না-হও, তা'তে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু বয়সকালে তুমি ত ছাড়া-গরুটির মত ছিলে না—তখন ত গোজেবাঁধা-গরুর মত সাধু ঘোষের গোয়ালে বাঁধা থাকতে।

প্রসন্ন। যখন যেমন তখন তেমন করতে হবে ত! না হ'লে, সংসার চলবে কেন?

আমি বড় বিস্মিত হলুম; প্রসন্নর দিক দিয়ে স্বাধীনতার আবদার একবারও এল না; আমি "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই" হিসাবে জাগিয়ে তুলতে গিয়েও কৃতকার্য্য হলুম না। হায় রে বাঙ্গালীর নারী!

প্রসন্ন। রাখ তোমার স্বাধীনতার বাজেকথা; দুটো মহাভারতের কথা বল—আমার এবেলা কোন কাজ নেই।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কোন কাজ না থাকলে সে আমার মুখে শুনতে আসত; পুণ্যবতী বলেই শুনত, কি শুনে পুণ্যবতী হ'ত, তা ঠিক বলতে পারলুম না। যা হ'ক, স্বাধীনতার কথা ভাবতে ভাবতে সৈরিন্ধ্রীর ইতিহাস মনে পড়ে' গেছল—সেইখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করে' দিলুম।

পঞ্চস্বামী বিরাট রাজার সভায় আত্মগোপন করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। রূপসম্পন্না অনাথা একবস্ত্রা পাঞ্চালতনয়া দ্রৌপদী আশ্রয় ভিক্ষার্থ সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলে, বিরাট-বধূ তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছেন, পাছে এই লাবণ্যবতী বিরাটরাজার দৃষ্টিপথে পতিতা হন—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর?" দ্রৌপদী বলিলেন—"আমি সৈরিন্ধ্রী, পরিচারিকা মাত্র, কেশপাশ বিন্যাস, গন্ধ বিলেপনাদি পেষণ ও মল্লিকা উৎপল চম্পকাদি পুষ্পপুঞ্জের বিচিত্র পরম শোভান্বিত মাল্যগ্রন্থনে আমার নৈপুণ্য আছে। পূর্ব্বে আমি কৃষ্ণের প্রেয়সী সত্যভামার আরাধনা করিতাম, পরে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। আমি উত্তম অশন-বসন লাভ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করি, এবং যে-স্থানে যতদিন তাহা লাভ করি, সে-স্থানে ততদিন আমার মন রত থাকে; সেইজন্য আমার নাম মানিনী; আমি আপনার নিকেতনে অবস্থানার্থ সমাগতা হইলাম।"

সুদেষ্ণা কহিলেন—"হে শুচিস্মিতে, সুভ্রু, লোকে যেমন আত্মবিনাশের জন্য বৃক্ষে আরোহণ করে, অথবা কর্কটী যেমন আপন মরণ-কারণ গর্ভধারণ করে, তোমাকে রাজগৃহে আশ্রয় দিলে আমার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে।" দ্রৌপদী কহিলেন—"মহাসত্ত্ব পঞ্চ গন্ধর্ব্ব যুবা প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব কোন ব্যক্তিই আমার প্রতি লুব্ধ হইতে পারিবে না।" সুদেষ্ণা এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"এরূপ হইলে আমি তোমাকে ইচ্ছানুরূপ বাস করাইব—তোমাকে কোনক্রমেই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ বা কাহারও পাদপ্রক্ষালন করিতে হইবে না।"

মহাভারতের কথা অমৃত সমান—কিন্তু নারী সম্বন্ধে এ কথা আমার অমৃত সমান লাগল না; প্রসন্ন শুনছিল, তারও লাগল না। নারী কি এত সন্দিগ্ধা—নারীর প্রতি এত অবিশ্বাসিনী যে, রূপবতী ললনার গৃহমধ্যে অবস্থিতি মাত্রে স্বামীর মন বিচলিত হ'য়ে সর্ব্বনাশের সূচনা করতে পারে এমন হীন কল্পনা তার মনে উদিত হওয়া সম্ভব? কিন্তু মানবচরিত্রজ্ঞানের বিশাল-বারিধিতুল্য ব্যাসের অগাধ পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হ'তেও পারলুম না। প্রসন্ন বল্লে—এটা মেয়ে-মানুষ মেয়ে-মানুষকে বিশ্বাস করে না, তা নয়; মেয়ে-মানুষ পুরুষকে বিশ্বাস করে না, এইমাত্র প্রমাণ হচ্চে। আমার সে কথায় মন উঠল না, কেননা, এ ত আর কলিযুগের কথা নয়; আর প্রসন্নর কথাই যদি সত্যি হয়, ত যুগে যুগে স্ত্রী স্ত্রীই আছে—আর পুরুষ পুরুষই থেকে গেছে; কেননা হাজারই নারী জেগে থাকুন, অজ্ঞাতকুলশীলা রূপবতী ললনা গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লে, স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ও তৎসঙ্গে অভ্যাগতার প্রতি সন্দেহ তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন করে' দেবে! তবে সুদেষ্ণার মত অন্তরের আশঙ্কা স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করবার মত বলের হয় ত তাঁর অভাব হ'তে পারে।

আমি আরও একটু ভেবে দেখলুম—এ প্রকার গূঢ় সন্দেহের দ্বারা নারী যত সহজে নারীর অমর্য্যাদা করে, পুরুষ তত শীঘ্র পারে না; তথাকথিত শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ তারতম্য হয় না।

তারপর বিরাটরাজের শ্যালক মহাবল কীচক দেবতার ন্যায় বিচরণ-কারিণী দ্রৌপদীকে হঠাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কুসুম-শরে প্রপীড়িত হইয়া,

ভগিনী সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—“শুভে! সুজাতমদিরাতুল্য-মোহকারিণী এই শোভনা কামিনী কে?” সুদেষ্ণা ভ্রাতাকে তাঁহার পরিচয় দিলেন, এবং উভয়ের মিলন সাধন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া উপদেশ দিলেন, কৌশলে সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের নিকেতনে প্রেরণাভিলাষে বলিলেন—“সৈরিন্ধ্রি, আমি পিপাসায় সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র কীচকের গৃহে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুরা আনয়ন কর।” সৈরিন্ধ্রী এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বিরাট-মহিষীকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না; তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে শঙ্কাপূর্ণ চিত্তে দৈবের শরণাপন্ন হইয়া কীচকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। পারগমনেচ্ছু ব্যক্তি নৌকালাভ করিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, কীচক সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

এ কি চিত্র? ভ্রাতা, ভগিনী, আশ্রিতা কুলললনা, এ তিনের মধ্যে এ কি বীভৎস ব্যাপার? এ কি ‘যা শত্রু পরে পরে’? স্বীয় প্রেমাস্পদের হৃদয়ে একাধিপত্য রক্ষা করবার মানসে, ভগিনী জেনে-শুনে আশ্রিতাকে পশুপ্রকৃতি ভ্রাতার কবলে প্রেরণ কল্লেন? এই কি অমৃত সমান কথার নমুনা, অথবা কথা সত্য এবং সত্যই একমাত্র অমৃত, সুমিষ্ট না হ’লেও?

কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী রাজার শরণার্থিনী হইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত; যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কীচক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। দ্রৌপদী আত্মগোপনকারী নিরুদ্বিগ্ন স্বামিগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—“পতিব্রতা প্রেয়সীকে সূতপুত্র

কর্ত্তৃক বধ্যমানা দেখিয়াও যাঁহারা ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন—তাঁহাদের বীর্য্য ও তেজ কোথায় রহিল ?" বিরাট-রাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কীচককে দণ্ডিত না করায় আপনার রাজ-ধর্ম্ম দস্যু-ধর্ম্মের তুল্য হইতেছে।"

বিরাট কহিলেন, "তোমরা উভয়ে পরোক্ষে কিরূপে বিবাদ করিয়াছ তাহা আমি জানি না, তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত না হইলে আমি কি প্রকারে বিচার-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারি।" বিচার-কৌশলের বিশেষত্বই এই। ফলে কোন প্রতীকার হইল না; যুধিষ্ঠির ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেও পত্নীকে বলিলেন—"যাঁহারা বীরপত্নী হ'ন, পতির অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেন। সামান্যা নটীর ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া রাজসভায় ক্রন্দন করা উচিত নহে; সভাসদগণের ক্রীড়ায় ব্যাঘাত হইতেছে, তুমি এখন যাও, গন্ধর্ব্বেরা সময় পাইলে বৈরনির্য্যাতন করিবেন।" এই প্রকার ইঙ্গিত করিয়া যুধিষ্ঠির নির্য্যাতিতা পত্নীকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন। যাইবার সময় সৈরিন্ধ্রী কহিলেন,—"আমি যাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী বোধ হয় তাঁহারা অতিরিক্ত দয়াশীল!" রোষাবেগ বশতঃ আরক্ত-নয়না আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন।

"ভীমসেন ব্যতীত আমার মনঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না"—এই চিন্তা করিতে করিতে সৈরিন্ধ্রী, মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম বনে প্রসুপ্ত সিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে প্রবুদ্ধ করিলেন; বলিলেন,—"উঠুন, মৃতের ন্যায় কি প্রকারে নিদ্রিত রহিয়াছেন—আপনার ভার্য্যা অপমানিতা, পাপিষ্ঠ জীবিত, আপনি কেমন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?"

দ্রৌপদী ভীমসেনের নিকট আপনার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, সকল দুঃখ, সকল অপমানের কথা বলিয়া, পাপিষ্ঠের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীমসেন ভার্য্যাকে শান্ত করিলেন এবং বৈরনির্য্যাতনের প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। পরদিন রাত্রিতে কীচককে গোপনে হত্যা করিলেন—কেননা তখনও পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পরিসমাপ্তি হয় নাই। কীচক নিপাতনে দ্রৌপদী সন্তাপরহিতা ও পরম আনন্দিতা হইলেন।

মহাভারতের সৈরিন্ধ্রীর ইতিহাস আলোচনা করতে করতে, আমার বর্ত্তমান কালের সৈরিন্ধ্রী বা সৈরিন্ধ্রীপদপ্রার্থিনী নারীগণের কথা স্বতই মনে হ'ল। এই বিরাট রাজ্যে আত্মগুপ্ত বা প্রকৃতই ক্লীবধর্ম্মচারী পতিগণের নিদ্রালু অবস্থায়, নারীর সৈরিন্ধ্রীবৃত্তি সাতিশয় বিপদসঙ্কুল তার সন্দেহ নেই। দেশে ও সমাজে কীচক ও উপকীচকগণের কখনও অসদ্ভাব হবে না—যা দ্বাপরে হয়নি তা কলিতে হবে কেন? অতএব একদিকে বিচার-কৌশল-প্রয়োগপটু রাজা ও ক্লীবধর্ম্মী পুরুষ, ও অপরদিকে পশুপ্রকৃতি কীচক ও উপকীচকগণ—এতদুভয়ের মধ্যে স্বৈরবিহারিণী নারীর বিপদ অনেক, একথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না। দ্রৌপদীর মত তেজস্বিনী বিচক্ষণা রমণীরও যখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ভীমসেন ভিন্ন গতি ছিল না, তখন ভীমসেন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে আধুনিক সৈরিন্ধ্রীগণ এই বিরাট রাজ্যে স্বৈরবিহারের স্বাধীনতার অভিলাষিনী হবেন না—কিন্তু আবার এ কথাও সত্য যে, এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি বিদেশীয় অনুকরণের বিকৃত পরিণাম বা বিলাসমাত্র না হয়—যদি নারী অন্তরের সহিত স্বৈরিণী হবার

অভিলাষী হ'য়ে থাকেন, এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তার যথার্থ প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সূপকার নিদ্রিত ভীমসেনেরও নিদ্রাভঙ্গ হবে ; নির্য্যাতিতা পত্নীর মান, সেই সঙ্গে নিজের মান, রাখবার জন্য তিনি স্বতঃপ্রবুদ্ধ হ'য়ে দণ্ডায়মান হবেন। নারী স্বৈরিণী হ'লে, তাঁর দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেলেও, তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারবেন না।

প্রসন্ন বলিল—তার নিজের মান নিজের হাতে, তার ভীমার্জ্জুনের দরকার নেই, সম্মার্জ্জনীই যথেষ্ট।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

২২

কামিনী-কাঞ্চন

বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে' মহম্মদ, তারপর পরমহংসদেব পর্য্যন্ত কামিনীর প্রতি একান্ত বিমুখ। ভাষাটা যদি ভাবের আবরণ না হ'য়ে ভাবের অভিব্যক্তিই হয়, তা হ'লে কামিনী কথাটাতেই নারীর প্রতি চিরদিনের অশ্রদ্ধাই crystallised হ'য়ে রয়েছে। Wo-man কথাতেই নাকি manএর woeই সূচনা করে। মাঝে মাঝে কবি, (যাঁকে কবিগুরু বাতুল বলেচেন) নারীকে ministering angel বলে' সুখ্যাতি করেচেন; কিন্তু সে কথায় নারীর কামিনী আখ্যা মুছে যায় নি, সংসারেও তার স্থান খুব প্রশস্ত হ'য়েও যায় নি। কিন্তু স্বর্গই বল আর সংসারই বল, নারী ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, অতএব যতই হেনস্তা কর, নারীকে একটা প্রকৃষ্ট স্থান দিয়ে রাখতেই হবে; সে স্থান কোথায় হবে তা' নিয়ে জগৎ জুড়ে একটা বিতণ্ডা চলেচে; শীঘ্রই পুরাতন ব্যবস্থার একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে বলে' মনে হয়। নারী মানুষ, সে আপনার একটা হেস্তনেস্ত করে' জগতের দরবারে আপনার স্থান করে' নেবে। কিন্তু কাঞ্চন সম্বন্ধে অন্য কথা।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। এই ত কাঞ্চনের প্রতি সনাতন গালাগাল। আমার মনে হয় একথা যিনি বলেছিলেন তিনি আমারই মত অর্থহীন নিরর্থক জীবন যাপন করে', "দ্রাক্ষাফল হয় অতিশয়

অম্লরসে পরিপূর্ণ" বলে' আপনার মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। যিনি সে ফলের ঝুড়ি নিয়ে বসে' তার রসাস্বাদ করবার সুযোগ পেয়েছেন— তাঁর মুখে দ্রাক্ষাফলের মিষ্টত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পুষ্টিকারিত্ব ইত্যাদি গুণেরই ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া গেছে; আর যাঁরা সে রসে বঞ্চিত, অধিকাংশ-ক্ষেত্রে তাঁদেরই মুখে স্তুতির পরিবর্ত্তে নিন্দাই উদ্ঘোষিত হয়েচে।

অর্থ অনর্থের মূল, হয়ত এক সময়ে ছিল; যখন দেশে চোর ডাকাতের ভয় বেশী ছিল—যখন সুধু ধন নয়, ধনাপবাদেও ডাকাত পড়ত, যখন টাকা থাকলে দেশের রাজার পর্য্যন্ত চক্ষু-পীড়া উপস্থিত হ'ত। অর্থ সম্বন্ধে সে অনিশ্চিততা এখন নেই; এখন অর্থকে অনর্থ বললে চলবে কেন?

আমি ত দেখিচি অর্থ অপেক্ষা চিরস্থায়ী জিনিষ আর নেই। মানুষ যায়, তার বিদ্যা বুদ্ধি, তার জ্ঞান, তার পাণ্ডিত্য, তার সঙ্গে লোপ পায় (খানিকটা সে জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের প্রতিচ্ছবি হয়ত ছাপা কাগজে কিছুদিনের জন্য থেকে যায়), কিন্তু তার সঞ্চিত অর্থ অমর হ'য়ে যুগ যুগান্তর থাকতে পারে। তার ধর্ম্মপ্রাণতা, তার দেহের সঙ্গে ভস্ম হ'য়ে যায়; কিছুদিন হয়ত তার সুনামের সুরভি বন্ধুজনের হৃদয়-মন সুরভিত করে' রাখে; কিন্তু তার সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত অর্থ যদি থাকে, ত সে পুরুষানুক্রমে তার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে পারে, তার পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার সমবায়ে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল, সেই অর্থ একটা বিরাট potential energyর power-house হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারে; এবং সে potential energy কোনদিন kinetic energyতে পরিণত হ'য়ে, সঞ্চয়কারীর পরিশ্রম অধ্যবসায় বুদ্ধি বিচক্ষণতার পুনর্জন্ম হ'তে পারে।

সকলেই জানে এবং আমিও জানি যে, অর্থ অনর্থ হ'য়ে উঠে তখন যখন সে অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করে, অপদার্থকে পদার্থত্ব দেয়; সমাজে ও রাষ্ট্র মধ্যে relative ও absolute value উল্টেপাল্টে দেয়। কিন্তু সেটা অর্থের দোষ নয়, জগতের দোষ, অর্থাৎ মানুষের মনের দোষ। আমি দেখিচি যে, অর্থ না থাকলে বন্ধু মিলে না; কবি বলেচেন "কড়ি বিনা বন্ধু কই"। অর্থ থাকলে অনেক অনর্থ সমাজে সম্ভব হয়—ঘটেও; "কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লাগি মরে গিয়া, কড়িতে কুলবতী মজে"—সে সব সত্য। কিন্তু কড়িতে অসম্ভবও সম্ভব হয়—"কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে"। আমি আরও দেখিচি যে অর্থের অত্যাচার অর্থের ব্যভিচার যা-কিছু, সঞ্চয়কারীর দ্বারা খুব অল্পই হ'য়ে থাকে। যে বুদ্ধিবিচক্ষণতার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় হয়, সেই বুদ্ধিবিচক্ষণতাই তাকে ব্যভিচার হ'তে রক্ষা করে; ব্যভিচার আসে নিম্নতর পর্যায়ে, যখন মানুষ "বাবা কি কল করেচে, সই করলেই টাকা" বলে' চেক বা দাখিলা সই করে, আর আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত ভূতে টাকা এনে দেয়। সঞ্চয়ীর যে গুণ তা' ব্যভিচারকে দূরে রেখে দেয়। যে সঞ্চয় করে না, সুধু সঞ্চিত বিত্ত ব্যয় করে, তার সে বাঁধ থাকে না, সে স্বতই উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাবে তার আর আশ্চর্য্য কি? পাণ্ডিত্যের বিদ্যাবত্তার দিক দিয়েও ত এই দেখা যায়। পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ, কিন্তু বাবার দোহাই দিয়ে তরে' যাবার চেষ্টা তারও হয়, এ ত শত শত রয়েছে। "আমার বাবার টোল ছিল, আমি মূর্খ?" এ আস্ফালন ত অনেক মূর্খের মুখে শুনা যায়; পাণ্ডিত্যের ফল যদি কিছুমাত্রও উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রে অর্শাত তা হ'লে, অর্থবানের পুত্রের যে দর্প, সেটা খুব অনন্যসাধারণ হ'ত না।

আমি কাঞ্চনের স্বপক্ষে এত কথা বলচি তার প্রধান কারণ আমার বিশ্বাস আমরা গরীব হয়েছি বলে' ধনীর প্রতি ও ধনের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করতে আরম্ভ করেচি। তা'তে কিছুই এসে যেত না, যদি আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে, ধনীর সঙ্গে ও ধনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না হ'ত। আমরা যেমন ন্যাংটা, বাটপাড়ের ভয় রাখি না, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও যদি ন্যাংটা হ'ত, তা হ'লে Soul-force দিয়ে ভারতউদ্ধার হ'য়ে যেত। কিন্তু অবস্থা তা নয়; আমাদের Soul-force দিয়ে Sole-force বা Kick-forceএর বেগ ধারণ করতে হচ্চে। এখানে সুতরাং আমাদের Sole-forceএরই আপাততঃ অধিক দরকার; একথা Soul-forceএর ঋষি পাকে-প্রকারে স্বীকারই করেছেন—এক কোটী টাকা, আর এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের ফরমায়েস করে'। এক কোটী টাকা ত Soul-force নয়ই, আর হাত-পা বিশিষ্ট এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকও নিছক Soul-forceএর dynamo নয়।

যন্ত্রটার এক প্রান্তে Soul-force অপর প্রান্তে Sole-force বা Kick-force—একটাকে পরিচালন জন্য, লক্ষ্য স্থির করে' প্রয়োগ করবার জন্য, আর-একটার প্রয়োজন—driverএর Soul-force আর boilerএর horse-power এই দুইএর সমবায় না হ'লে কোন forceই কাজের হবে না।

অতএব যতটা Soul-forceএর গুণ-গরিমার প্রচার করা হচ্চে, যাতে Sole-force ততটা বাড়ে, তার প্রয়োজনীয়তারও ততখানি প্রচার করা হ'ক—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর, অর্থকে অনর্থ ভাব, এ সব কথা তুলে রেখে দিয়ে, এই কথাই বলা হ'ক যে, প্রত্যেক যুবা পুরুষকে দেশসেবার জন্য, তথা আপনার সেবার জন্য, অধ্যাত্ম-

সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সাধনা করতে হবে; টাকা রোজকার করতে হবে, কর্ম্মযোগের অঙ্গস্বরূপ অর্থ-যোগ করতে হবে। না হ'লে সব কর্ম্মযোগ কর্ম্মভোগে পরিণত হবে, আর সব ত্যাগই প্রাণ-ত্যাগে শেষ হ'য়ে যাবে। Non-co-operationই করুন আর co-operationই করুন, উভয়বিধ পন্থায় অর্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে—আর সে অর্থ সুধু ভিক্ষা বৃত্তি করে' অর্জ্জন করা যাবে না। এই যে জার্ম্মাণ জাতি non-co-operation করে' ফ্রান্সের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করচে, তার জন্য কত কোটি অর্থব্যয় হচ্চে তার ঠিক আছে! গায়ের জোরে অসমর্থকল্পে, অর্থের জোরে এখনও জার্ম্মাণি টিঁকে আছে—যে-মুহূর্ত্তে সে জোর শেষ হবে, সেই মুহূর্ত্তেই ফ্রান্সের পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে। Soul-force,—patriotism বা দেশাত্মবোধ, বা discipline যাই বলুন, এ সব যে নেই তা নয়; তবে এ সমস্তই অর্থের খোঁটার জোরে দাঁড়িয়ে আছে; এই অর্থের খোঁটা ধরে' এখনও জার্ম্মাণ মেড়া লড়চে, এ খোঁটা ভাঙ্গলে তার এ লড়াই শেষ হ'য়ে যাবে। তাই বলচি—অর্থমনর্থম্ এ ভ্রান্ত উপদেশ দেওয়া বন্ধ করে' দেওয়া হ'ক; ভিক্ষুক—spiritual হ'ক বা material হ'ক, আমাদের দেশে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা নয়; অর্থ উপার্জ্জন কর, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি কর, জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ কর। অন্ততঃ ধনের খাতিরেও সকলে তোমাদের সম্মান করবে—ভয় করবে।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

২৩

বাসাংসি জীর্ণানি

পাগলা মাথম বলেছিল—"কাপড়ের ভিতর তুইও নেংট, আমিও নেংট, সবাই নেংট" ; তা'তে মেচোহাটার মেচুনী-বেটি তার গায়ে আঁস-জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কথাটা সত্যি ; নিছক মানুষটা উলঙ্গই বটে, তার কোমরের কাপড়খানা বা পাজামাটা মানুষ নয়, মানুষটাকে ঢেকে রাখবারই যন্ত্রবিশেষ।

শাস্ত্র বলেচেন—মৃত্যু মানে কাপড় ছাড়া, পুরাতন ছেড়ে নতুন কাপড় পরিধান করা ; এ কথার ভিতর একটু রহস্য র'য়ে গেছে। যেটা মানুষ, যেটা সত্যিকারের তুমি বা আমি, যেটা উলঙ্গ নিরুপাধিক আত্মা, সেটা ঠিক উলঙ্গই থেকে যায় ; কণ্ঠী নামাবলি, আচকান টুপী, হ্যাট কোট, পাগড়ী পায়জামা পরা মনুষ্যদেহের ভিতর দিয়ে সেটা উলঙ্গই থেকে চলে' যায়, সেটার বিকৃতিও হয় না, পরিবর্ত্তনও হয় না।

কাপড়ের ভিতর তুমি আমি উলঙ্গ থাকলেও, পরিচ্ছদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'য়ে যায় ; তোমার আমার প্রকৃতির, সংস্কারের, **mentality**র ছাপ পরিধেয়ের উপর ফুটে ওঠে। আমি শুনেচি যীশুখৃষ্টকে ক্রস্ থেকে নামিয়ে যে পরিচ্ছেদে ঢাকা দিয়েছিল, সেটা এখনও **Vatican**এ যত্ন করে' একটা আধারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েচে, বৎসরে একবার সে আধারটা খোলা হয়। কয়েক বৎসর

আগে একবার একজন ফটোগ্রাফার সেই পরিচ্ছদটার ফটো নেন; প্লেটখানা develope করে' দেখা গেল—সেই পরিচ্ছদের মধ্যে একটা মানুষের মূর্ত্তির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। হ'তে পারে এটা একটা photographic jugglery, কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষটার দেহের ছাপটা এতদিন তার পরিচ্ছেদে লেগে থাক আর নাই থাক, মানুষটার মনের ছাপ তার পোষাকে ছিলই ছিল; আর, কতখানি মনের রাজ্য আর কতখানি দেহের রাজ্য তা'ত এখনও সঠিক বলা যাচ্চে না। যাই হ'ক, মানুষ যখন তার পোষাকের ভঙ্গীটা বদ্‌লে ফেলে, তখন বুঝতে হবে যে তার মনও বদলে গেছে, পুরাতন মানুষটা মরে' গেছে; এবং সকল মরার পরই যখন বাঁচা আরম্ভ, তখনই সেই মরা-বাঁচার সন্ধিস্থলেই অতর্কিতে সে সাপের খোলসছাড়ার মত, "বাসাংসি জীর্ণানি" ত্যাগ করে' "নবানি" গ্রহণ করতে আরম্ভ করেচে; আর পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ পরিচ্ছদেই তারই মনের ছাপ থেকে গেছে। অতএব কথাটা উল্টেপাল্টে দুই রকম করেই বলা চলে—মরা মানে কাপড় ছাড়া, আর কাপড় ছাড়া মানেই মরা, তথা নূতন জীবনের আরম্ভ ও নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ।

ব্যক্তিগত ভাবে একটা মানুষের পক্ষে এ কথাটা যেমন সত্য, মনুষ্য গোষ্ঠী বা সমাজ অথবা জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। আমরা যুগে যুগে কতবার কত রকমই পোষাক বদলালুম তার কি ইয়ত্তা আছে; আবার এক যুগেই কত রকম ভোল ফেরালুম তারই বা নির্ণয় কে করে! আমার দেখতাই ত হ্যাট কোট থেকে গান্ধী-টুপী পর্য্যন্ত চলে' গেল। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র রকমের জিনিষ, সেটাকে **fashion** মাত্র বলা যায়—সেটা যাত্রার দলের সং-সাজা বলতে পারা

যায় ; সেটা মাত্র খেয়াল ; আসরের বাইরে এসে "যে কেলো, সেই কেলো"—তার কথা বলচি না। যখন সমগ্র জাতটা একটা নূতন পোষাক পরে, একটা নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করে—তখনই মরা-বাঁচার কথা আসতে পারে।

আমাদের গ্রামের জমীদার বাবুর বড় ঘরে—যাকে তোমরা drawing-room বল—তাঁর চার পুরুষের ছবি টাঙ্গান আছে। তাঁর প্রপিতামহ-ঠাকুর মুসলমানী কায়দায় সজ্জিত—মাথায় নাপিতের টুপীর মত টুপী, পা পর্য্যন্ত লম্বা কাবা, কোমরে চাপরাসীদের মত দড়ার কোমরবন্ধ, চুড়িদার পায়জামা, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে শটকার নল, পকেট থেকে রঙ্গীন রেশমী রুমাল ঝুলছে। পিতামহ শামলা মাথায়, চোগা চাপকান, পেণ্টুলান, পৃষ্ঠে শালের ত্রিকোণ রুমাল, ইংরেজী রৌপ্য-বগলস দেওয়া জুতা পরিহিত। পিতা riding-suit, হাতে চাবুক, পায়ে top-boot, পার্শ্বে সুসজ্জিত ঘোড়া দণ্ডায়মান। জমিদার বাবু স্বয়ং, চুনট্‌করা আদ্দির পাঞ্জাবী, ফরাস-ডাঙ্গার মিহি translucent ধুতি, পায়ে লপেটা। এই যে চার পুরুষের চার রকমের পোযাক, এ চার রকমের মৃত্যুরই লক্ষণ। কেউ কেউ বলবেন ওটা আমাদের জাতের স্বধর্ম্ম—এখনি যদি "চিনে মালাই ফট্" এসে আমাদের দেশটা দখল করে' বসে, আমরা অমনি চুড়িদার ছেড়ে কেলিকোর চায়না কোট ধরব, কাটের জুতা পরব, টিকি রাখব, আর নপ্পি, moving cheeseএর চেয়েও অতি উপাদেয় বলে, খেতে আরম্ভ করব। কিন্তু তা'তে আমার প্রস্তাবের সমর্থন করে' আর-একটা ঘটনার উল্লেখ করাই হবে, অর্থাৎ আমরা আর-একবার মরব, এইটেই প্রমাণ হবে মাত্র।

কাটা কাপড়ের পরিচ্ছদ ছাড়া আর একটা অদৃশ্য পরিচ্ছদ আছে, যেটা মানুষের মনটাকে আরও গভীরতর ভাবে ঢেকে রাখে—যার প্রভাব তার পোষাকে ত ব্যক্ত হয়ই—তার চোখে মুখে, কথায় বার্ত্তায়, হাসিতে কাশিতে, কাজে অকাজে পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে—সে পরিচ্ছদ বা প্রচ্ছদের নাম গতানুগতিকতা, tradition, custom ইত্যাদি।

সব গতানুগতিকতার প্রারম্ভে একটা বিশিষ্ট হেতুবাদ ছিল, একটা raison d'etre ছিল, এটা কল্পনা করা অন্যায় হবে না। হয়ত সে হেতুবাদ পণ্ডিত গোষ্ঠীর মনের ভিতর লুক্কায়িত থাকলেও খুব স্পষ্টই ছিল। কিন্তু লুকোচুরীর মধ্যে, কালক্রমে সে হেতুবাদ ঝাপসা হ'য়ে এল, ক্রমে পণ্ডিতদের মন থেকেও সেটা উপে গেল। তখন "বিয়েয় বেরাল বাঁধার" মত সেটা একটা অপরিজ্ঞাত হেঁয়ালী-মাত্রে পর্য্যবসিত হ'ল; "এটা কর কেন" জিজ্ঞাসা কল্লে সকলেই বলতে আরম্ভ কল্লে—"ওটা করতে হয়"। "যদি না করি তা হ'লে কি হয়?" তার উত্তরে কোন গূঢ় অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন করা হ'ল। ব্যাপার এইখানে এসে দাঁড়াল—"হয়" আর "ভয়ে"র রাজ্য চলতে লাগল। ভূতচতুর্দ্দশীতে চৌদ্দ প্রদীপ কেন দিতে হয়, আর চৌদ্দ শাক কেন খেতে হয়, তার উত্তর—"হয়, নইলে ভূতে ধরে", নয়ত একটা আজগুবি electricity ঘটিত ব্যাখ্যা, নয়ত গালাগাল।

এই 'হয়' আর 'ভয়ে'র জ্বালায় দেশটা ঝালাপালা হয়েচে; অতএব জানবে আর দেরী নেই, 'কাপড় ছাড়বার' সময় হ'য়ে এসেচে, বহুদিনের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে' নববস্ত্র পরিধানের সময় এসেছে, খোলস্ ছেড়ে নবজীবন আরম্ভ হ'তে চলেচে, দুর্ব্বল দুর্ব্বাক্যের আঘাতে তাকে আর আটক করতে পারবে না।

ভারতের যুগে যুগে এই রকমই হয়েচে। অজ্ঞানতার মহাপ্লাবন থেকে বেদের অর্থাৎ জ্ঞানের উদ্ধার—সে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি যখন আবার যজ্ঞের ধূমে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে নিষ্প্রভ হয়েচে, তখন বুদ্ধ প্রবুদ্ধ হয়েচেন। আবার চারিদিকে অজ্ঞানতা, নিরর্থক গতানুগতিকতার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়ে জাতটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে উঠেচে, অর্থহীন 'হয়'কে 'নয়' করতে প্রস্তুত হয়েচে, ভয়কে শিরোধার্য্য করে' নিতে রাজী হচ্চে না; প্রতি কথায় 'কেন' জিজ্ঞাসা করতে সুরু করেচে, সদুত্তর না পেলে 'হয়' আর 'ভয়'কে যুগপৎ জলাঞ্জলি দিয়ে নব পরিচ্ছদে—যুক্তির জ্ঞানের নির্ভীকতার স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচ্ছদে, বিভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

একদিকে গুরু দেবতা আর-একদিকে কুম্ভীপাক নরক, এই দুইএর জোরে এতাবৎকাল সমাজনেতৃগণ সমাজটাকে মুঠোর ভেতর করে' রেখেছিলেন; এখন হাতের চেয়ে আম বড় হ'য়ে উঠেছে, আর কুম্ভীপাকটাকে মোটেই লোকে মানতে চাচ্চে না। এখন যাকে মানতে চাচ্চে, অর্থাৎ যুক্তিকে ও জ্ঞানকে, সেটা গুরুদেবতাগণের মোটের উপর খুবই অভাব হ'য়ে পড়েচে। তাঁদের এখন সম্বলের মধ্যে গালাগাল, যে কেহ তাঁদের বিরোধী—যাহা কিছু তাঁদের বিরোধী—তার প্রতি অজস্র গালিবর্ষণই তাঁদের বল। তাঁরা বুঝতে পারচেন না যে, 'হয়' আর 'ভয়ে'র দ্বারা আর রাজত্ব করা চলচে না; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ রাজের তা চলচে না, তাঁকেও কাউন্সিলের মধ্যে ও কাউন্সিলের বাইরে কৈফিয়ত দিতে হচ্চে, লোকের মত জানতে হচ্চে, বুঝতে হচ্চে, বোঝাতে হচ্চে।

ঠিক এই পর্য্যন্ত এসে পৌঁছিচি, এমন সময় প্রসন্ন এসে পাশে

দাঁড়াল ; আমাকে দপ্তর নিয়ে বসতে দেখলে প্রসন্ন বিরক্ত হ'ত, হাজার হ'ক গয়লার মেয়ে, দপ্তরের মাহাত্ম্য সে কি বুঝবে ! যাই হ'ক আমি বল্লাম—প্রসন্ন শোন আমি কি লিখলুম—বাসাংসি জীর্ণানি—

প্রসন্ন। ও আবার কি ? ওটা কোন্ দেশের ভাষা ?

আমি। এই দেশেরই ভাষা, দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা—

প্রসন্ন। ওর মানে কি ?

আমি। মানে জিজ্ঞাসা করচ তুমিও ? আচ্ছা বলচি—মানে ছেঁড়া কাপড়—

প্রসন্ন। ছেঁড়া কাপড় নিয়ে তোমার কি কাজ ? ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ত আমরা বাসন কিনি। তা যা হ'ক, ছেঁড়া কাপড় বল্লেই ত হ'ত ; যা লোকে বুঝবে না এমন কথা না বল্লেই ত হ'ত।

আমি। তাই কি হ'ত ? ছেঁড়া কাপড় বল্লেই ত তোমার বাসন-কেনার কথা মনে আসত ; আমার এ বাসাংসি জীর্ণানিতে বাসন-কেনার ব্যাপার মোটেই নেই।

প্রসন্ন। আমার ও-সবে দরকার নেই, তুমি বলবে এক, আর বোঝাতে চাইবে আর-এক, অত ঘোরফের আমি বুঝি না ; সোজাসুজি যা বুঝি, সোজা করে' বল, আমি শুনতে রাজি আছি।

আমি। তা হ'লে তোমার শাস্ত্র-কথা শোনা হ'তে পারে না, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক।

৫ই আষাঢ়, ১৩৩০

২৪

নারীর শত্রু

আমি চিরদিন শুনে আসচি—নারীর নির্যাতন পুরুষে করে, শাস্ত্রে, লোকাচারে, পুরুষই ইহপরকালে নারীর চির-শত্রুরূপে বিদ্যমান। একথা কোন কোন পুরুষের মুখেও প্রকাশ হয়েচে এবং এখন নারীও ঐ কথাই বলতে সুরু করেচে। কিন্তু কথাটা একদম মিথ্যাকথা। নারীর শত্রু নারী, পুরুষ নয়; তার আমি প্রমাণ দেব।

আসামী কবুল দিলেই যে তার নিরপরাধিতা প্রমাণ করা যায় না তা নয়, যাঁরা Evidence Act পড়েচেন তাঁরা তা জানেন। কবুলই যদি শেষ প্রমাণ হ'ত, তা' হ'লে সাক্ষী সাবুদের হাঙ্গামা একেবারে উঠে যেত, সুধু কবুলের উপরেই ফাঁসী হ'য়ে যেত। তবে কবুল করলে, নিরপরাধিতা প্রমাণ করা কিছু শক্ত হ'য়ে পড়ে এই মাত্র। কবুলটা কাটানর জন্য দেখাতে হয় যে, অনেক সময় অপরাধ না করেও মানুষ কবুল করে, অনেক সময় অপরের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবার জন্য লোকে কবুল করেচে এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে, নির্য্যাতনের চোটে মিথ্যা কবুল করাটাই সোজা পথ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম করে' কবুলকারীর অনুকূলে অন্ততঃ benefit of doubt এনে দিতে হয়। এক্ষেত্রে যদি আমি আসামী পুরুষের পক্ষে সেটাও কত্তে পারি, তা হ'লেও তাকে অব্যাহতি দিতে হবে। আর যদি কবুল

করা সত্ত্বেও আমি প্রকৃত অপরাধীকে দেখিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে পুরুষকে honourably acquit কর্ত্তে হবে।

নারীর প্রধানতঃ তিনটি অবস্থা আমি কল্পনা করে' নিলুম—কন্যা, বধূ, গৃহিণী। আদিম মনুষ্য থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত যুগে যুগে নারীর সমাজে স্থান নির্দ্দেশ কর্ত্তে কর্ত্তে নেমে এসে, বর্ত্তমান সমাজে নারী সম্বন্ধে ব্যবস্থার আলোচনা করব না—এ historical survey থেকে আমার বিশেষ কোন লাভ হবে না—যুগে যুগে, মোটের উপর আমাদের দেশে নারীর একই অবস্থা।

আমি বধূ থেকেই আরম্ভ করি, ক্রমে চক্রটা পূর্ণ করে' কন্যায় এসে শেষ করব। পুত্র বিবাহ কর্ত্তে যাচ্চেন, দ্বারদেশে পালকী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরকার দাঁড়িয়ে; বর যাত্রা কর্ব্বেন। শঙ্খধ্বনির (কবি বলেছেন,—শাঁক নয় রোদন-ধ্বনি) মধ্যে মাতা প্রশ্ন কল্লেন—বাবা কোথায় যাচ্চ? পুত্র উত্তর দিলেন—মা তোমার দাসী আনতে যাচ্চি। মাতা আশীর্ব্বাদ কল্লেন; বর দুর্গা বলে' যাত্রা কল্লেন। এই ত সুরু—এই যে সুর বেঁধে দিলেন মাতাঠাকুরাণী, সেই সুরেই গাওনা চলল, বধূ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত—তা সে-শেষটা কেরোসিনেই হ'ক, বা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পরলোক গমনেই হ'ক, অথবা শ্বশুরঠাকুরের পরলোক গমনের পর, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর dowagerত্ব প্রাপ্তিতেই হ'ক।

সালঙ্কৃতা, সবস্ত্রা, কাঞ্চনমূল্যসমেতা, সোপকরণা দাসী নিয়ে বাবাজীবন বাড়ী ফিরলেন! বাবাজীবনেরা প্রায় সকলেই, এই বিবাহ ব্যাপারে এই শুভপরিণয়ের কিছুদিন পর পর্য্যন্তও, মাতাঠাকুরাণীর তথা পিতাঠাকুরের বড়ই 'ন্যাওটো' হ'য়ে থাকেন; কেননা তখনও তিনি পিতার অন্নে পরিপুষ্ট, নিজে উপায়ক্ষম নহেন; হয়ত সবেমাত্র

দুটা পাশ করেছেন, এবং আর দুটা পাশ কর্ত্তে কর্ত্তে দুটি কন্যার পিতা হ'য়ে পড়লেন; সুতরাং অন্য কোন বিষয়ে না হ'লেও, কলত্র ও কন্যাগণের ভরণপোষণের জন্য পিতামাতার একান্ত আজ্ঞাবাহী হওয়া ভিন্ন তাঁর গতি কি? দাসী আনতে যাচ্চি বলে' যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, পরিণীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, অশেষ মাতৃভক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহপরলোকের কল্যাণ অর্জ্জন করা, তাঁর খুবই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে। পরিণীতার প্রতি তাঁর যে কর্ত্তব্য, তার সম্বন্ধে তাঁর যে দায়িত্ব, সে সব শিকেয় তোলা থাকে; কেননা তিনি স্বয়ং ভর্ত্তা হ'লে কি হয়, নিজের ভরণপোষণের জন্য তিনি পিতার মুখাপেক্ষী—ছেলের-বাপ হ'লে কি হয়, তিনি তখন বাপের-ছেলে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তিনি আবার কি করে' পরিণীতার বোঝা বইবেন; তিনি তখনও "স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যং সাধয়তি"। অতএব যাঁর দাসী তাঁর হাতে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

এই যে "শ্বাশুড়ী" যিনি (কবি বলেচেন) "কলিতে অমর", অর্থাৎ যিনি যুগে যুগে একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' বর্ত্তমান,—যিনি ছেলের মা, সুতরাং অপর মায়ের সন্তানের উপর যাঁর শাসনদণ্ড সতত উদ্যত হয়েই আছে—যিনি হয় ত মাতৃরূপে অন্নপূর্ণা, স্ত্রীরূপে "সচিবঃ সখী", ভগিনীরূপে স্নেহের প্রস্রবণ, কন্যারূপে কল্যাণরূপিণী—তিনি কোন অভিশাপের বশে, শ্বশ্রূরূপে জ্বালাময়ী অগ্নিশিখার মত সংসার-অরণ্যে দাবানলের সৃষ্টি করে', বন্য-কুরঙ্গিনী বধূজনকে দগ্ধ করে' মারেন, তা বিধাতাপুরুষই বলতে পারেন! খুব সৌভাগ্যবতী হ'লেও শ্বাশুড়ীর হাতে বধূজনের নিগ্রহ আছেই; সে নিগ্রহের প্রকৃতি Penal Codeএর

ভিতর সকল সময় না পড়লেও, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ "বরিষার বারিধারা প্রায়", সততই ঝরতে থাকে ; কবির কথায়, "উঠতে খোঁটা বসতে খোঁটা শুনবি সাঁজ সকাল"—তা হ'তে অব্যাহতি নেই।

কেহ কেহ বলতে পারেন যে শাশুড়ী মাত্রেই কি বধূ নির্য্যাতন করেন? আমি বলি করবার ত কথা, তবে যদি কোন স্থানে তার অভাব হয়, তার বিশেষ কারণ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিচক্ষণতা, তাঁর বিবেক বুদ্ধি বা সহৃদয়তা নয় ; বাক্যের প্রস্রবণ যদি না ছোটে, সেটা বাহিরের কোন উপলখণ্ড স্রোতের মুখ বন্ধ করার জন্য, জলের বেগের অভাব হেতু নয়। আমি সাধারণ নিয়ম বল্লুম, তার ব্যতিক্রম যদি কোথাও হয়, তার কারণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রকৃতির বাহিরে কোথাও পাওয়া যাবে, তাঁর ভিতর পাওয়া যাবে না।

মা'র মত স্নেহময়ী শাশুড়ী কি হয় না? আমি বলব সেটা নারীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। নারী কারো "মত" হ'তে পারে না, হয় মা হবে, না-হয় মা হবে না,—সৎমা হবে, মা'র "মত" হ'তে পারবে না। হয় স্নেহময়ী মাতা, নয়ত বিষধরী বিমাতা ; হয় নারী তোমাকে ভালোবাসবে, না-হয়, তোমাকে "দুটি-চক্ষের বিষ" দেখবে ; মাঝামাঝি কিছু হওয়া তার প্রকৃতি নয় ; সুতরাং শাশুড়ী যখন নববধূর মা ন'ন, তার মা'র "মত" হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনি তার বিমাতাই হবেন ; আর সৎমা আর শাশুড়ী একই পদার্থ, একটু উল্টাপাল্টা।

মাতা পুত্রবৎসলা, পিতা কন্যাবৎসল, ইহাই biological সত্য। পুত্রবৎসলা মাতা দেখেন, যৌনধর্ম্মের নির্ম্মম নিয়মে স্নেহাস্পদ পুত্র অপর নারীর স্নেহের পাত্র, অপর নারীকে স্নেহের ভাগ দিচ্ছে, নারী হ'য়ে মাতা তা সহ্য করতে পারেন না। স্বামী পত্ন্যন্তর গ্রহণ করলে তাঁর

মনে যে ভাব হয়, স্নেহময় পুত্র অন্য নারীর স্নেহাস্পদ হ'লে তার অনুরূপ ভাব মাতার মনে উপস্থিত হয়। কথাটা যে রকমই শুনাক, সত্য কথা। আমাদের মেয়েলী-ছড়ায় আছে—

মেয়ে বিয়োলাম পরকে দিলাম।
ছেলে বিয়োলাম পরকে দিলাম।

এই হা-হুতাশের ভিতর "পরকে" দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ভাব নেই, নির্ম্মম অন্তর্দাহেরই উচ্ছ্বাস আছে মাত্র।

তারপর শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে-মেয়েটি বিইয়েচেন, সেটি তাঁর নাড়ী-ছেঁড়া রত্ন, তাঁতে আর "পরের মেয়ে"তে ত তুলনাই হ'তে পারবে না। তিনি যদি দোহন কার্য্য শেষ করে' থাকেন, অর্থাৎ বিবাহিত হ'য়ে থাকেন ত তিনি বাপের বাড়ীর বন্ধন থেকে মুক্ত, সুতরাং তাঁর নববধূর সম্বন্ধে কার্য্যের বাঁধও মুক্ত। স্নেহময় ভ্রাতা, যার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে খেলা করেচেন, একসঙ্গে জীবনযাপন করেচেন, আজ বিয়ে হ'য়ে কি তিনি পর হ'য়ে গেছেন যে, শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গী ভাইটীকে একজন "পর" এসে একচেটে করে' নেবে, এবং স্নেহের স্রোতটা অপরদিকে চলে' যাবে বা তার তীব্রতাটা হ্রাস হ'য়ে যাবে? তিনিও নারী, সুতরাং (নারীর মন ভাঙ্গল ত একেবারে দুখানা) তিনি ক্রমে সনাতন মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন, "ননদিনী রাই বাঘিনী" হ'য়ে বসলেন। তাঁর এই বর্ণনাটা আজকের নয়। ননদিনী যদি অবিবাহিতা থাকেন তা হ'লেও—ধানি-লঙ্কা ক্ষুদ্র বলে' ঝালের অভাব হয় না।

পুত্র এই সকল মেয়েলী কথায় কান দিতে পারেন না, তার কারণ পূর্ব্বে বলেছি; পুত্রের পিতাও অন্তঃপুরটা গৃহিণীর স্বাধিকার বলে' কোন কথা কন না; এবং কথা কওয়াটা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ

তা'ও নয়। বধূর পক্ষ অবলম্বন করে' কোন কর্ত্তা যে গৃহ সংসারের শান্তি বা স্বস্তির সহায়তা কর্ত্তে পেরেচেন, তার প্রমাণ আমার জানা নেই; পরন্তু confusion worse confoundedই হ'য়ে উঠেচে; সুতরাং "বোবার শত্রু নেই" এই উপদেশই তিনি সাধারণতঃ অনুসরণ করে' থাকেন।

যাই হ'ক, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তথা তাঁর কন্যারত্নের এই সকল ব্যবহার কেউ ভোলে না, বধূটী ত নয়ই। পুরুষ-মানুষ শুনিচি লড়াই ঝগড়ার পর গাঢ়তর বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ হয়েচে—কিন্তু নারী তা কখনও হয় নি, Forgive and forget নারীর সম্বন্ধে কোনদিনই চলে না। They (women) feel, though they may not say or even think it, that slight or injury admits of no atonement.

একটা মেয়েলী ছড়া আছে—

ছোট সরাখানি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাখানি আছে;
হাসিমুখী বৌ, আমার হাতের আটকাল আছে।

ব্যাপারটা এই, একখানি ছোট সরার মাপে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূকে ভাত মেপে দিতেন; বলা বাহুল্য তা'তে বধূর পেট ভরত না। একদিন অসাবধানে শাশুড়ী ঠাকুরাণী সরাখানি ভেঙ্গে ফেল্লেন; তা দেখে বধূর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল—যে, হয়ত বা এইবার "মা" বড় সরাখানির মাপে ভাত দেবেন। বধূর মুখের হাসি দেখে "মা" বল্লেন—হাসচ কি বউ, মনে করচ যে, ছোট সরা ভেঙ্গে গেছে বলে' আমি বড় সরার মাপে তোমায় ভাত দেব—জেন, আমার হাতের আটকাল (অর্থাৎ আন্দাজ) আছে।

"মা"র এই ব্যবহার বা অনুরূপ ব্যবহার "মেয়ে" অর্থাৎ বধূ কি ভুলতে পারে? কেন ভুলবে? সুতরাং শ্বাশুড়ী যখন dowagerত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এবং বধূ সাম্রাজ্ঞী হ'য়ে বসেন তখন, "গাড়ি পর্ লা" হ'য়ে যায়। তখন যদি বধূ সুদ সমেত শ্বাশুড়ীর প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে থাকেন ত আর্ত্তনাদ করলে চলবে কেন? One who sows the wind must reap the whirlwind—এ ত পড়েই রয়েচে। এই রকম চল্ল পরের পর—নারী যতদিন নারী থাকবে, দাসী হ'য়ে ঢুকবে আর ফাল হ'য়ে, অর্থাৎ শ্বাশুড়ী হ'য়ে, বেরুবে—ad nauseam.

সংসারের ভিতর বধূ পুত্রের স্নেহে ভাগ বসায় বলে' শ্বাশুড়ী জ্বলে মরেন। কর্ত্তার স্নেহে যদি কেহ ভাগ বসায় তা হ'লেও তাই হয়। কিন্তু কর্ত্তার স্নেহে যে ভাগ বসাতে পারে, সে কে? সেও নারী, কুলস্ত্রীই হ'ক আর কুলটাই হ'ক। তা'তেও তিনি জ্বলে মরেন, সংসারে অশান্তি বিশৃঙ্খলা আসে,—কিন্তু বধূটীর মত, সে জ্বালা মেটাবার পাত্র হাতের কাছে থাকে না, সুতরাং জ্বালা দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে। একজন রমণীই বলেচেন—I must accept here as in all relations between the sexes, the validity of the man's plea that rings—yea, and will continue to ring—through the centuries : "The woman tempted me."

অতএব যে দিক দিয়েই হ'ক, বধূর শত্রু শ্বাশুড়ী, শ্বাশুড়ীর শত্রু বধূ বা অপর নারী। পারী সহরের প্রসিদ্ধ একজন Police Commissioner কোন দুষ্কর্ম্মের Report তাঁর হুকুমের তলে আসলে, নীল পেন্সিলে প্রথম হুকুম দিতেন—Cherchez la femme. এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই না হোক অধিকাংশ স্থানেই, অনুসন্ধানের ফলে বা'র

হ'ত যে, কোন নারী-ঘটিত গোলমাল নিয়েই দুষ্কর্ম্মটী সংঘটিত হয়েছে। এ স্থলেও তাই। সংসারের মধ্যে নারীর দুঃখের নিদান খুঁজে বা'র করতে হ'লে—Cherchez la femme, দেখবে নারীই নারীর পরম শত্রু, পরম দুঃখের কারণ, নিশিদিন নির্য্যাতনের যন্ত্র-স্বরূপ বিদ্যমান।

বাঙ্গালাদেশে নারীর অবস্থা আলোচনা করবার সময় অনেকে রঘুনন্দনকে দোষ দিয়েছেন, শিক্ষার অভাবের কথা বলেছেন। ও-সব একেবারেই অসঙ্গত কথা। যে-দেশে রঘুনন্দন নেই এবং শিক্ষা আছে, সেখানেও নারীর সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ মোটের উপর একই। Cattiness স্ত্রী-সুলভ গুণ বা দোষ। All women are cats—এটা ইংরাজী কথা! একজন বিদুষী ফরাসী রমণী আমাকে বলেছিলেন—Monsieur, nous sommes des chiennes. ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে শিক্ষার অভাব নেই, আর সে দেশে রঘুনন্দনও নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সেখানে তেমনতর শিক্ষা হয় নি, যে-শিক্ষায় নারীর প্রকৃতি বদলে যায়। সে-শিক্ষা China থেকে Peru পর্য্যন্ত আজও কোথাও হয় নি বটে; সুতরাং হবারও যে বড় ভরসা আছে তা নেই। আর "দেবী"দের এত শিক্ষার অপেক্ষাই বা কেন?

তবে পুরুষ যে কবুল দিয়ে বসেছে সেটার কারণ কি? আমি একজন ইংরাজ মহিলারই কথায় তার উত্তর দিয়ে এই নারী-মঙ্গল শেষ করব—

Men's chivalry as well as their pride has woven a cloak of silence around this question; this silence has protected women—even the worst.

কন্যার কথা বেশী করে' বলবার আর সুযোগ হ'ল না ; কন্যার পাত্র যোগাড়ের (যাতে সে পাত্র মহাশয়ের কিছুই প্রায় বলবার থাকে না, কেননা, বিবাহ ব্যাপারে তাঁকে পিতামাতার, বিশেষতঃ মাতা ঠাকুরাণীরই, নেওটো হ'তে হয়—তা পূর্ব্বেই বলিচি) কষ্টটা কল্পনা করে', আর ফুলসজ্জার তত্ত্বটা লাথি খেয়ে ফেরত আসবার সম্ভাবনাটা কল্পনা করে' গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়ে তফাত হ'য়ে যায়। সেটাও যার জন্য, মেয়েটা তা ভোলে না,—তার মা'র চোখের জল, আর বাপের শুষ্ক মুখ মনে গাঁথা থাকে। আর বধূ হ'লেও সে যখন মানুষ, তখন সে'ও ওত পেতে বসে' থাকে। সেই লাথি ফিরিয়ে দেবার সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে ভোলে না।

১৯শে আষাঢ়, ১৩৩০

২৫

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

কথায় বলে প্রেমে পড়া, falling in love ; পড়াই বটে, উঠা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য দুটা বিভিন্ন জাতির কথার ভঙ্গীতে একই সত্য ফুটে উঠেচে,—যতক্ষণ বা যতদিন, প্রেমটা স্ত্রী ও পুরুষকে ছাপিয়ে, উপচে গিয়ে, সংসার, পরে সমাজ, শেষে জাতিটাকে অভিসিঞ্চিত করতে না পারচে, ততদিন সেটা পড়াই বলতে হবে, উঠা কিছুতেই বলা যাবে না।

একবার এক পুরুত ঠাকুর একটা বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বিয়ের মন্ত্রগুলা তাঁর মোটেই জানা ছিল না (এমন ত হ'য়ে থাকে !) ; তিনি ফুল বিল্বপত্র ঘণ্টা শাঁক ইত্যাদি নাড়ানাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে' অনুস্বার-বিসর্গ-ঘটিত কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করার পর, বর-কনের হাত দুটো এক করে' মালাগাছটা তা'তে জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে বল্লেন—

যেমন বর তার তেমনি কন্যে,
এই আবাগী ছিল এই আবাগের জন্যে।

—বিয়ে হ'য়ে গেল।

পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রটা খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় না হ'লেও, বর্ণে বর্ণে সত্য। মোটের মাথায় সকল বিয়েতেই যেমন বর তার তেমনি কন্যে, যেমন 'দেবা' তেমনি 'দেবী'ই হ'য়ে থাকে ; বিশেষ বিশেষ স্থলে যেখানে

হয় না, বা হয় নি বলে' উভয় পক্ষের কা'রও সন্দেহ হয়, সেইখানেই গোল বাধে। কিন্তু যতদিন উভয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুধু উভয়ের জন্যই জীবনধারণ করে' থাকে, ততদিন তাদের মিলনটা 'আবাগে' আর 'আবাগী'র মিলন ছাড়া আর কিছুই হয় না ; জন্তু-জানোয়ারের মিলন তার চেয়ে কিছুতেই অন্যবিধ নয়।

বিয়েটাকে যে হিন্দুশাস্ত্রে জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন বলেচে তার নিগূঢ় অর্থ থেকে, সুধু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে গোঁড়ামির একটা খুব কায়মি যুক্তি ছাড়া, আর কিছু পাওয়া যায় না তা' নয়। আমি বুঝি—আমার পূর্ব্বজন্ম আমার পিতৃপুরুষগণ, আর আমার পরজন্ম আমার ঔরসজাত সন্তান থেকে আরম্ভ করে' আমার ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ। এ-ছাড়া পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মের আমি কোন মানেই খুঁজে পাই না। আমার পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণের চেহারা ও চরিত্র নিয়ে আমি জন্মেচি, তাঁদের শক্তি এবং দুর্ব্বলতার সমষ্টি potentialরূপে, সম্ভাবনা-রূপে আমার ভিতর রয়েছে ; সে সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে, এবং আমি যে নব নব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছি, তার সাহায্যে বা তার ধাক্কায়, আমার চেহারা আর চরিত্রের যথাযথ পরিবর্ত্তন হ'য়ে, আমারই পূর্ব্বজন্মের চেহারা আর চরিত্রের বনিয়াদের উপর, দৃশ্যতঃ এবং বস্তুতঃ একটা নূতন জীব তৈরী হ'য়ে, এই জীবন-নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে' চলে' যাব। আমি যদি সন্তানোৎপত্তি না করে' জীবনটা শেষ করে' যাই, তা হ'লে আমার আর পরজন্ম বলে' কিছু হ'ল না, আর সেইখানেই আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও সাধনার শেষ হ'য়ে গেল। প্রকৃতি স্বয়ং অনেক সময় **undesirable** বংশের বিলোপ-সাধন করেন ; অপদার্থ লম্বোদর ঘি-দুধের যমগুলার যে বংশলোপ হয়,

বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকের যে বংশ থাকে না, সেটা এইরকম একটা racial sanitation বজায় রাখবার জন্যই হ'য়ে থাকে। আমার মতন আফিংখোরের যে বংশ থাকবে না, এবং থাকা উচিত নয়, তা' জেনেই আমি প্রকৃতির কাজ এগিয়ে রাখবার জন্যই দারপরিগ্রহ করি নি, না হ'লে এ কন্যাদায়গ্রস্ত দেশে আমারও 'দেবী' মিলত না কি ?

মহীরুহের সম্ভাবনা নিয়েই ক্ষুদ্র বীজের জন্ম ; সেই বীজের অভ্যন্তরে কত বসন্তের মলয়হিল্লোল, কত প্রভঞ্জনের প্রলয়হুঙ্কার, কত বর্ষার সরসতা, কত নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপ, কত রবির কিরণ, চাঁদের জ্যোৎস্না, আকাশভরা অন্ধকার, আর অগণিত নক্ষত্রের দীপালোক—এ সবের নিদর্শন রুদ্ধ হ'য়ে রয়েচে, তা কেউ জানতে পারে ? সেই ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে মহীরুহের উদ্ভব হবে, তারই সম্ভাবনা নিয়ে তার জন্ম—মলয়ানিলের সঙ্গে লাস্যবিলাস, প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, নিদাঘের অগ্নিমধ্যে নিদিধ্যাসন, বর্ষার বারিধারায় ঝারা-স্নান, দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে নিগূঢ় প্রেমালাপের সম্ভাবনা নিয়ে তার জন্ম, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাতে তিলে তিলে তার বৃদ্ধি পুষ্টি ও পরিণতি—অথবা মধ্যপথে কুঠারের ক্রূর আঘাতে কিম্বা কুলিশপাতে তার অকাল-মৃত্যু ও বৃক্ষজন্মের শেষ। এই রকম মানুষও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবে কি না তার স্থিরতা না থাকলেও, একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই সে যাবে, আর সে নির্দ্দিষ্ট পথটা তার অতীত ও বর্ত্তমান, তার পূর্ব্বজন্ম আর ইহজন্ম দুইয়ে মিলে, ঠিক করে' দেবে।

এ কথা যদি মানতে হয়, তা হ'লে কখন্ কোন্ ভ্রমর এল কোন্ অজানা ফুলের পরাগ নিয়ে, কোন্ ফুলে ফল-সম্ভাবনা করে' গেল, সেই সংযোগটাকে সর্ব্বস্ব বলে' না মেনে, ফুলের পশ্চাতে বৃক্ষ, তার পশ্চাতে

সহস্র বর্ষের দেওয়া-নেওয়া ভাঙ্গা-গড়াকে মানতে হয়, ফুলের পূর্ব্বজন্ম মানতে হয়, আর ফুলের ভিতর ফলের, তারপর বৃক্ষের সম্ভাবনা অর্থাৎ পরজন্ম, সেটাকেও মানতে হয়; এবং সংযোগটাকে সুধু সংযোগ মাত্রই ধরে' নিলে, কোন ক্ষতিই হয় না। মনুষ্যজীবনে অতীতের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত প্রচেষ্টার মর্য্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহজন্মে তার সংস্কার, তার বিস্তার হয়, আর ভবিষ্য বংশীয়দের শোণিত-স্রোতে সঞ্চারিত হ'য়ে, চিরবহমান হ'য়ে, চলে যেতে পারে, তার জন্য যত্ন, তার জন্য এই জীবনে সমস্ত আয়োজন, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, ভোগ এবং যোগ সমস্তই করে' যেতে পারলে, তবে ত মনুষ্য-জন্ম সার্থক হ'ল; নয়ত অভাগা আর অভাগীর মিলনকে অগ্নিসাক্ষী করে', নারায়ণকে ডেকে, সংস্কৃত-মন্ত্রপূত করে' কি লাভ? সেটা সুধু mummery and gibberish ছাড়া আর কিছু নয়!

অর্ব্বাচীনগুলো বিয়েটাকে একটা mummeryই করে' তুলেচে, একটা অভিনয়ে এনে দাঁড় করিয়েচে। কনে যাচাই করা থেকে সুরু করে', কনেকে ঘরে পোরা পর্য্যন্ত (দেনাপাওনার পালাটা বাদ দিয়ে) একটা অভিনয় বই আর কি? ছোট দিদিমণির স্নেহাশীষ, আর ছোঠ্ঠাক্‌মা-মণির কাষ্ঠ-রসিকতা, আর বন্ধুমণিদের জ্যাঠামি-পূর্ণ বিয়ের Hand-billগুলো থেকে অভিনয় ছাড়া আর কি মনে হয়?

তবে কি মনোনয়নের কোন মানে নেই? প্রেমের মিলন বলে যাকে, সেটা কি আকাশ-কুসুম বা অশ্বডিম্ব? মনোনয়নের এক-একটা ধারা সব দেশেই আছে; তার রহস্য আর-একদিন ভেদ করবার চেষ্টা করা যাবে; তবে মোটের উপর এই কথাটা আজই বলে' রাখি যে, চিনিতে ছানাতে মিশিয়ে খোলায় চড়িয়ে তাড়ু দিয়ে নাড়লে দুইএ

মিশে ভীমনাগের মণ্ডা হয় ; আর চিনি চড়িয়ে রস পেকে এলে, তা'তে ছানা ছেড়ে দিয়ে তাকে সেই তাড়ু দিয়ে নাড়লেও ভীমনাগের মণ্ডা হয়। উভয়ত্র তাড়ু-নাড়াটাই common factor আর সেটা খুব essential factor. এই জীবনে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যেও—এই জীবন-মরণের অগ্নিকুণ্ডের উপর অবস্থিত সংসার কটাহে, সুখ-দুঃখের আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে, দুটী হৃদয় যে গলে' গিয়ে, মিশে গিয়ে, এক হ'য়ে যায় তার নাম—প্রেম। যুবক-যুবতীর হৃদয় যে টগ্‌বগ্ করে' ফুটতে ফুটতে, একটা আর-একটার দিকে ছুটে গিয়ে শান্ত হ'তে চায়, সেটার নাম দেহের, স্নায়ুর উত্তেজনা, তার নাম কাম,—সেটা "বরষিল মেঘ" ত "ধরণী ভেল শীতল", সেটার কথা না বলাই ভাল। মোটের মাথায় সেটা স্বার্থপরতা, Egotismএর চূড়ান্ত Egotism ; এই Egotism, এই টগ্‌বগে প্রেমকে বাদ দেওয়াও যায় না, তবে তাকেই বিবাহের চূড়ান্ত সার্থকতা করেচ কি অমনি সহস্র জীবনের গতিটা, Idealটা পালটে গেছে ; তা হ'লেই নিক্তির ওজনে দাম্পত্যের দাবী-দাওয়ার বিভাগ করবার আবদার আসবে, কে বড় কে ছোট, "বর বড় কি কনে বড়" তার মাপকাটী খুঁজতে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হবে, স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গের নাম হবে দাসীত্ব, ছেলে-মানুষ করার নাম হবে নারীত্বের অপচয়, আর যার জোরে এত লম্ফঝম্ফ অর্থাৎ "যৌবন জলতরঙ্গ"—ততক্ষণে তা'তে ভাটা পড়ে আসবে।

আমাদের দেশে আমাদের সমাজে এই টগ্‌বগানিকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা নেই,—হয় ভালই, না-হয় কুছপরোয়া নেই। কারণ এই সংসার-কটাহে সুখদুঃখের তাড়নার মধ্যে দুইএ মিশে এক হবেই হবে, তবে একেবারে ভীমনাগের মণ্ডা যদি না-হয় ত কুছপরোয়া নেই। কারণ

এই মিশে যাওয়াটাই চূড়ান্ত ব্যাপার নয়; এই মিলনের যে ফল, সন্তান-সন্ততি, সেই সন্তানের পালন, তার শিক্ষা, তার গঠন, এক কথায় সমস্ত বংশগত উৎকর্ষের উত্তরাধিকারী করে' তাকে সমাজে ও দেশে ছেড়ে দেওয়া, তারই জন্যে জীবনের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করতে হবে, আপনার জীবনে যেটা সিদ্ধ হ'ল না, অথচ হওয়া উচিত ছিল, পরজন্মে অর্থাৎ ছেলে-মেয়ের জীবনে যাতে সেটার পূরণ হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে; এইখানেই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সার্থকতার প্রথম স্তর, আর এইখানে Egotism আর টগ্‌বগানির অবসান।

তারপর সমাজ ও জাতি; মা-বাপের ঋণ বলে' যদি কিছু থাকে তার চেয়ে বড় ঋণ সমাজের কাছে, দেশের কাছে। সে ঋণ, চক্রবৃদ্ধি হিসাবে, পুরুষানুক্রমে বেড়েই যায়, কমে না; যত পার তুমি পরিশোধ কর, তারপর পরজন্মে, অর্থাৎ তুমিই তোমার পুত্ররূপে পরিশোধ করবে। যুগে যুগে নব নব ঋণভার অর্থাৎ কর্ত্তব্যের ভার এসে পড়বে, তা' পালন করবার উপযোগী তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক সুবিমল চরিত্র, সুপ্রশস্ত বুকের ছাতি—এসব প্রস্তুত করে' দিয়ে তোমায় যেতে হবে; আপনাকে ছাড়িয়ে সংসার, সংসার ছাড়িয়ে সমাজ, সমাজ ছাড়িয়ে দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করে' দিতে হবে—সে প্রেমের উৎস হবে তুমি ও তোমার নারী—দুইএ মিলে অর্দ্ধনারীশ্বর; তবে ত বিবাহ বল, প্রেম বল সার্থক হবে, নয়ত 'দেবা' 'দেবী'র পিরীত ত কুক্কুর-কুক্কুরীর সম্মিলন মাত্র।

যারা ঠেকে শিখচে (আমরাও অনেক ঠেকে শিখেছিলুম এখন ভুলতে বসেচি) তাদেরই একজন বিদুষীর লেখনী-নিঃসৃত বাণী উদ্ধৃত করে' আমার পত্র শেষ করি; England এর বদলে India

এই পাঠান্তর গ্রহণ করলে অর্থের কোন উনিশ-বিশ হবে না—Let the young women of England learn as a new great faith that the sons and daughters they bear are not their children and the children of their husbands only, but the sons and daughters of England—the inheritors of all the fine tradition of our race. Let us spread the new romance of Love's responsibility to Life; let us honour ideals of self-dedication to our husbands, understanding their dependence upon us, to our homes, to our sons and our daughters, to our race, its great ones and their deeds; our moral obligations to all children even before they are born.

২৬শে আষাঢ় ১৩৩০

২৬

মহাত্মার ভুল

একজন ইংরাজ লেখিকা বলেচেন— Truth-telling does not pay in the long run. তবে আমি লাভের খাতিরে সত্যকথা বলচি না এই যা, নইলে বাস্তবিকই সত্যকথা বলে' লাভ নেই এ কথা সত্য! এই রকমই দুনিয়া, কি করা যাবে!

ঘটনা সত্য, আমার মৌতাতের মুখের কথা নয়, আজগুবী কল্পনা নয়, সত্য ঘটনা।

আমার দাওয়ায় বসে' আছি, একখানা কয়লা-বোঝাই গরুর গাড়ি আমার কুঁড়ের সুমুখের রাস্তা দিয়ে মন্থর গমনে চলে' যাচ্ছে— একজন গরুর ল্যাজ মলচে, আর-একজন কয়লার বস্তার উপর বসে' চীৎকার করে' বলচে—"লে—কোইলা"; দুইজনেই বেহারী হিন্দুস্থানী। আমার কুঁড়ের সম্মুখের বাড়ী থেকে কে জিজ্ঞাসা করলে—"কত করে' কয়লা?" গাড়ির উপরকার লোকটা বল্লে—"ন' আনা মণ।"

প্রশ্ন। কয়লা ওজন করে' দিবি?

উত্তর। তা হ'লে বার আনা—

প্রশ্ন। তবে ন' আনা মণ বল্‌চিস্?

উত্তর। তা' জানে না, লিবে ত লাও, হামি অত জানে না।

প্রশ্নকারী। আচ্ছা, বার আনাই দেব, ওজন করে' দিয়ে যা।

গাড়োয়ানটা কয়লার বস্তা পিঠে করে' খদ্দেরের বাড়ির ভেতর গেল; দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার দাওয়ার সন্নিকটে এসে আমায় প্রশ্ন কল্লে—বাবু আখ্‌বার পড়চ; কি খবর লিখেসে?

আমি একখানা ইংরাজি সংবাদপত্র পড়ছিলুম, বল্লুম—"খবর অনেক, বসে' শোন ত বলি, এক কথায় কি বলব?"

সে। মহাত্মাজীর কিছু খবর লিখেসে?

আমি। না—

সে। ইংরাজের আখ্‌বারে লিখবে না!

আমি। লেখে, তবে আজকের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ নেই।

সে। বাবু, মহাত্মাজী তো স্বরাজ লে লেগা!

ঠিক সেই সময়ে কয়লা ঢেলে দিয়ে গাড়োয়ানটা এসে যোগ দিয়ে বল্লে—"হাঁ বাবু, গান্ধীজী জরুর স্বরাজ লেগা।"

আমি। কি করে' লেগা?

দুইজনে। চর্‌খাসে, বাবু, চর্‌খাসে!

আমি। চরকায় ত সূতাকাটা হয়, স্বরাজ কি করে' হবে বল দেখি?

গাড়োয়ান। বো চরখাকা চক্র যো হ্যায়, সো সুদর্শন চক্র হো যায় গা; ঔর, উস্‌কী ডোরী ঔর সুই যো হ্যায়, সো ধনুর্ব্বাণ হো যায় গা!

আমি। তা' সে সুদর্শন কে ঘোরাবে? আর ধনুর্ব্বাণই বা ছুঁড়বে কে?

গা। গান্ধীজী আপ নে, ঔর কোন্?

আমি। আর তুমি ঠিক এই রকম আধ-মণ কয়লার বস্তাকে এক-মণ করে' বেচতে থাকবে ত?

গা। ক্যা করেগা, বাবুজী, গরীব আদমী, খায়গা ক্যায়সে?

"লে—কোইলা" বলে' গাড়ীর উপর গিয়ে লোকটা বসল, আর গাড়োয়ানটা গরুর ল্যাজ নির্ম্মমভাবে পীড়ন করায় গরু দুটা দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগল।

বলিহারী ভারতবর্ষের মাটিকে! এখানে গুরু আর চেলা, অবতার আর তল্পীদার ছাড়া আর কিছু জন্মাল না। যিনিই সাধারণ মানুষের চেয়ে একধাপ উপরে উঠলেন, তিনিই হলেন অবতার, আর মুমুক্ষু মানুষগুলো সব-কাজ তাঁরই উপর ন্যস্ত করে' নিশ্চিন্ত হ'ল। হায়রে অবতার, পরের বোঝা বহন করবার এমন মিনি-পয়সার মুটে আর কোন রাজ্যে জন্মায় না!

আহা! জগৎটা যদি সেই রকমই হ'ত! মাষ্টার পড়া মুখস্থ কল্লে যদি ভক্তিমান ছেলে পাশ হ'ত; ডাক্তার নিজের prescribed ঔষধ সেবন কল্লে যদি ভিজিট দিয়েচে বলে' রোগী আরাম হ'ত; জজ সাহেব বিচার শেষ করে' জেলে প্রবেশ করলে তাঁর জয়গান করায় যদি অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত হ'ত; আর-একজন আফিং খেলে দরিদ্র কমলাকান্তের যদি সুধু দোহাই দিয়েই হাইতোলা নিবারণ হ'ত, তা হ'লে কি মজাই হ'ত! কি সুখের রাজত্বই হ'ত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভগবান তার উল্টা ব্যবস্থাই করে' রেখেচেন; "যার বিষপাত্র আনি' দেয় তার মুখে"—এই নির্ম্মম নিয়মেই জগৎটা চলচে। যিনি যে ফলার মেখেচেন তাঁকেই সেটা তুলতে হবে, "বরাতি" কাজ মোটেই চলবে না।

আর পরকালেই যদি সব হিসাবের নিকাশ হ'ত, তা হ'লেও কোন গোল হ'ত না; তা হ'লে

সঙ্কীর্ণ এ ভবকূলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে
করিতাম অবহেলা পরলোকে!

কেননা, কেই বা পরলোকের খোঁজ রাখচে! কিন্তু ব্যাপার তা নয়, এইখানেই সব কাজের বোঝাপড়া হ'য়ে থাকে; ব্যক্তির বল, জাতির বল, বোঝাপড়া এই এক পুরুষে, না হয় দু' পুরুষে, না হয় তিন পুরুষে,—নয়ত পুরুষ-পরম্পরায় যুগ-যুগান্তর ধরে' তার প্রায়শ্চিত্ত চলতে থাকে। '৫৭ সালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত ত জগৎ শেঠ থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুঁটী সকলেই করে' গেছে, আর বাংলার লোক—জনসাধারণ, ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে বসেছিল বলে', আজও সেই Criminal indifferenceএর প্রায়শ্চিত্ত করচে—যে বিষের পাত্র অপরিণামদর্শী যুবা মুখে ধরেছিল, সেই বিষপাত্র আজও জনে-জনে পান করচে।

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি! কয়লাওয়ালার কথা থেকে একেবারে পলাশীতে গিয়ে পড়েচি।

গান্ধীজীর ভুল হয়েচে বল্লে হয়ত দেশসুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠবে, আমার তা'তে বিশেষ এসে যাবে না। আমি বলতে বাধ্য—গান্ধীজীর ভুলই হয়েচে, এবং খুব বড় রকমেরই ভুল হয়েচে। তিনি মানুষ চিনতে পারেন নি; "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—তাঁর হীরার ধার এই মেষপালের শিংএর স্পর্শে ভেঙ্গে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই এখন তা বুঝতে পাচ্চেন; তাঁর শিষ্যবর্গ সে কথা স্বীকার করায় গুরুর অমর্য্যাদা করা হবে ভাবলেও, আমি বলব তাঁর মত বিচক্ষণ পুরুষ নিশ্চয়ই নিজের ভুলটা বুঝতে পাচ্চেন; তিনি

যে ভেড়ার পালকে পক্ষীরাজ ঘোড়া মনে করেছিলেন—এইটে তাঁর প্রথম ভুল।

তাঁর দ্বিতীয় ভুল এই, ভারতবর্ষকে যিনি উদ্ধার করবেন, তাঁকে ভারতবাসীর হ'য়ে সব কাজ করে' দিতে হবে—একথা তাঁর স্মৃতিপথ থেকে চলে' গিয়েছিল! তাঁকে যে দেশসুদ্ধ লোক, বিশেষ করে' তাঁর যাদের উপর বেশী নির্ভর, অর্থাৎ শিক্ষিত বলতে যারা তা ছাড়া ভারতের আর সকলে, তারা যে তাঁকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে, তার কি কোন গূঢ় অভিপ্রায় নেই? এক জনকে দেবতা বানালে, তার উপর সবটা ছেড়ে দিলে, কাজ কত সহজ হ'য়ে আসে মহাত্মাজীর চেলারা কি বোঝেনি? চেলাগণ নির্ব্বিবাদে আপনাপন ধান্দা নিয়ে থাকবে—যে ব্যবসাদার সে খদ্দেরকে পেঁচিয়ে কাটতে থাকবে, যে জমিদার সে প্রজাকে জবাই করতে থাকবে, যে সুদখোর সে চক্রবৃদ্ধির চক্রে ফেলে অধমর্ণকে চরকির পাকে ঘোরাতে থাকবে, আর মহাত্মাজী শ্রীকৃষ্ণরূপে সুদর্শনচক্র ঘুরিয়ে অরাতি-নিধন করবেন, শ্রীরামচন্দ্ররূপে ধনুর্ব্বাণ হাতে যজ্ঞবিঘ্নকারীদের জব্দ করবেন, এবম্বিধ division of labourএ কাজের কেমন সুবিধা মহাত্মাজীর চেলারা কি বোঝেনি? কারও গায়ে আঁচটি লাগবে না, অথচ কার্য্য ফতে হ'য়ে যাবে—এ ব্যবস্থা যে কত সুবিধাজনক তারা কি তা' বোঝেনি?

মহাত্মাজীর অভিপ্রায় নিশ্চয়ই তা' নয়; কিন্তু স্পষ্ট করে' তাঁর অভিপ্রায় যে তা' নয়, তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে দিলেও, আমার বিশ্বাস চেলারা তা' বুঝবে না; তারা বলবে,—"প্রভু ছলনা করচেন, ভক্তদের পরীক্ষা করচেন, তিনিই করবেন সব, তবে হঠাৎ কি মহাপুরুষরা ধরা দিতে চান!" কিন্তু যেদিন বাধ্য হ'য়ে বুঝবে যে চরকার চাকা

সুদর্শন-চক্র হবে না, সেদিন মহাত্মাজীর প্রতি যে-ভক্তি সুদর্শন চক্রের সম্ভাবনাটা সৃজন করেচে সে-ভক্তির অবস্থা যে কি হবে, তা আমি ঠিক বলতে পারচি না। সেটা একটা নিদারুণ tragedyই হবে বলে' আমার মনে হয়।

ভারতবাসীর ভূতুড়ে ভাবটাকে যথেষ্ট রকম recognise না করাই মহাত্মাজীর একটা দারুণ ভুল হয়েচে; মানুষকে হঠাৎ দেবতা বানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাবটা যে মজ্জাগত ভারতীয় ভাব, সে বিষয়ে যথেষ্ট precaution না নেওয়াই হয়েচে ভুল। চেলাদের পক্ষে তাঁর ঋষিতুল্য মনুষ্য-চরিত্রে দেব-চরিত্রের আরোপ করে' তাঁকে খুব বড় করে' দেওয়া যত সহজে হয়েচে, তাঁর পক্ষে চরকার চাকা সুদর্শন-চক্রে পরিণত করা কিছুতেই তত সহজে হবে না। স্বধু বিহারী কয়লাওয়ালা যে এই ভুলটা আঁকড়ে ধরে' আছে তা নয়, অজ্ঞ জনসাধারণ—যারা বাস্তবিকই ভারতের ভরসাস্থল—তাদের অধিকাংশেরই এই ধারণা। এ ধারণা পত্রপাঠ দূর করতে হবে—তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে

When ye kneel to God in penitence
And cringe no more to men
Ye shall smite the stiff-necked infidel
And rule—but not till then !

এই বাণী যিনি বলবার মত করে' বলতে পারবেন, এবং ভারতবাসীকে শোনবার মত করে' শুনতে বাধ্য করতে পারবেন, তিনিই সিন্ধুবাদের ঘাড়ের ভূতটাকে নামাতে পারবেন, তিনি গান্ধীজীর চেয়েও বড়!

২রা শ্রাবণ, ১৩৩০

২৭

প্রসন্ন গোয়ালিনীর আধ্যাত্মিকতা

প্রসন্ন দুধে জল দেয়, আর খাঁটি দুধ বলে' বিক্রী করে; জিজ্ঞাসা করলে গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেয়; আবার বার মাসে তের পার্ব্বণ করে, ষষ্ঠী থেকে ওলাবিবি পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায় না; ব্রতব্রত করে, তার উপর দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেবাও করে, মুষ্টিভিক্ষাও দেয়। এখন প্রসন্নকে materialism-গ্রস্ত বলব, না spiritual বলব, এই হচ্চে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারলে, একটা বড় রকম প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে, সেটা হচ্চে এই—ইউরোপ বলতেই material, আর এসিয়া তথা ভারতবর্ষ বলতেই spiritual একথাটা সত্য কি না, বা কতখানি সত্য তার মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রসন্ন কি একটা type, প্রসন্ন কি Asiatic তথা ভারতবর্ষীয় চরিত্রের epitome, যে প্রসন্ন-চরিত্র আলোচনা করে' কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে, সমগ্র Asia বা ভারতবর্ষে খাটবে? প্রথমে ত সন্দেহ উঠতেই পারে যে প্রসন্ন মেয়েমানুষ, অতএব তার চরিত্র আধখানা Asia বা আধখানা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলতে পারে, আর-আধখানার সঙ্গে মিলবে না, একথা ত ধরেই নেওয়া চলে।

তোমরা প্রসন্নকে চেননা, তাই এই অর্ব্বাচীনের আপত্তি তুলচ।

আমি প্রসন্নকে জানি, চিনি—আমি বলছি, প্রসন্ন পুরুষও বটে নারীও বটে। সে যখন তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে, তখন সে কাবুলীওয়ালারও কান কেটে দেয়; মঙ্গলা যখন গোঁজ উপড়ে চোঁচা দৌড় দেয়, তখন তার দড়ি গাছটা ধরে' যখন সে তাকে stand still করে, তখন রামমূর্ত্তির মোটর-গাড়ী ধরা মনে পড়ে; সে পঞ্চাশটা খদ্দেরের দুধের হিসাব, যখন মুখে মুখে করে' দিয়ে balance sheet মিলিয়ে দেয়, তখন তাকে কৃষ্ণলাল দত্তের পাশে স্থান না দিয়ে থাকা যায় না; আর পাড়ায় শ্বাশুড়ী-বৌএর ঝগড়ার বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে, যখন সে পরস্পরের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ করে', দোষ-গুণের ওজন করে', কোন অদৃশ্য জুরীর সমক্ষে charge দিতে থাকে, তখন তাকে দায়রার জজের আসনে বসাতে ইচ্ছে করে; তারপর, অন্দর-মহলে যখন মেয়েদের মিছিল বসে, সুনীতি-দুর্নীতির বিচার হয়, মেয়ে-পুরুষের চরিত্রগত কত কূট তর্কের বিশ্লেষণ হয়, কতক কথায়, কতক ছড়ায়, কতক কবিতায়, কতক গানে, কতক ইঙ্গিতে-ইসারায়, বোসেদের ঘোষেদের কুণ্ডুদের পালেদের চাটুজ্যে-বাড়ুয্যেদের,—সমস্ত গ্রামটারই, পুরাবৃত্তের আলোচনা হয়, অতীত-বর্ত্তমান কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির গবেষণা হয়, তা'তে প্রসন্ন, গয়লা বৌ হ'লে কি হয়, সে democratic সভায়, তার কত জানা-অজানা তথ্যের সম্ভার নিয়ে যখন বসে, তখন সে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ মহলের বিচার-সভার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তেও সক্ষম, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে থাকে। তারপর সে যখন গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে গ্রামের শিব মন্দিরের উঠানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে, তার তিন কুলে কেউ নেই, তবুও সে যে কার জন্যে মাথা খোঁড়ে তা বুঝে উঠতে না

পারলেও, তার দেবতার প্রতি অগাধ ভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করতে পারা যায় না।

অতএব প্রসন্নকে, মেয়েমানুষ হ'লেও, type ধরে' নিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না, এটা আমি বলতে পারি। তবে আমি ইংরাজি-শিক্ষিত লোকগুলোকে একেবারে বাদ দিচ্চি; তার প্রথম কারণ, তারা ইংরাজি জানে, প্রসন্ন ইংরাজি জানে না, সুতরাং প্রসন্ন তাদের type বা প্রতীক হ'তে পারে না। দ্বিতীয় কথা, ইংরাজি শিক্ষিতগুলো, দুধে যেমন একটি ফোঁটা অম্ল বা গো-মূত্র পড়লে দুধ কেটে যায়, তারা তেমনি দু'পাতা ইংরাজি পড়ে' কেটে গেছে, জমে গেছে, বা ছিঁড়ে গেছে—যাই বল; সেগুলো না এদিক না ওদিক, বৈদিক হ'য়ে গেছে। তৃতীয় কথা, এই ইংরাজি শিক্ষিতগুলো যে সব কথা তলিয়ে বোঝবার আস্ফালন করে, সেই আস্ফালনই spiritualityর পরম অন্তরায়। অতএব ইংরাজির অম্লরস থেকে spiritualityর ক্ষীর সমুদ্রকে রক্ষা করতে হ'লে, ইংরাজি নবীশগুলোকে বাদই দেওয়া উচিত বিধায় তাদের আমি বাদ দিলুম! কেউ যেন মনে না করেন, আমি স্বয়ং ইংরাজিতে অষ্টরম্ভা বলে' এই কার্য্য করলুম। তা নয়, যেহেতু আমি যথেষ্ট কারণ না দেখিয়ে বাদ দিই নি।

আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্ত্তি যদি পুরোহিত ঠাকুরকে ধরা যায় তা হ'লে কারও আপত্তি হবে কি? আমি সেই প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে প্রসন্নর তুলনা করে' দেখিয়ে দেব যে, দুইই হুবহু মেলে। আধ্যাত্মিকতা বা spiritualityর প্রথম লক্ষণই হচ্চে—তলিয়ে বোঝবার স্পর্দ্ধা না রাখা; তাঁর তা' আছে—তিনি মন্ত্র বলেন তার মানে বোঝেন না, ভাষার অর্থ হয়ত কিছুকিছু বোঝেন, অর্থের

তাৎপর্য্য মোটেই বোঝেন না। যদি কেউ বোঝবার জন্য, তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য নয়, তাঁকে প্রশ্ন করে, তা'তে তিনি অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন,—এ সবই spiritualityর লক্ষণ, আর এসবগুলিই প্রসন্নতে বর্ত্তমান—প্রসন্ন দুধে জল দেয়, খদ্দেরকে ঠকাবার মতলবে যে দেয় তা যেন কেউ মনে না করেন, গয়লা বংশের কৌলিকপ্রথা তাই দেয়। সে বলে, যে দুধে জল দেয় না সে গয়লা নয়, অতএব তার জাতের মান রাখতে হ'লে তাকে জল দিতেই হবে। কিন্তু "কেন জল দিয়েছ" এই নিতান্ত অবান্তর প্রশ্ন যদি কেউ করে, তার মুখের 'আব্রি' থাকে না। 'কেন'র উত্তর কেউ দেবে না—পুরুতও না, প্রসন্নও না। পূজা, বারব্রত, দানধ্যান এ সব বিষয়েই তার মনের অবস্থা একই—বোঝে না কিন্তু করে' যায়, অতএব সে spiritual! সমধর্ম্মী বলেই প্রসন্নর সঙ্গে এবং প্রসন্ন যাঁদের type তাঁদের সঙ্গে, পুরুত ঠাকুরের বনে ভাল; পুরুত ঠাকুরও পদ্মলোচন – প্রসন্নও পদ্মলোচন, দু'জনে জীবনের পথে হোঁচট খেতে খেতে চলেন ভাল। পুরুত ঠাকুর এমন certificateও দেন যে, প্রসন্ন আছে বলে' ধর্ম্ম আছে; ধর্ম্মটা প্রসন্নরাই রেখেচে, না হ'লে, পুরুত ঠাকুরের ব্যবসাও মাটি হ'ত, আর সেই সঙ্গে সমাজ, দেশ ইত্যাদি সব ছড়িয়ে পড়ত; এখনও যে ছড়িয়ে পড়ে নি সেটা Priest cum Prasanna এই entente cordiale বর্ত্তমান আছে বলে'।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রাণ যে চাষী, তার চরিত্র দেখে বিচার করলে, প্রসন্ন ঠিক তারই মত spiritual প্রমাণ হ'য়ে যাবে। প্রথম সে সাহেব দেখলে পালায়; লোকে বলে ভয়ে, আমি

জানি ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তার spirituality নষ্ট হ'য়ে যাবে এইজন্য। প্রসন্নও, যে পথ দিয়ে সাহেব চলে' যায়, তিন দিন সে সে-পথে চলে না; লোকে বলে ভয়ে, আমি জানি তার ভয়ের বয়স গেছে, তথাপি পাছে ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তার গয়লা-বংশ অপবিত্র হ'য়ে যায় এই আশঙ্কায়। চাষা ভায়া ধানচাল বেচেন pile করে',—ডাল বেচেন ধুলা ও মাটি মিশিয়ে ভারি করে',—পাট বেচেন জলে ভিজিয়ে; প্রসন্ন দুধ বেচে জল মিশিয়ে, অতএব দুই তুল্য মূল্য। এবং উভয়েই যথাক্রমে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গৃহের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, এবং লক্ষ্মীপূজা করে', ষষ্ঠীপূজা করে', পুরুত ঠাকুরকে দক্ষিণা দিয়ে আত্মাকে disinfect করেন; অতএব প্রসন্ন আধ্যাত্মিকই প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসাদার—মাড়োয়ারী থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুঁটি জেলে-মালো পর্য্যন্ত—সবাই "ধর্ম্ম" করেন, পূজা করেন, পাঠ করেন, রামায়ণ শুনেন, কীর্ত্তন করেন, গোমাতার জন্য পিজরাপোল করে' দেন, খট্‌মল্ পিলান,—আর ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি মিশিয়ে মানুষ ভাইকে খেতে দেন, দরকার মত গণেশ উল্টান, ব্যবসা চলতি হ'য়ে গেলেই মালে খাট করেন, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, পরের টাকাকে খোলামকুচি জ্ঞান করে' তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। কামার, কুমার, শেকরা, ময়রা ভাই সকল বিশ্বকর্ম্মার পূজা করেন, হাতুড়ি ছেনি নিক্তি ইত্যাদিকে গড় করেন, আর চোখের আড়াল হ'লেই কাজে ফাঁকি মারেন, ওজনে কম দেন, ভেল্‌সা-ভ্যাজাল চালাতে পাল্লে আর বিশ্বকর্ম্মাকে মনে থাকে না। প্রসন্ন এ সবই যথারীতি করে' থাকে—কে জানে ডোবার জল, আর কে জানে পাতকোর জল, দুধের সঙ্গে

মিশিয়ে কচি ছেলের বিষ তৈরী করে' বেচেন, নূতন খদ্দেরকে দু'দিন একটু রং রেখে দুধ দিয়েই নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন, দুধও নিজমূর্ত্তি ধরে, মাপে মারেন, পারলে হিসেবেও মারেন। আর এইসব ব্যবসাদারীর হজ্‌মিগুলি হিসাবে পূজাপাঠ, বারব্রত এ সবই চলতে থাকে। অতএব প্রমাণ হ'য়ে গেল, প্রসন্ন typeও বটে, spiritual typeও বটে।

তারপর প্রসন্ন যাদের, constructive নয়, literal type, অর্থাৎ আমাদের দেশের নারীকুল, তাঁদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে পুরুত ঠাকুর যে certificate দিয়েছেন তার উপর ত আর কথা নেই—তাঁরা আছেন বলে' ধর্ম্ম আছে, আর তার আনুষঙ্গিক যা-কিছু আছে। তাঁরা হাঁচি টিকটিকি মানেন, বিষ্যুৎবারের বারবেলা মানেন, অশ্লেষা-মঘা মানেন তাই এত বড় জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা বেচে আছে, ষষ্ঠী-মাকাল মানেন, তাই তেত্রিশ কোটী দেবতার খোরাক জুটচে, উপরন্তু "এঁটো" আর "য়্যাড়া" নামে তেত্রিশ কোটীর ওপর দুই জাগ্রত দেবতার প্রাদুর্ভাব হয়েচে। তাঁরা এখনও পুরাণ-পাঠ ছলে কথকতার ভাঁড়ামি শোনেন বলে' পুরাণাদি শাস্ত্র জীবিত আছে, তাঁরা তীর্থ করেন বলে' এখনও মোহান্ত ও পাণ্ডাদের পেট মোটা হচ্চে আর "নবীন-এলোকেশী"র পালার শেষ অভিনয় রজনী এখনও আসে নি; উপরন্তু ঝাড়ফুঁক, মাদুলি, রক্ষাকবচ ইত্যাদি বেদের ছাঁট, অথর্ব্ব বেদের debris এখনও লোকে ভুলতে পারে নি, মোটের উপর সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের কাঠামটা তাঁদের ঠেসেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘুণ ধরলেও ভূমিসাৎ হয় নি। বিচার করবার একটু অক্ষমতা, অতিরঞ্জনের প্রতি একটু ঝোঁক, সত্যের প্রতি একটু কম টান, দুটো পরচর্চ্চায় কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি, স্বজাতীয়ার প্রতি

একটু ঈর্ষা অসূয়া—এ সব সামান্য কথার জন্য আধ্যাত্মিকতার ব্যত্যয় হ'তে পারে কি? কেউ বলতে পারেন, প্রসন্ন কি একাই এই সব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত? আমি বলি না তা নয়, প্রায় সব দেশের নারীকুলই এই রকম। কিন্তু প্রসন্নর বিশেষত্ব এই যে, সে আধ্যাত্মিক, অন্য দেশের নারীর সে বড়াই নেই—এইটুকু তফাৎ।

এ পর্য্যন্ত ন্যায়শাস্ত্রের method of agreement দিয়ে প্রমাণ করলুম যে প্রসন্ন spiritual-তন্ত্রের। এখন একবার method of difference দিয়ে differential diagnosis করে' দেখা যাক, তা'তেও যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারা যায়, তা হ'লেই প্রমাণটা অকাট্য হ'য়ে গেল।

প্রথম কথা ইউরোপীয়গণ খাদ্যের কোন বিচার করে না,—তারা গরু খায়, যদিও সেই সঙ্গে গরুর এমন ব্যবস্থা করে যে গরু দুধের সাগর হ'য়ে যায়, দিনে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। এ materialism আমাদের দেশে নেই,—আমরা গরু খাই না। (ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাকি বলেছেন আমরা গরু খেতুম, তিনি ইংরেজোনবীশ, তাঁর কথা আমি কানেই তুলতে প্রস্তুত নই), আমাদের গো-মাতাগণ আমাদের যত্নের চোটে "ছটাকে" হ'য়ে এসেচেন। কিন্তু তা'তে কি এসে যায়, আমরা গো-পার্ব্বণে তাঁদের গায়ে যথারীতি গেরীমাটির ছাপ দি; ইউরোপীয়গণ তা করে না। এই ত গেল গো-চর্চ্চার কথা, এখানে মৌলিক পার্থক্য—খাওয়া ও খাওয়ান দুই দিকেই। গরুর পরেই ব্রাহ্মণের কথা, এখানেও সেই মৌলিক পার্থক্য। ইউরোপে যাজকতা কর্ত্তে গেলে পণ্ডিত হ'তে হয়, সাধন কর্ত্তে হয়, শিখতে হয়। এখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নীচেই পুরুত ঠাকুরের স্থান; "বিদ্যাস্থানে

ভয়ে বচ" হ'লেই, পুরুত ঠাকুর আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। গো-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ত এই বিভিন্ন ব্যবহার বিভিন্ন মনেরই লক্ষণ।

তারপর আহার, আমরা সাত্ত্বিক আহার করে' থাকি; ইউরোপীয়গণ যা পায় তাই খায়, কে জানে সাত্ত্বিক, কে জানে অ-সাত্ত্বিক; আমরা খাই উদ্ভিদ, তারা খায় প্রাণী, এইজন্য আমরা অচল আর তারা সচল প্রাণবন্ত কি না তা আমি বলতে পারচি না; তবে পশু-পক্ষীর analogy থেকে এটা দেখতে পাই যে, নিছক সাত্ত্বিক আহার খেয়ে, হাতী থেকে আরম্ভ করে' রামছাগল পর্য্যন্ত, পরের বোঝা বয়, আর প্রাণীবধ করে' তার রক্ত পান করে' খেঁকশিয়ালটা পর্য্যন্ত কারও হুকুমবরদার নয়; আমরা হয়ত হাতীতে চড়ে' ইন্দ্রের সভায় গিয়ে উপস্থিত হব, আর ইউরোপীয়েরা পশুরাজের সঙ্গে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে যাবে, তা হ'তে পারে; তা হ'লে আমরা spiritual আর তারা material এইটেই ত প্রমাণ হ'চ্চে!

তারপর আমরা যার-তার হাতে খাই না, অন্ততঃ ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসখানাও কাঁধে পড়ে থাকা চাই, তবে তার হাতে খাব; আর ইউরোপীয়েরা যার-তার হাতে খাবে, সে "কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। তাদের এমনি materialistic বুদ্ধি যে তারা মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখতে পায় না; মানুষ কি পশু না পাখী যে সব সমান হবে? অষ্ট্রেলিয়ার steppesএ নাহয় সব ঘোড়া সমান, কিন্তু আড়গড়ার ভেতর পুরলে, ঘোড়ার শ্রেণীবিভাগ হ'য়ে কোনটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যায়, আর কোনটা scavenger গাড়িতে জোড়া হয়; মানুষেরও কি তাই নয়? কিন্তু সে সূক্ষ্মদর্শন ওদের নেই, আমাদের আছে,—আমরা তার ব্যবস্থা করেছি, শ্রেণীবিভাগ করেছি, কারও

হাতে খাই কারও হাতে খাই না। তবে মনের খাদ্য আহরণের বেলা তারা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো হাত থেকে বা মুখ থেকে গ্রহণ করে না; বিশিষ্ট জ্ঞান ও সাধনার পরিচয় যে না দিয়েছে, তার কাছ থেকে তারা জ্ঞানের কথা শুনবে না; আর আমরা লম্পটের মুখেও বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনব, ভূতের মুখেও রামনাম শুনে ধন্য হব। এটা আমাদের আধ্যাত্মিকতারই পরিচয়; কারণ আমরা চাই জ্ঞান, মানুষটা ত উপলক্ষ মাত্র, আমরা হংসের মত নীর পরিত্যাগ করে' ক্ষীর গ্রহণ করতে সক্ষম!

তাদের ধর্ম্মপুস্তক, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মমন্দির থাকলে কি হয়, তারা পরলোক মানলে কি হয়, তাদের চরম বিচারকের বিচারে আস্থা থাকলে কি হয়, যেহেতু তারা ইহলোকটাকে উড়িয়ে দেয় নি, আর পরলোকটাকেই সর্ব্বস্ব করে' তোলে নি, তাদের আধ্যাত্মিকতা ভাক্ত, আর আমাদেরটাই খাঁটি, তার কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

ঠিক এই পর্য্যন্ত লিখিচি আর নসীরাম বাবু এসে উপস্থিত—

নসীবাবু। কি ঠাকুর আবার মাথা গরম করচ যে!

আমি। লোকে কথা কয়েই ত মাথা গরম করে, আর মাথা ঠাণ্ডা করে' লেখে।

নসীবাবু। তোমার যে সব সৃষ্টিছাড়া। তা যাই হ'ক, কি লেখা হ'ল?

আমি। আজ্ঞে, আপনারাই যে ভগবানের chosen seed তাই প্রমাণ করে' দিলুম, আপনারাই the salt of the earth, আপনারাই leaven, that will leaven the whole, তারই চূড়ান্ত

মীমাংসা করে' দিলুম ; পশ্চিম বলতে মোটা, আর পূর্ব্ব বলতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম—এইটে আধ্যাত্মিক ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

নসীবাবু। সব দেশেরই আপনাপন আধ্যাত্মিকতার ধারা আছে ; আপনাপন সুখশান্তির অনুকূল পন্থা সব দেশেরই মনীষীরা আবিষ্কার করেছেন, আপনাপন দেশের পূর্ব্বাপর পরিকল্পনা করে' তাকে গড়ে' প্রয়োগ করেছেন।

আমি। তা ত করেচেন, কিন্তু আপনারাই যে স্বর্গের সিঁড়ি আবিষ্কার করেচেন এই আস্ফালনটা বড় বেশী রকমের শুনচি, তাই ব্যাপারটা একটু চিবে' দেখলুম।

নসীবাবু। কি মোটের মাথায় দেখলে ?

আমি। আজ্ঞে, দেখলুম, আপনাদের দাবীটা একেবারে ভূয়ো।

নসীবাবু। নিরেট করতে হ'লে কি একটু আফিম চালালে হয় মনে কর ?

আমি। মন্দ হয় না, কেননা সবটার ভিতর আফিমের মৌজ রয়েছে, আর ঐ সত্য বস্তুটাই নেই ; আফিমের ভিত্তির উপর অবস্থিত হ'লে অন্ততঃ কার্য্য-কারণ বোঝা যেত ; কারণ আফিম না খেয়ে এত খেয়াল দেখাটা ব্যাধি বলেই সন্দেহ হয়।

৫ই ভাদ্র, ১৩৩০

২৮

স্কুল-মাষ্টার না মোশন-মাষ্টার

স্কুল-মাষ্টার আর মোশন-মাষ্টার একই পদার্থ ; একজন রঙ্গমঞ্চে হস্তপদ সঞ্চালন কর্ত্তে, গর্জ্জন কর্ত্তে শেখান, আর-একজন জীবন-রঙ্গমঞ্চে নানা ভঙ্গীতে নর্ত্তন কুর্দ্দন করতে শিখিয়ে দেন। জীবনটা যে অভিনয় মাত্র, আর অভিনয় ত অভিনয় বটেই, এইটা মাষ্টার-যুগলে যথাক্রমে ছাত্র-গণকে শিখিয়ে থাকেন ; তা'তে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের কোন উন্নতি হ'ক আর নাই হ'ক, "সঙ্-সার" অভিনয়টা

বাতুলের গল্প এ জীবন
অর্থহীন মাত্র-বহু-বাক্য-আড়ম্বর,

এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করে।

একজন বিশিষ্ট ইংরাজ নট সম্বন্ধে স্তুতিগান করে' বলা হয়েচে—

We loved Hawtrey (Sir Charles Hawtrey) so much because he was "such a lovely liar". He lied with such perfect plausibility and success that —altho' one knew it quite well—one forgot that the whole of the lines had been written for him. He always appeared to be rolling his tarradiddles out from his inner consciousness. Which, of course, was where the art of the man came in.

রসজ্ঞ দর্শক বলচেন—Hawtreyর অভিনয় দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয় যে অভিনয় দেখচি ; বাক্য-স্রোতটা তার যেন অন্তরতম সত্তার ভিতর থেকে উথলে উঠচে ; কিন্তু বস্তুতঃ সে আর-একজনের রচিত ছত্রগুলিই আবৃত্তি করচে মাত্র ; এ থেকে বলতেই হয়—Hawtrey একজন "lovely liar".

আমাদের স্কুলে (আমি কলেজ বা Post-graduateও তার মধ্যে ধরে নিয়েচি) স্কুল-মাষ্টার এই "lovely-liars" সৃজন করে' সংসার-রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিচ্ছেন। অভিনেতৃগণের অভিনয় যতই স্বাভাবিক মনে হ'ক না, তাঁদের বক্তৃতা-স্রোত যতই বেগে তাঁদের অন্তরতম সত্তার মধ্য থেকে উৎসারিত হ'ক না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলবার দরকার নেই যে "the whole of the lines had been written for him".

এই অভিনয়ের rehearsal প্রতিদিন স্কুল-কলেজে হ'য়ে থাকে। স্কুল-কলেজগুলো সে অর্থে—আখড়া ঘর, আর স্কুল-মাষ্টার সুধু—মোশন-মাষ্টার। মেস, ক্লাব ইত্যাদিতে যে "সাঁঝে সকালে" তর্ক-বিতর্ক—সানইয়াৎ সান থেকে C. R. Das পর্য্যন্তকে নিয়ে যে তর্ক-কচ্‌কচি,—ত[illegible] olitics, স্বদেশী, Non-co-operation, এ স[illegible] হয়—সে কেবল part মুখস্থকরা মাত্র। যে[illegible]ক্তৃতা ইত্যাদি জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়েরই সহায়তা করে' থাকে।

আমি সেদিন এক M. A. ছাত্রের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, তিনি Economics নিয়েচেন ; তাঁকে প্রশ্ন কল্লুম—বাপু এই যে Fiscal Commission [illegible] [illegible]রা কি মীমাংসা কল্লে কিছু জান? বাছা

আমার অনেক মাথা চুলকে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে,আমাদের Professor এখনও Note দেন নি। অর্থাৎ মোশন-মাষ্টার এখনও মোশন দেন নি, অতএব বাছা এখনও অচল।

আর-একটি ছেলে Anthropology নিয়েচেন M.A তে ; এক-জন অধ্যাপকের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা কচ্ছিলেন ; আমি ঝিমুচ্ছিলুন, তথাপি এই কথাগুলো কানে গেল—

অধ্যাপক। এত-দেশ থাকতে Anthropology নিলে কেন হে ?

ছাত্র। কি জানেন, বিষয়টা নতুন, পাস কর্ত্তে পারলে একটা professorই লাগতে পারে।

সুতরাং তাঁর Anthropology [illegible] স্থ ভিন্ন আর কি ? এই নতুন বলে', দিনকতক Commer[illegible]ce করে' ছেলেরা ক্ষেপল ; উদ্দেশ্য ব্যবসা করা নয়, কা[illegible]বসা শিক্ষা হয় না, প্রফেসারি জুটতে পারে এই আশা। ত[illegible] মঞ্চে ভীম সাজা, ভীম হব বলে' নয়, ভীমের জন্য লিখিত ব[illegible] করে' বাহবা ন'ব বলে'; তেমনি Commerce পড়ব ব্যবসা [illegible] Commerce সম্বন্ধে বুলি কেটে, অর্থাৎ lecture দিয়ে, প[illegible] করব বলে'।

একজন যাত্রায় হনুমান সেজেছিল ; পা[illegible] সত্যি হনুমান মনে করে' ফেলে, সে জন্য হুপ্ হাপ্ করতে [illegible]ল' উঠল—"মহাশয়রা গো, আমি সেজেচি, আমি স[illegible] মান নই ; অধিকারী মহাশয় আর লোক পান নি তাই [illegible]য়েচেন।" লোকটার বোধহয় একটু মাথাখারাপ ছিল ; না[illegible] মধ্যস্থলে তার স্বরূপ জাহির করবার প্রবৃত্তি আসবে কে[illegible]দের এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় হয়, রামেরই হ'ক [illegible] হ'ক,

তাকে চিনে নিতে কারও বেশী দেরী হয় না ; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন মাথা-খারাপ কেউ নেই যে অভিনয় পণ্ড করে' নিজমূর্ত্তি জাহির করেন — সেটা অভিনয় শেষে সাজঘরের জন্যই তোলা থাকে।

এই সাজঘরটা কোথা ? যেখানে অভিনেতা নিজমূর্ত্তিতে সপ্রকাশ হ'ন, যেখানে সত্যিকারের জাঁতের কালি ফুটে ওঠে, যেখানে শেখাবুলি বা মুখস্থ partএর আবৃত্তি মোটেই চলে না—সে সাজঘর কোথা ? আর কোথা !—যেখানে চোগা-চাপকান, হ্যাট-কোট, তিলক-টিকি, গান্ধী-টুপী পর্য্যন্ত খুলে ফেলে "ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তয়া" সতত ব্যস্ত থাকতে হয়, যেখানে কথায় চিঁড়ে ভেজে না, চিঁড়ে জোটেও না,—যেখানে যার ভিতর যতটুকু শক্তি আছে, যতটুকু বুদ্ধি আছে, যতটুকু হৃদয় আছে, তারই মাপে সুখদুঃখ মিলে,—যেখানে ভিতরকার মানুষটা উলঙ্গ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য হয়,—সেই গৃহস্থলীই হ'ল সাজঘর, সেখানে সাজ খুলে কথা কইতে হয়, সেখানে আর মেকি চলে না ! স্ত্রী, পুত্র, জননী, দুহিতার কাছেও যে অভিনয় কর্ত্তে পারে সে জবর অভিনেতা বটে ; কিন্তু তেমন অভিনেতা স্বর্গে-মর্ত্ত্যে নাই।

সেই সাজঘরের বাহিরে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যা কর তা শোভা পাবে, রাজাই সাজ আর ঋষিই সাজ মানিয়ে যাবে, লোকে মেনেও নেবে ; কেননা "কানা, মনে মনে জানা", সকলেই তো সেজেচে, তুমিও সেজেচ ; অভিনয়ের বাহাদুরী পাবে ; যদি নিন্দাই জোটে, সেও অভিনয়ের গলদের জন্য। তাই কাউন্সিলে radical সেজে যে ঘরে এসে ultra-conservative হও,—সমাজ-সংস্কার নিয়ে বক্তৃতা করবার সময়, "ঝাড়ে বংশে" (root and branch) উৎপাটনের উপদেশ দিয়ে, দুধের মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে যে অস্থিরতা

প্রদর্শন কর,—কাগজে-কলমে বাল-বিধবার দুঃখে নয়নের জলে বুক ভাসিয়ে, বিধবা ভগ্নীর বা কন্যার দুঃখ যে চোকে ঠেকে না,—কথায় কথায় সাম্য মৈত্রীর ধুয়া তুলে', সামাজিক ব্যবহারে যে ব্রাহ্মণ বলে' ফুলে ওঠ, বা শূদ্র বলে' নাক সিটকাও—এ সব কেবল স্কুল-মাষ্টারের কাছে part মুখস্থ করেছ বলে'। কাউন্সিল বল, বক্তৃতামঞ্চ বল, সংবাদ পত্র বল, কোথাও তোমার ভিতরকার মানুষটা জোর করে' আত্মপ্রকাশ করে না, তুমি স্থধু সর্ব্বত্র অভিনয়ই করে' যাও। সকলে তা বুঝতে পারে, তবু অভিনয়ের বাহাদুরী যদি কিছু থাকে তারই বাহবা তোমার প্রাপ্য, তাই তুমি পেয়েও থাক।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই—যাদের দেশের বিদ্যা নিয়ে তুমি নাড়াচাড়া কর, তাদের দেশের ছেলেরা ত সেই বিদ্যা নিয়েই সসাগরা পৃথিবীটাকে মুঠোর ভেতর করবার মত শক্তি লাভ করে; তুমিও সেই বিদ্যা জীবনপণ করে' অর্জ্জন কর, কিন্তু কোন্ দেবযানীর অভিসম্পাতে সে বিদ্যার প্রয়োগ কর্ত্তে পার না? তারাও Science পড়ে, Economics পড়ে, Anthropology পড়ে, তাদের সে বিদ্যা অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে' তাদের শক্তিশালী করে' তোলে, আর তোমাকে স্থধু নটের নিপুণতা ছাড়া আর কিছু দেয় না কেন?

একজন পণ্ডিত এই রকম প্রশ্নের উত্তরে বলেচেন—The divorce of our actual life from the life of our ideas has made us a race of neurasthenics, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত জীবনগতি আমাদের ভাব-সম্পদের সঙ্গে খাপ খাচ্চে না বলে' আমরা বায়ুরোগ-গ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি। আমরা ভাবটা নিচ্চি পাশ্চাত্য পুঁথি থেকে, আর আমাদের জীবনটা গড়ে উঠেচে আমাদের অতীতের সংস্কার সমষ্টি নিয়ে,

—এই দুটাতে মিলচে না বলে' আমাদের শরীরে বায়ুর প্রা
বেশী হ'য়ে উঠেচে। সকলেই জানেন নট-নটী মাত্রেই একটু
neurasthenic—একটু বায়ুগ্রস্ত। উক্ত পণ্ডিতের মতে lema
মধ্যে a real sense of independence in both thought and action আনতে হবে, তা হ'লেই বায়ুর সমতা হ'য়ে আমাদের actual lifeএর সঙ্গে আমাদের ideas মিলে যাবে।

পণ্ডিতজী রোগটা ধরেচেন ঠিক, আর দাওয়াইও ঠিক বাত্‌লেচেন; কিন্তু সম্পূর্ণ দাওয়াইটা বাত্‌লান নি। নূতন idea এসে আমাদের বহু-বার আক্রমণ করেচে, সিকন্দর থেকে আরম্ভ করে' বুদ্ধ চৈতন্য পর্য্যন্ত অনেকবার নূতন idea আমাদের ঘা দিয়েচে—কিন্তু সে সব ideaকে আমরা আপনার করে' নিয়েচি—আমাদের জীবনের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়েচি—কিন্তু এখন আর পাচ্চি না কেন? তার উত্তর, জীবন ছিল তাই আয়ত্ত করেছি—বিষ খেয়েও নীলকণ্ঠ হ'য়ে বেঁচেছিলুম—বেদ ছেড়ে বৌদ্ধ হ'য়েও সসাগরা পৃথিবী জয় করেছি—এখন জীবন নেই, তাই বাহিরের জিনিষ আর ভেতরে যায় না, রক্তের সঙ্গে মেশে না—এ যেন মড়ার গায়ে injection করা—যেখানকার injection সেইখানেই থাকে।

এখন বাঁচার উপায় কি? বাঁচার উপায় independence in both thought and action; কিন্তু সে independence আসে কোথা থেকে? চিন্তার স্বাধীনতা কতক সম্ভব, কিন্তু কার্য্যের স্বাধীনতার ক্ষেত্র কোথায়? সত্যিকারের কার্য্যের ক্ষেত্র নেই, তাই অভিনয় করে' দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হচ্চে।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৩০

২৯

ভদ্রলোক

ভদ্রলোক, ভদ্দরলোক, bhadralog, gentleman—এ সব কি একই পদার্থের ভিন্ন নাম ? আমার যেন খটকা লাগে !

শেষের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক বিচার কত্তে।

Gentleman বোধ হয় সেই শ্রেণীর লোককেই বলে, যারা গতর খাটিয়ে খায় না, একটু জমী-জমা আছে বা ব্যাঙ্কে টাকা আছে, বা মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে বা বিদ্যা আছে—তাই থেকে চলে ; অর্থাৎ দোকানদারী করে' বা মাটি খুঁড়ে শস্য উৎপন্ন করে' যাদের পেট ভরাতে হয়, তারা এই gentleman পর্য্যায়ের একটু নীচে। তবে দোকানটা কিছু বড় রকমের হ'লে, এবং চাষের জমী একটু বিস্তৃত হ'লে, যখন সেটা যথাক্রমে হৌস্ বা জমীদারীর বিশালতা প্রাপ্ত হয়, তখন হৌসওয়ালা বা জমীদারকে gentleman পর্য্যায়ে স্থান দিতেই হয়, বা তার উপরেও দেওয়া চলে। কিন্তু সে বিশালতার পরিমাণ কি, তার কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাটি না থাকায়, মাঝে মাঝে একটু গোল হয়।

When Adam delved and Eve span
Who was then a gentleman ?

এই বহু পুরাতন প্রবচনের মধ্যে gentlemanত্বের সূক্ষ্মতত্ব বর্ত্তমান রয়েছে। মাটি খুঁড়ে যখন পুরুষমাত্রেই শস্য উৎপন্ন করত আর স্ত্রীমাত্রেই চরকায় সূতা কাটত, তখন সমাজে gentlemanএর কোটায় কেউ ছিল না; তখন gentlemanএর সৃষ্টিই হয় নি। Gentlemanটা একেবারেই খুব হালি জিনিষ। কেউ কেউ বলেন ওটা খুব বাজে জিনিষ—সভ্য-সমাজ-যন্ত্রের একটা অনাবশ্যক bye-product মাত্র।

কেউ কেউ বলেন gentlemanএর জাত নেই; অর্থাৎ সমাজের যে-কোন শ্রেণীর ভিতরে gentleman পাওয়া যেতে পারে। এ কথা আর যে-কোন দেশে সত্য হ'ক, আমাদের দেশে হ'তে পারে না। যাদের বামুন-শূদ্র জ্ঞান আছে, অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ বোধ আছে, তারা একথা কোনক্রমেই মানতে পারে না। যারা ছাতু খায়, বা পকাল ভাত, বা পরিষ্টি ভাত খায়, মালকোছা মেরে কাপড় পরে, বা পাঁচি ধুতি পরে', সুধু পায়ে, সুধু গায়ে থাকে, তারা কি gentleman হ'তে পারে?

আমি কলকাতায় এক মেসে দিনকতক বাস করে' এসেছি—মেসের পাশে একটা মস্ত তেতলা বাড়ীতে এক মস্ত ধনী পরিবার বাস করতেন, তেতলা ঘরের জানলায় অনেক সময় মা-লক্ষ্মীরা একটু বে-আবরু ভাবে দাঁড়াতেন বসতেন,—২০।২৫টা ওবয়া যুবাকে ভ্রূক্ষেপ না করে'। একদিন শুনা গেল এক বৃদ্ধা ঝি, বাতায়নে দণ্ডায়মানা এক যুবতীকে বলচে,—সরে এস, মেসের ছেলেগুলোর সুমুখ থেকে—

যুবতী। ওদেরকে আবার লজ্জা কিসের? ওরা যে বাসাড়ে,—ওরা ঝি না এলে বাসন মাজে, ঠাকুর না এলে রাঁধে। ওদের দেখে বুঝি আবার লজ্জা করতে হবে?

মা-লক্ষ্মী বোধ হয় gentlemanকে লজ্জা করতে প্রস্তুত, কিন্তু যারা ঝি-চাকরের মত বাসন মাজে বা রাঁধে তারা কি gentleman হ'তে পারে? ঠিক বলেচেন মা আমার!

কিন্তু কথা হচ্চে এই যে—লাঙ্গল ঠেললে, আর চরকা কাটলেই, এবং উপরোক্ত মাতাঠাকুরাণীর হিসাব-মত বাসন মাজলে বা রাঁধলেই যদি gentleman সম্প্রদায়ের নীচে যেতে হয়, তা হ'লে সে সব কাজ না করে' যদি দিনগুজরাণ হয়, তা হ'লেই কি gentleman হওয়া চলে?

এই ধরুন,—চোর-ডাকাতের কথা বাদ দিয়ে—আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার জমী নেই, জমা নেই, ব্যাঙ্কে টাকা নেই, মাথায় যে খুব বুদ্ধির প্রাচুর্য্য আছে তা'ও নয়, আমি আকাশের পাখী, বনের পশু ও জলের মাছের মত do not sow, nor do I reap—আমি মাটি কাটি না, চরকা ত কাটিই না (গান্ধীজীর হুকুমেও নয়, কিম্বা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়েও নয়), চুরি-চামারীও করি না—অথচ আমার পেট চলে, নির্ভাবনায় দিন কেটে যায়, আমি gentleman কি না? ইংরাজিতে mendicant বলে' একটা কথা আছে, আমাকে হয়ত সেই শ্রেণীরই ভেতর ফেলা হবে; তা হ'লেই বিচারটা একটু জটিল হ'য়ে আসচে—

আমি কিন্তু প্রমাণ করে' দেব যে, ঐ mendicant আর gentleman এই দুইই এক শ্রেণীর জীব। উভয়েই চাষ করে না, মুদিখানার দোকান করে না, চুরি করে না, অথচ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খায়। উভয়েই নির্ভাবনা, কিন্তু উভয়েই ভিক্ষুক। জমীদার ভিক্ষা করে খাজনা, আর ভিক্ষুক ভিক্ষা করে অনুগ্রহ; একজন জোর করে' চাইতে পারে, আর-একজন আস্তে চায়, ভয়ে ভয়ে চায়—এই তফাৎ।

কিন্তু পাওয়াটা সম্পূর্ণরূপে দাতার অনুগ্রহের উপর নিভর। প্রজা যদি না দেয়—Civil disobedience করে' বসে—আর দাতা যদি মুঠো না খোলে, তা হ'লে 'gentleman'ও পায় না, mendicant'ও পায় না। অতএব দুইই এক। তবে লোকে gentlemanকে অর্থাৎ জমীদারকে, ধনীকে একটা জাঁকাল নাম দিয়েচে এবং খাতিরও করে—সেটা একটা কালক্রমাগত কু-অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"খদ্দর পরে' ভদ্দর" হবার যে একটা ধুয়া উঠেছে, সেটার ভিতর একটা তত্ত্ব আছে। ব্যবহারিক জীবনে বাহিরটা দেখে খানিকটা ভিতরটার অবস্থা আন্দাজ করে' নিতে হয়। তা'তে অনেক সময় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে; আর এই সম্ভাবনার advantage লোকে নিতে চায়; টিকি রেখে শামুকের খোলকে নস্যির ডিপে করে' পণ্ডিত, লপেটা পরে' বাবু, আর খদ্দর পরে' ভদ্দর—এ সবই একই শ্রেণীর প্রক্রিয়া। "ভদ্রলোক" বলতে এই "কাপুড়ে" ভদ্রলোকই বুঝতে হবে অধিকাংশ স্থলে।

বাঙ্গালা অভিধান খুলে দেখলুম যে, ভদ্র মানে "সুবর্ণ" আর ভদ্র মানে "ষাড়"। এই দুই অর্থের সঙ্গে আমাদের অধুনা প্রচলিত ভদ্রের কি সম্বন্ধ, বিচার করা দরকার হয়েচে।

ভদ্র মানে সোণা, অর্থাৎ যাদের সোণা আছে তাঁরা ভদ্র; পয়সা থাকলেই ভদ্র, এ ত একটা প্রচলিত acceptation, পয়সা থাকলেই বাহিরটাকে চূণকাম করে' ভিতরের কালি ঢাকা দেওয়া যায়, সুতরাং যে কোন উপায়ে সুবর্ণের সংস্থান কত্তে পারলেই, ভদ্দর হওয়ার পথ পরিষ্কার হ'য়ে যায়। যাঁরা বলেন পয়সা থাকলেই ভদ্দর হয় না, তাঁরা নিজে সে রসে বঞ্চিত বলেই বলেন।

আর ভদ্র মানে ষাঁড়—উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দঃ ঋষভো বৃষভো বৃষঃ ইত্যমরঃ—অর্থাৎ সেই ভদ্র যে ষাঁড়। এ অর্থ কোথা থেকে এলো তার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হয়। মনুষ্য-গোষ্ঠীর একটা অবস্থা ছিল, যখন শরীরের বলই ছিল মূলাধার; যার ষাঁড়ের মত গো ছিল, গুঁতোবার শক্তি ছিল, সেই ছিল মানুষ, আর সব অ-মানুষ; আর তার শিংএর প্রতি সেলাম দিয়ে লোকে বলত—ভদ্র, ভাল মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ। বল ছিল ভদ্রতার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ,—তাই ভরতর্ষভ, বলভদ্র, বীরভদ্র এই সব নাম হ'য়েচে। এই অর্থে ভদ্র কথাটা ব্যবহার হ'তে আরম্ভ হ'লে, কমলাকান্তর বড় সুবিধা হবে না—তা না হ'ক, আমি অভদ্রই হব, যদি আর সকলে এই অর্থে ভদ্র হয়।

৯ই আশ্বিন, ১৩৩০

———

১০

নিরুপদ্রবের শেষ

কি কল্লে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না; অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ধৃষ্টতা রাখে বটে, কিন্তু ফলাফল মিলিয়ে দেখলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলেচে বলে' আমার জানা নেই। সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ বিষয়ে জ্যোতিষের formula আছে, সে formulaর কল্সে ফেলে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ পূর্ব্ব হ'তে গণনা করা যায় বটে, কিন্তু মনুষ্যজীবনে কি কল্লে কি হবে তার formula এ পর্য্যন্ত খুঁজে কেউ পায় নি।

আফিং খেলে মৌতাত হবেই এ পর্য্যন্ত কেউ ঠিক করে' বলতে পারে না। আফিং খেলেও যে মৌতাত না হ'তে পারে তার প্রমাণ আমি কমলাকান্ত স্বয়ং—আমি একেবারেই ত এক ভরি ওজনে এসে পৌছাই নি, সর্ষপ পরিমাণ থেকে সুরু করে', ক্রমে মটরভর, তার পর "বদরী সম", পরে "নবরঙ্গে" এসে দাঁড়িয়েছে; এই ক্রমোন্নতির কারণ হচ্চে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় মৌতাত না হওয়া। অহিফেন সেবন রূপ অতি সহজ ও সরল ব্যাপারে যখন ভবিষ্যদ্বাণী চলে না, তখন এতদপেক্ষা জটিলতর ব্যাপারে যে কি কল্লে কি হবে কেউ বলতে পারবে না তার আর আশ্চর্য্য কি? তবে, কি কল্লে কি হবে বলা

শত্রু হ'লেও, কি করে' কি হয়েচে তার আলোচনায় ফল আছে; পূর্ব্বপক্ষ (antecedent) ঠিক জানা থাকলে উত্তরপক্ষের (consequent) নির্ণয় হ'তে পারে। কিন্তু ইহ-সংসারে শত জটিলতার মধ্যে পূর্ব্বপক্ষটাকে চৌচাপটে ধরা যায় না—এইজন্যই উত্তরপক্ষ সম্বন্ধে যা কিছু গোল হ'য়ে থাকে। History repeats itself এই যে কথা আছে, সেটা স্পষ্ট বুঝা যায় ঘটনার পর; তবে বুদ্ধিমানেরা বলেন, স্থির বুদ্ধিতে বিচার কল্লে ঘটনার পূর্ব্বেও কতকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। আমি তাই জোর করে' কিছুই বলব না, আমার সিদ্ধান্তটা ভবিষ্যদ্বাণী বলেও যেন কেহ গ্রহণ না করেন।

আমি কিছু দিন পূর্ব্বে সন্দেহ করেছিলুম—জার্ম্মাণি যে আমার অসহযোগনীতি গ্রহণ করে' আমাকে ও নীতিটাকে ধন্য করেচে সেটার শেষ পর্য্যন্ত মান রাখবে ত? আমি আরও বলেছিলুম, যে গায়ের জোরের অভাব বলে' অর্থের খোটা ধরে' এখনও জার্ম্মাণ মেড়া লড়চে (এটা অবশ্য নিরুপদ্রব লড়াই), এ খোঁটা ভাঙ্গলে তার এ লড়াইও শেষ হ'য়ে যাবে। আমি তখন ভবিষ্যদ্বাণী করি নি, কিন্তু এখন দেখছি আমার কথাটা লেগেচে। জার্ম্মাণির প্রেসিডেণ্ট শেষ ঘোষণা কত্তে বাধ্য হয়েচেন—In order to maintain the life of the people and the State we are to-day confronted with the bitter necessity of breaking off the fight. —(26 Sept. 1923)

দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জাতটাকে শত্রুর সঙ্গে নিরুপদ্রব অসহযোগ করে' শেষে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল, এর মধ্যে যে অদৃষ্টের পরিহাস রয়েচে সেটা বড়ই ক্রূর ও মর্ম্মভেদী। দেশাত্মবোধ, বুদ্ধি, উদ্যম,

অর্থসম্পত্তি এসকলের সমবায়েও নিরুপদ্রব অসহযোগ কোন কাজেরই হ'ল না। রুরের শ্রমিকদের অর্থ দিয়ে বাচিয়ে রাখবার খরচ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না; soul-forceএর অভাব হয় নি, শেষে অর্থের অভাবেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। প্রতি সপ্তাহে ৩৫,০০০ trillion marks হিসাবে অর্থ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না, অসহযোগের অবসান হ'য়ে গেল। যাঁরা জার্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিহাস পর পর দেখে এসেচেন, তাঁরাই বলবেন জার্ম্মাণি যে দিন হটে গিয়ে Hindenberg lineএর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করে' নিশ্চল হ'য়ে বসল, সেই দিনই তার পরাভব হ'য়ে গেছে—তারপর যতদিন যুদ্ধ চলেচে ততদিন সে ভেঙ্গেই পড়তে চলেচে; Versailles সন্ধিতে তাকে একবারে নখদন্তহীন করে' বেঁধে ফেলা হ'ল; ফ্রান্সের দাবী মেটাতে সে পারলে না, বা চাইলে না—যাই বলুন, তারপরই রুর দখল হ'ল ও সেই সঙ্গে নিরুপদ্রব অসহযোগ আরম্ভ হ'ল। ফ্রান্সের টাকা দিতে বাধ্য হ'লে জার্ম্মাণির যে দুর্দ্দশা হবে, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল, এই ভেবে জার্ম্মাণ-জাতি নিরুপদ্রব অসহযোগকে বরণ করে' নিয়েছিল; কিন্তু নিরস্ত্রের সে অস্ত্রও নিষ্ফল হ'ল। জার্ম্মাণিতে আজ সে নিষ্ফলতার ফল হয়েচে—অরাজকতা, আর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভেঙ্গে পড়া।

যুদ্ধ-শাস্ত্রের একটা আইন আছে—Victory can only be won as the result of offensive action; এ সত্য সকল যুদ্ধেই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, এ কথার যাথার্থ্য সকল তর্কের অতীত হ'য়ে রয়েচে। অসহযোগ একটা প্রতিষেধক defensive action মাত্র। এ defensive action থেকে জয়শ্রী লাভ করা যেতে পারে না।

অসহযোগ একটা মাঝামাঝি পথ—সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র—তা' থেকে জয়শ্রীলাভ কেউ কখন করতে পারে নি।

আমি একথা বলতে চাই না যে অসহযোগ-নীতি অবলম্বিত হয়েচে বলে' আমাদের দেশেও আমি "নাশংসে বিজয়ায়"—তার দুটি কারণ, প্রথম, আমি ভবিষ্যদ্বক্তার আসন গ্রহণ করতে মোটেই রাজি নই; দ্বিতীয়, East is East and West is West—প্রতীচ্যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে বলে' প্রাচ্যেও তাই হবে কে বলতে পারে?

২৩শে আশ্বিন, ১৩৩০

৩১

যদি

"যদি" দিয়ে হাতী কেনা যায়, এ কথা নতুন নয়। যদি আজ আমি রাজতক্তে বসতে পাই—এমনকি, তারকেশ্বরের ফাঁকা গদিতে আসন পাততে পাই, ত আমি একটা ছেড়ে দশটা হাতী কিনতে পারি; এ সহজ কথাটা বুঝতে তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তবে এই "যদি"র পর একটা নিদারুণ "কিন্তু" এসে পড়েই—আর হাতী ছেড়ে একটা রামছাগল কেনাও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, এই যা মুস্কিল!

তবে এই "কিন্তু"র উপর আর একটা "কিন্তু" আছে; সেটা হচ্চে এই যে, আমরা যখন এই "যদি"র নেশায়—এই সম্ভাবিতের দিবাস্বপ্নে মজগুল্ হ'য়ে থাকি, তখন "কিন্তু"র কথাটা, অর্থাৎ তারকেশ্বরের ফাঁকা গদিতে বসবার প্রতি অন্তরায়টা, খুব প্রকট হ'য়ে আমাদের স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটায় না; তখন কথাটা দাঁড়ায় এই—যদি আমি রাজা হই, হাতী কিনতে পারি, কিন্তু রাজা হচ্চি না, কিন্তু যদি হই ত কিনতে পারি ত, এই বলে' "যদি"র উপর একটা প্রবল দমক দিয়ে প্রথম "কিন্তু"র খোঁচাটা ভুলে যাই। এ "কিন্তু" দিয়ে "কিন্তু"র মার—যেন কণ্টকেন কণ্টকোদ্ধরণম্।

এই "যদি" আর "কিন্তু"র মারপেঁচে আমরা এখন স্বরাজ্যরূপ

হাতী কিনতে ব্যস্ত হয়েচি। "যদি" হল আশা, "কিন্তু" হল নৈরাশ্য। "যদি" বলে—ভয় কি? "কিন্তু" বলে—ভরসা কিসের? "যদি" বলে—আগু চল্, "কিন্তু" বলে—অনেক জল। "যদি" আর "কিন্তু"—এই দুই দলের লড়াই আমি দেশময় দেখতে পাচ্চি। উভয় পক্ষের "যদি" যদি সত্যি হয়, তা হ'লে হাতী ছেড়ে ঐরাবত কেনা হবে, আর "কিন্তু" যদি প্রবল হয়, ত রামছাগলও জুটবে না।

এক দল বলচেন, যদি অহিংসা দেশের লোকের—প্রত্যেক ভারতবাসীর—অন্তরের অনুভূতি হয়, হৃদয়ের সত্য সংস্কার হয়, তবে কাল স্বরাজ আসবে। অপর দল বলচেন—কিন্তু, তা হবে কি? মানুষ মাত্রেই দেবতা হবে কি?

আর একদল বলচেন—যদি সমগ্র দেশটা আজ সুধু তর্জ্জনী হেলন করে' এক জোটে তর্জ্জন করে' হিংস হ'য়ে ওঠে—তা হ'লে কালই স্বরাজ মিলবে। অপর পক্ষ বলচেন,—কিন্তু তা সম্ভব কি? সব মানুষ এক জোটে পশুবৃত্তি হ'য়ে যাবে কি?

আমি দেখচি, উভয় পক্ষের "যদি" সমান অসম্ভব; এবং উভয় পক্ষের "কিন্তু"টা সমান প্রবল। অর্থাৎ মানুষ একজোটে অহিংসও হবে না, হিংসও হবে না—দেবতাও হবে না, পশুও হবে না, অতএব স্বরাজ্যও মিলবে না।

এই যদি ও কিন্তুর লড়াইএর ভেতর ধর্ম্মাধর্ম্মের কূটতর্কের কথা আমি তুলব না—স্বরাজ্যলাভের উপায় স্বরূপ যেটাই কিন্তুর কবল অতিক্রম করে' চরিতার্থতা লাভ করবে, সেটাই পরম ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্মের মূল হিংসাও নয়, অহিংসাও নয়—তার মূল ঐক্য। এক হ'য়ে যদি আমরা শুধু হাসতে থাকি, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে আমরা যদি

বিপক্ষকে দেখলেই—দন্তরুচি-কৌমুদী বিকীরণ করে' শুধু হাসতে থাকি, তা হ'লে সে যত বড় বিপক্ষই হ'ক না, তাকে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। পথে, ঘাটে, সভায়, সমিতিতে, আদালতে, কাউন্সিলে, কন্‌ভোকেশনে, ক্লাবে, রেলে, ট্রামে, ষ্টীমারে, ঘরে বাইরে—দেখো আর হাস, দেখ্-মার করে' যদি না পার, দেখন-হাসি করে' উড়িয়ে দিতে পারবে। আমি শুনিচি নাকি ইজিপ্টে সাহেব দেখলেই, ছেলে বুড়ো, মাগী মিন্সে, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে—"জগ্‌লুল, জগ্‌লুল, জগ্‌লুল"—এই বুলি আওড়াত; যেন কে কাকে বলচে, কিন্তু যাকে বলচে সে মনে বুঝে এমন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠত যে, পালিয়ে তবে তার প্রাণ বাঁচত। এই ঘাড় নেড়েনেড়ে "জগ্‌লুল, জগ্‌লুল" বলা হিংসও নয় অহিংসও নয়, একটা বিরাট বিদ্রূপমাত্র; সেটা কোনো দণ্ডবিধির কবলে পড়ে না, অথচ প্রাণ ওষ্ঠাগত করে' তোলে।

তাই বলি, যদি একজোটে হাসতে পার, কি কাঁদতে পার, কি হাই তুলতে পার, কি ঢেঁকুর তুলতে পার—তা হ'লে প্রতিপক্ষের আর ঘরের বার হওয়া দায় হ'য়ে উঠবে। এবং সত্বরই পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

কিন্তু এখানেও সেই "কিন্তু"র ঠেলা—যদি একজোটে হাসতে পার ইত্যাদি, কিন্তু পারবে কি?

দিন দুনিয়ার মালিক যতদিন এক ছিলেন—ছিলেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল "বহু স্যাম্", আর বহু হলেন; সেইদিন হতে "বহু স্যাম্" এই আকাঙ্ক্ষাই দুনিয়াকেও ব্যাপ্ত করল—শরীরী অশরীরীর মধ্যে, স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে, বিশ্ব প্রপঞ্চের সর্ব্বস্থলে—বহুত্বই আইন হ'য়ে গেল। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বল্লেন, সে বহুত্ব বাহ্যিক, ব্যবহারিক, মায়িক

—মৌলিক নয়; তাই তিনি এই বহুত্বের মধ্যে একের সন্ধান করে' দেখালেন—বিশ্ব এক, যেহেতু আত্মা এক—সেই একককে উপলব্ধি করতে পারলেই বহু এক হ'য়ে যাবে। . .

এই একীকরণের চেষ্টায় তত্ত্বদর্শী মানুষকে তত্ত্বদর্শন করতে শিখালেন —যে তৃতীয় নেত্রে মায়ার আবরণ ভেদ করে' সে তত্ত্বদর্শন সম্ভব হয়, সেই তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করবার জন্য পরপর বহুতর অনুশীলনের স্তর উদ্ভাবিত করলেন। এই অনুশীলনের পর্য্যায়ের নাম হল ধর্ম্ম, সংস্কার, যোগ ইত্যাদি;—কিন্তু সেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এক হলেও, তিনিও "বহু স্যাম্"; তাই আজ যত দেশ তত ধর্ম্ম, দেশে যত জাতি তত ধর্ম্ম, জাতিতে যত গোষ্ঠী তত ধর্ম্ম, গোষ্ঠী মধ্যে যত লোক তত ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম দিয়ে বহুকে এক করা কোনো যুগে কোনো দেশে হ'ল না—আমাদের দেশেও নয়।

আমাদের দেশে ছিলেন হিন্দুধর্ম্ম;—কালে তিনি বহু হলেন; তারপর এলেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, তাঁরাও বহু হলেন; তারপর এলেন মুসলমান ধর্ম্ম;—তিনিও অখণ্ড রইলেন না; তারপর খৃষ্টান ধর্ম্ম;—তাঁরও অনেক শাখা-প্রশাখা। এত ধর্ম্ম-বাহুল্যে একত্ব আসে কোথা হ'তে! ধর্ম্ম মানুষটাকে হয়ত বাঁধতে, সংযত করতে পারে; জাতিটাকে—ভারতীয় মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে ধরে' আটি বাঁধে কি প্রকারে? সুতরাং আত্মাই এক হ'ক, আর পরমাত্মাই এক হ'ক— মানুষ ধর্ম্মের দিক দিয়ে বহু হয়েই আছে ও থাকবে।

তবে উপায় কি? হিন্দুকে বাঁধতে গেলে মুসলমান রাগ করে, আবার হিন্দু-মুসলমানকে বাঁধতে গেলে হিন্দু-মুসলমান ছাড়া যে তৃতীয় সম্প্রদায়, হয় সে চেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দেন, নয় ত রাগে গর্‌গর্‌

করতে থাকেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে, যদি এক হয় এই আশঙ্কায়, কাঁপতেও থাকেন; আমরাও, যদি হয়, এই আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠি।

কিন্তু হবার নয়; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই নিয়েই আমরা, মানুষ মাত্রেই, "বহু স্যাম্"। তবে একীকরণের উপায় কি?

কবি বলিয়াছেন—

জন্মিলে খাইতে হবে
নিখাগী কে কোথা কবে
(অতএব) মধুহীন কোরো না গো
তব পদ-কোকনদে।

কবি হলেও তিনি নিখাগী নন, তাই বলেচেন কোকনদের শোভার সঙ্গে একটু মধু রাখিও—কেননা স্নধু তোমার ও রাঙ্গা পায়ের শোভা দেখিয়াই পেট ভরিবে না।

আমি এই কবিবাক্য পর্য্যালোচনা করে' দেখলাম—কবিই প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্বদর্শী বুঝেন;—জন্ম-মৃত্যুর অধীন, এই মনুষ্য-দেহের মধ্যস্থিত যে উদররূপী গহ্বর—তাতেই একত্বের সমস্যা পচ্যমান—মানুষের পেটই একত্বের নিদান। কেহ কেহ বলেছেন—Man does not live by bread alone—সেটা তাঁদেরই কথা, যাঁদের ঘরে আটকে বাঁধা আছে; এবং সেটা স্নধু কথার কথা মাত্র। আমি দেখতে চাই, পেট যখন পিতৃপুরুষের অন্তকামী হ'য়ে ওঠে, তখন কোন্ কবি কবিতা লিখে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন; যে কবির অমর চরণ উপরে উদ্ধৃত করেছি তিনি যখন খেতে পেতেন, তখন মেঘনাদ-বধ কাব্য লিখেছিলেন; আর যখন খেতে পান নি, তখন রোগগ্রস্ত হ'য়ে

হাসপাতালে মরেছেন। হিন্দুর গোঁড়ামী তাঁর ক্ষুধাবৃদ্ধি করেছিল, খৃষ্টান ধর্ম্ম তা নিবারণ করে নি।

অতএব এই ক্ষুধার সেবা কর তবেই একত্র মিলবে, এবং একত্র মিললেই বাঁচবে। যদি ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিতে পার, ত সে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ারই মত শুনাবে; কেননা মা আমাদের ক্ষুধারূপিণী; —এই তেত্রিশ কোটির ক্ষুধা যদি মায়ের ক্ষুধা না হয়, তবে সে আমাদের মা নয়!

আজ ১৪ই জুলাই, ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ফরাসী জাতি এই ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিয়েছিল; আবালবৃদ্ধবনিতার জঠরাগ্নি বাড়বানলের রূপ ধারণ করে' অনাচার অত্যাচারের বিশাল বারিধিকে পরিশুষ্ক করেছিল; সেটা ফরাসী-মায়ের ডাকেরই মত শুনিয়েছিল। বুভুক্ষিত ফরাসী আবালবৃদ্ধবনিতা যে Come children of the fatherland, the day of glory is come বলে' সমস্বরে গেয়ে উঠেছিল সে স্তোত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্ভাবনা-জনিত উল্লাসেরই অভিব্যক্তি মাত্র; তারা day of glory না বলে' day of feasting বললে ভাবগত বৈষম্য কিছুই হত না! অতএব 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' এই ঋষিবাক্যের যে উত্তর বুভুক্ষিত নিপীড়িত মানুষ যুগে যুগে প্রদান করেচে, যদি সেই উত্তর সমস্বরে দিগন্ত-বিদারী বজ্র-নির্ঘোষে দিতে পার, তবে তুমি আহিত-জঠরাগ্নি অফুরন্ত হব্যের সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যদি বল পেটের ক্ষিদেকে patriotism করে' তুললে, কথাটা ভাল শুনায় না;—কিন্তু কখনও জিনিষটাকে তলিয়ে বুঝেচ কি? যে-কোন-দেশে, যে-কোন-যুগে মানুষের যে-কোন-চেষ্টা, সবই ক্ষুন্নিবৃত্তির

চেষ্টামাত্র। আদিম মনুষ্যসমাজ মধ্য-এসিয়ার আদি নিবাস হ'তে ছড়িয়ে পড়ে' "পশ্চিমে হিস্পানি দেশ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ" পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল কিসের জন্য? পেটের দায়ে। প্রাচীন রোম গ্রীস হ'তে বর্ত্তমান ইংলণ্ড আমেরিকা জার্ম্মানি পর্য্যন্ত যে বিরাট উদ্যমে বিজ্ঞান বাণিজ্য ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেচে—এই বিপুল উদ্যমের মধ্যে অন্নসংস্থান করা ছাড়া আর কিসের লক্ষণ দেখতে পাও? যাকে Pure science বা Pure adventure বা Pure philanthropy বল, উত্তরমেরু আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বা এভারেষ্ট অভিযান, কোনোটাই জঠরানল নিবৃত্তির সহিত সম্পর্কশূন্য নয়।

যদি ভালরকম একটা নাম দিতে চাও দাও, তা'তে কাজের সুবিধা হ'তে পারে—যারা পেটের জন্য 'এই কর' বললে মাতবে না, তারা যদি patriotism বললে মাতে ত তাই কর। এরকম পদ্ধতির নিদর্শন চারিদিকেই আছে—white man's burden বলতে মূলতঃ white man's bread বুঝালেও, প্রথমোক্ত আখ্যাটীতে লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজে সগৌরবে কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে থাকে। কিন্তু এই নামের মাহাত্ম্যে আসল কথাটা ভুলো না ;—আসল কথাটা যে পেটেরই কথা সেটা ভুলো না, তা'তে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।

অতএব দেখা গেল—ক্ষুধা আছেন, সে বিষয়ে "যদি" কিছু নাই ; এবং ক্ষুধা সকলেরই আছেন, সে বিষয়েও "যদি" কিছু নাই ; এবং ক্ষুধার তাড়নে মানুষ অসাধ্য-সাধন করে, সে বিষয়েও মানুষের সৃষ্টির দিন হতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে আসচে ; সুতরাং এখানেও "যদি" কিছু নাই। যেখানে "যদি" নাই সেখানে "কিন্তু"ও নাই—যেখানে সন্দেহ নাই সেখানে বিভিন্ন অনুমান নাই, বিভিন্ন বা

বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও নাই। খেতে হবেই, নইলে মরতে হবে,—ইহার ভিতর “যদি” বা “কিন্তু” কিছুই নাই।

অতএব, এই বিশ্বব্যাপী ক্ষুধাকে ফুটিয়ে মুখর করে' তোলো ;—এমন ঐক্যের ভিত্তি, এমন অটুট বাঁধন আর কোথায় পাবে ?

১৪ই জুলাই, ১৯২৪

———

"খুঁজি খুঁজি নারী"

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সংপ্রাপ্তিহেতবঃ ইতি স্মৃতিঃ ; ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্ ইতি চরকঃ। চতুর্ব্বর্গ লাভের এই দুই শাস্ত্রোক্ত পথ ; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই দুই পথ আবিষ্কার করে-ছিলেন। চতুর্ব্বর্গের মূল যে রোগহীনতা সেটা আবিষ্কারের জন্য ত্রিকালজ্ঞ না হলেও ক্ষতি ছিল না ; কিন্তু দারা যে চতুর্ব্বর্গের সম্প্রাপ্তি-হেতু সে কথাটা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির দোহাই না দিলে আর ঠিক গলাধঃকরণ করা যেত না। কারণ অতীত ও বর্ত্তমানের অবস্থা হ'তে উক্ত বচনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে বলে' মনে হয় না। ভবিষ্যতের মুখচেয়ে থাকতেই হয়েচে।

আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার বঁধু মিলে নাই, অতএব আমার কথা কেহ প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বা ভুক্তভোগীর কথা বলে' গ্রহণ করবেন তা আমি সাহস করে' বলতে পারি না; তবে বঁধুহীন হলেও আমার কথাগুলা খুব অনাস্থার যোগ্য বলে' মনে করবারও যথেষ্ট কারণ নেই, কেননা ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ হ'লেও কুলযোষিৎগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না একথা সত্য, এবং ছিলেন না বলেই হয়ত ত্রিকালজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন।

বৃদ্ধ কমলাকান্তেরও বিবাহের কাল আসিয়াছিল, এখন চলিয়া

গিয়াছে ; তখন ফল-পুষ্পে পরিশোভিত এই ধরিত্রীর বক্ষাঞ্চলে রূপরসগন্ধের মেলা বসিত, এখনও বসে, কিন্তু আমার জন্য বসে না। তখন একবার চতুর্বর্গের দ্বার স্বরূপ দারার অন্বেষণ করেছিলাম, কিন্তু সে দ্বার আমার পক্ষে চিরদিনের জন্য অনুদ্ঘাটিতই রহিয়া গিয়াছে। কেন তা বলি শুন।

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণকালে বলিতে হইবে—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্

—তাহাকে কোথায় পাইব ? সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিব, সমস্ত সাগর ছেঁচিয়া সে মাণিক তুলিব পণ করিলাম ; পণ রাখিতে পারিলাম না। কিন্তু কি করিলাম, কেন পারিলাম না, তোমাদের জানিয়া রাখা ভাল।

আমার অভিলষিতের অন্বেষণ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে একবার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের প্রদত্ত সুলক্ষণা কন্যার বিবরণ পাঠের অভিলাষী হ'য়ে আমি পুঁথির পাতা উল্টাতে বসলাম। মনু, হারীত, গর্গ, ব্যাস ইত্যাদির পুঁথি আলোড়িত করে' দেখলাম,—কন্যার কেশাগ্র থেকে আরম্ভ করে' নখাগ্র পর্য্যন্ত, কোন্ চিহ্নটা কিসের সূচনা করে— তার কণ্ঠস্বর, বচনভঙ্গী, গমনভঙ্গী ইত্যাদিতে তার অন্তরের কোন্‌খানটা ব্যক্ত হয়—সব পাঠ করলাম, শেষে "বাঁশ বনে ডোম কানা" হ'য়ে হতাশ হ'য়ে পড়লাম।

সুলক্ষণা কন্যার বর্ণনায় একস্থানে এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী
সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা।

বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী
কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া ॥

ত্রিকালজ্ঞ ঋষির 'আদেশ না থাকলেও উপরোক্ত লক্ষণে লক্ষণাক্রান্তা সুকন্যার অনুমোদন সকলেই করতেন—ঋষিবাক্যে নিঃসংশয়ে করবেন এইমাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ লোকের চোখ বলে' একটা জিনিষ আছে; ঋষিগণের যেমন আছে, ঠিক তেমনিই; সেই চোখের জোরেই সে বিচার—সুন্দর অসুন্দরের বিচার, মানুষ করে' থাকে। কিন্তু সুন্দর অসুন্দর ছাড়া, সু আর কু বলে' যে জিনিষ আছে, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের তা জানা ছিল বলে' লোকের ধারণা। সব সুন্দরই সু নয়, এবং সব অসুন্দরই কু নয়; সু কু ঘটিত এই যে জটিল হেঁয়ালী তার পূরণ কল্পে কন্যা সম্বন্ধে ঋষিগণ কৃত নির্দ্দেশটাই, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে, চক্ষুষ্মান হলেও, খুব প্রয়োজনীয় বলে' লোকে মনে করে। ঋষি শাতাতপ একস্থানে বলেচেন—

হংসস্বনাং মেঘবর্ণাং মধুপিঙ্গললোচনাম্।
তাদৃশীং বরয়েৎ কন্যাং গৃহস্থঃ সুখমেধতে ॥

—হাঁসের মত ডাক, মেঘের মত বর্ণ, বেরালের মত চক্ষু, এমন কন্যাকে, ঠিক ত্রিকালজ্ঞ না হলে, বরণীয়া বলে' মনে করবার কথাই নয়।

অবরেণ্যা কন্যা সম্বন্ধে মনু বলেচেন—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীম্।
নালোমিকাং নাতিলোম্নীং
ন বাচালাং ন পিঙ্গলাম্ ॥

নক্ষ´-বৃক্ষ-নদী-নাম্নীং
নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহি-প্রৈষ্য-নাম্নীং
ন চ ভীষণনামিকাম্॥

—কপিল বর্ণের কন্যা, অধিকাঙ্গী কন্যা, অলোমিকা বা অতিলোমিকা কন্যা, পিঙ্গলবর্ণা কন্যা, ঋক্ষ বৃক্ষ নদী পর্ব্বত পক্ষী সর্প ইত্যাদির নামে যাদের নাম, এমন কন্যাকে বিবাহ করিবে না। নামকরণের অপরাধে অনেক কন্যাই বিবাহের অযোগ্যা হইয়া গেল। মনুসংহিতার কালে না জানি তাদের কি গতি হইত! এযুগেও আমার ঋষিবাক্য হেলনের দুঃসাহস জুয়াইল না—যদিও আমি অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে ঋষিবাক্য একেবারে অভ্রান্ত। ওষ্ঠাধরে হাসির বিদ্যুৎ খেলিলে যদি গণ্ড মধ্যে রূপের কূপের সৃষ্টি হয়, ত্রিকালের জ্ঞান যার নাই তার চক্ষে ত সুন্দরই দেখায়, কিন্তু ঋষি বলিয়াছেন—

কূপৌ যস্যা গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়াঃ
নিঃসন্দিগ্ধং বন্ধকীং তাং বদন্তি।

—যদি কন্যা বন্ধ্যাই হইবে এমন নিশ্চয় জানা যায়, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের দ্বার স্বরূপ কে তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে? অতএব আমিও তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম।

তারপর নাড়ী নক্ষত্র দেখে, গণ দেখে, বর্ণ দেখে, জ্যোতিষ বচনের ছত্রিশ রকমের ইঙ্গিত বিধি নিষেধ দেখে, আমি "বাঁশ বনে ডোম কানা" হয়েই শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করে' সুকন্যা লাভের আশা ত্যাগ কল্লাম।

শাস্ত্রের বহুতর আদেশ ও প্রতিষেধ বাক্য আলোচনা করতে করতে

আমার বহুবার এই কথা মনে এসেছে, আমি ত কন্যা মনোনয়ন করতে চলিচি, কন্যা আমায় কি দেখে মনোনয়ন করবে—শাস্ত্রকার তার হিসাব ত কোথাও দেননি। শাস্ত্রকারগণের আলোচনার ধারা দেখে মনে হয়—বরণীয় অবরণীয় বিচার কন্যা সম্বন্ধেই চলতে পারে; "পুরুষ পরেশ" —সে সর্ব্বদাই বরণীয়—সে যেন প্রকৃতির master key—সহস্র কুলুপ সে-চাবিতে খোলে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের এ দম্ভ আমার ভাল লাগল না।

আমি এই জনপূর্ণ অরণ্য মধ্যে আমার অভিলষিতের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লাম—কিন্তু সে অরণ্যের কত বৃক্ষতলে আতপতপ্ত হ'য়ে বিশ্রমার্থ উপবেশন করেছি; কত ফুলের গন্ধ, ফলের আস্বাদ গ্রহণ করেছি; কত নির্ঝরিণীর কলনাদে ঘুমিয়ে পড়েছি; কিন্তু সে সুপক্ক হরিতকী, সে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের দ্বার স্বরূপ দারার ছায়াও দেখতে পাইনি। তা হ'তে এই বুঝেচি যে সমগ্র জীবনটাই এই রকম "খুঁজি খুঁজি নারী" করে' ভ্রমণ করলেও আমার অন্বেষণ শেষ হবে না— আমার ঈপ্সিত মিলবে না—যে হেতু আমিই একমাত্র মনোনয়নের অধিকারী নই—আমার মনই একমাত্র কষ্টিপাথর নয়! ত্রিকালজ্ঞ ঋষি যাই বলুন, যে পায়, আর যাকে পায়, এ দু'য়েরই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে।

আমি আরও দেখলুম যে ভক্তের সেই যে একটা কথা আছে— "মানুষ ধরতে গেলে মরতে হয়" সেই কথাই কথা; যাকেই ধরতে যাও, মরতে হবে, আপনাকে ডুবিয়ে দিতে হবে, আপনাকে নিঃশেষ করে' বিলিয়ে দিতে হবে। আমি আপনাকে নিঃশেষ করে' বিলিয়ে দিতে পারলুম না; যে আমার মত যাচাই করে সে পারে না, তাই আমিও পারলুম না, আমি হতভাগ্য!

আমি সেই অবধি অন্বেষণ ত্যাগ করেছি; আমি বুঝেচি এ পথহীন ভ্রমণের শেষ নাই, তাই ত্রিকালজ্ঞ না হয়েও ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের তৃতীয় পথ—সহজ পথ—একটা আমার সুমুখে খুলে' গেছে, সেইটার সাধনা বাকী ক'টা দিন করে' যাব।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩০

৩৩

লুকোচুরি

স্কুল-মাষ্টার রমানাথ বাবু খুব কড়া লোক। বিধি-নিষেধের বাঁধনে মানুষের প্রকৃতিকে বেঁধে রাখবার খুব পক্ষপাতী; মানুষকে যে Act of Parliament দিয়ে ধার্ম্মিক করা যায় না, সে কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর ছেলেদের এই রকম আইনের বাঁধনে বেঁধে মানুষ করে' তুলবেন তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা; ছেলেগুলি খুব শিষ্ট শান্ত, উঠতে বল্লে ওঠে, বসতে বল্লে বসে।

রমানাথ বাবুর হুকুম প্রতিদিন একটা-না-একটা শুভকার্য্য করে' —দুঃখীর দুঃখ মোচন করে', বিপন্নের সাহায্য করে', বুভুক্ষিতকে অন্ন দিয়ে, নিদেন একটা কীট কি পতঙ্গকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে, দিনটাকে সার্থক করতে হবে। সন্ধ্যার সময় রমানাথ বাবু তাঁর আট বছরের শিশু পুত্রকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—এরকম তিনি নিয়মিত রূপে প্রতিদিন করে' থাকেন—"বাবা, আজ কি শুভকার্য্য করেচ?"

পুত্র। আজ একটা নেংটি ইঁদুরের প্রাণ রক্ষা করেচি!

রমানাথ। ভাল, ভাল; কি করে' রক্ষা কল্লে?

পুত্র। আজ্ঞে, বেরালটা তাকে ধরবার জন্য গর্ত্তের কাছে ওত পেতে বসেছিল—আমি একখানা থান্ ইট তার মাথায় মেরে তাকে শেষ করে' দিয়েচি।

পিতা অবাক—যদিও অবাক হবার কথা নয়; আইন করে' মানুষের মনকে বাঁধতে গেলে এমন বিপরীত ফল ফলবেই। আরও অবাক হবার কথা নয় এইজন্য যে, চোখ চেয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, নিশিদিন এই কাজই চলেচে—বেরাল মেরে ইঁদুরকে বাঁচান, চাষী মেরে জমিদারকে বাঁচান, কুলি মেরে কুঠিয়ালকে বাঁচান, বিদেশীকে মেরে স্বদেশীকে বাঁচান, গরীব মেরে ধনীকে বাঁচান—মঙ্গলার বাছুরকে মেরে কমলাকান্ত বামুনকে বাঁচান, —এইত আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্ চলেইচে। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

দুনিয়া জুড়ে এই যে বিশাল দ্বন্দ্ব চলেচে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের, এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণের, এর মধ্যে একজনকে মেরে আর একজনকে বাঁচাবার আয়োজনই চলেচে। তুমি মর আমি বাঁচি, এই হল মূল কথা। তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি, তার জন্য স্বর্গের সৃষ্টি হয়েচে। এই ধরাপৃষ্ঠে একজনকে মেরেই আর-একজনকে বাঁচতে হবে। কিন্তু সেই মূল অভিসন্ধিটা খুব চতুর উপায়ে আবৃত করে' রাখবার ব্যবস্থাও করতে হবে—সেই আবরণের নাম civilization.

সিংহ ক্ষুধার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বনের হরিণীর উপর, সেটা হ'ল সিংহের সহজ অনাবৃত পশুভাব। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ আস্ত মানুষকে খেয়েচে, এখনও খায়, সেটাও মানুষের সহজ উলঙ্গ পশুভাব; সে মানুষকে বলে বর্ব্বর, savage! কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁচা মানুষ না খেয়ে, যখন মানুষ উঠান চসে', আর ঠিক রক্তপান না করে', তার ধানের মরাই খালি করে' নিয়ে যায়, সে বেচারা না খেতে পেয়ে

মরে, আর তার নাম দেয় exploitation বা অবাধ বাণিজ্য, তখন সে লুণ্ঠনকারী হয় civilised.

নির্জীব, নিরীহ, গরীবকে exploit করবার জন্যই বলবান তেজীয়ান ধনবানের জন্ম। গরীব দুটা মিষ্টি-কথার কাঙ্গাল; দুটা মিষ্টি-কথায় ভুলে সে বলবানের বোঝা কাঁধে তুলে' নেয়। সে ভারবাহী হয়েই জন্মেচে, ভার বইতে বইতেই সে একদিন পথের প্রান্তে তার ভারাক্রান্ত জীবনের অন্ত করবে; তারপর আর-একটা শর্করাবাহী ঋষভ তার বোঝা স্ব-ইচ্ছায় পৃষ্ঠে তুলে' নিয়ে বলবান ধনীর কষাঘাতে এ বন্ধুর জীবন-পথে চলতে চলতে গরীবের "পরমা আবৃতি"কে প্রাপ্ত হবে। এই রকম জীবন-মরণের প্রবাহ কালসিন্ধুনীরে অনন্তকাল ধেয়ে যাবে।

সাগর ছেঁচে মাণিক তুলে' আনে, খনির গর্ভ থেকে মণি তুলে' আনে, গরীব—ধনীর কণ্ঠহার রচিত হবে বলে', আর তার নিজের একমুষ্টি অন্ন জুটবে বলে'। ধনীর ধনবৃদ্ধির জন্য, দৃপ্ত অহঙ্কারের চরিতার্থতার জন্য, যুদ্ধ বাধে, দরিদ্রের প্রাণ যায়। প্রাণ গেল ত ফুরিয়ে গেল; মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, - যখন তার হাত-পা গুঁড়িয়ে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়, আর সেই ধনীর দ্বারে অন্ধ পঙ্গুর পাল ভিক্ষান্নের জন্য উপস্থিত হ'লে, নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত হয়;—যখন নারী পতিহীনা, পুত্রহীনা হ'য়ে, দেহের বিনিময়ে উদরের অন্ন সংগ্রহ করে;—শিশু যখন স্তন্যের অভাবে মুকুলেই শুকিয়ে ঝরে' পড়ে। কিন্তু এ বীভৎসমূর্ত্তি সভ্যতার ঢেকে রাখবার জন্য জয়স্তম্ভ তার নির্লজ্জ শির উত্তোলন করে' দাঁড়ায়, জয়গানের কোলাহল মুমূর্ষুর বুভুক্ষিতের ক্রন্দনের রোলকে নিমজ্জিত করে, বিদীর্ণ বক্ষের উপর সোনার পদক

ঝুলতে থাকে। তাতে বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিভে না, কামনার বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।

জঠরানল ও কামানল এই দুই অনলকে ইন্ধন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা সমানই চলতে থাকে; সে হিসাবে আমরা সকলেই আহিতাগ্নি—সকলেই অগ্নিহোত্রী। কিন্তু সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি সবই যে স্বধু সেই জঠরানল ও কামানলের নির্ব্বিবাদে ইন্ধন সংগ্রহের উপায় মাত্র, সে কথা ঢেকে রাখবার জন্য সতত ব্যগ্র হ'য়ে আছি। দুটা জাতির মধ্যে যুদ্ধ—সমগ্র সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সেই যুদ্ধের অভিমুখী হ'য়ে গড়ে' উঠেচে, আর সে যুদ্ধটা যে প্রকৃত পক্ষে উদর-জ্বালার উপশম করবার চেষ্টা মাত্র—আমার জানিত Spanish American War থেকে সেদিনকার World War পর্য্যন্ত, যে এই জঠরানলের হব্য সংগ্রহ করবার বিরাট চেষ্টা মাত্র—ঐতিহাসিক তা স্বীকার করবেন না; তিনি বলবেন All Wars are a war of principles. কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে অর্থনীতির মূলকথা Free Trade বা Protection নয়, তার মূলনীতি হচ্চে কাটাকাটি না করেও, তুমি মরবে কি আমি মরব, America মরবে কি England মরবে, Russia মরবে কি Japan মরবে, Germany মরবে কি France মরবে।

সভ্য মানুষের ধৃষ্টতার সীমা নেই। অসভ্য বর্ব্বর আমরা বলি,

হরি হে পার কর,
যার ধারি তার মরণ কর।

—উত্তমর্ণের এই মরণ-প্রার্থনা করার জন্য আমরা বর্ব্বর অসভ্য, কিন্তু সভ্য জার্ম্মাণীও এখন অন্তরে অন্তরে তাই প্রার্থনা করচে। আর

সুসভ্য সমগ্র ইউরোপকেও দেখেচি—ভগবানকে Lord of Hosts আখ্যা দিয়ে সমরাঙ্গনে তাঁকে ঠিক লড়াই করতে না ডাকলেও, যুদ্ধারম্ভে তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে' গির্জ্জায় গির্জ্জায় পূজার ব্যবস্থা করতে, এবং যুদ্ধশেষে জয়লাভের জন্য Thanksgivingএর আয়োজন করতে; সে আয়োজনকে কিন্তু বর্ব্বর বলবার জো নেই! কিন্তু এই গির্জ্জায় গির্জ্জায় উপাসনা ও Thanksgivingএর মূলকথা কি?—Give us this day our daily bread!

কাব্যকলাও তাই। আমি দেখি গীতগোবিন্দ থেকে সুরু করে' "গোপালে উড়ে" পর্য্যন্ত—স্মরগরলখণ্ডনং ইত্যাদি থেকে, "ঐ পোহাল, রূপসি, নিশি" পর্য্যন্ত, কামানলের আহুতির কথাই ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে সংগীত হয়েচে। সব রসের আদি আদিরস; এটা একটা আকস্মিক নিরর্থক শ্রেণী বিভাগ নয়। তবে তাকে ঢাকতে পারলেই কাব্য, না ঢাকতে পারলেই কাম। শীলতা বা শ্লীলতা এই ঢাকাঢাকির উপর, পর্দ্দার সরু মোটার উপর, নির্ভর করে—পর্দ্দার ভিতরের বস্তুর উপর নহে, কেননা সে বস্তু সব ক্ষেত্রে একই। আদি মানব যখন অশ্বত্থপত্র দ্বারা তার আদি নগ্নতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, অনাবৃত দেহে ভগবানের সমক্ষেও এসে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করেছিল, তখন থেকেই সে civilized হ'তে সুরু করেচে, অর্থাৎ আবরণের মাহাত্ম্য অবগত হয়েচে।

কেউ কেউ বলেন পশুভাবাপন্ন হ'য়ে মানুষ মানুষের হিংসা করে; সাত্ত্বিকজীবন যাপন করতে মানুষ যদি শেখে তা হ'লে পশুত্বের বদলে তার দেবভাবই ফুটে উঠবে। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না; সমগ্র মানবজাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করে' দেখলাম যে

মানুষ তার পশুত্ব বহুবার নষ্ট করবার চেষ্টা করেচে—কিন্তু নষ্ট করতে পারেনি—কেবল ঢেকে রেখেচে মাত্র। আর সেই ঢেকে রাখবার প্রচেষ্টাই civilization অথবা সাত্ত্বিকতার বাহাদুরী নিয়ে এসেচে। সকল শ্রেণীর সংস্কারক—সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, রাজনীতি-সংস্কারক—যদি গোড়া থেকে, বোনেদ থেকে, তাঁদের কাজ আরম্ভ করবার অবসর পেতেন, তা হ'লে তাঁদের সকলকেই এক জায়গা থেকে সুরু করতে হ'ত, এবং শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছালে সকলকেই একস্থানে গিয়ে কাজ শেষ করতে হ'ত। সেই আদিস্থান হচ্চে মানবজাতির শৈশব—যেটা নিছক পশুত্ব; আর শেষ করতে হ'ত মানবজাতির জরায় বা Second childhoodএ, সেটাও অনাবিল পশুত্ব মাত্র। কেউ কেউ বলেন, শিশুত্বই দেবত্ব—শিশুত্বই ভগবানের টাকশালের নির্ম্মল উজ্জ্বল কর্‌করে টাকা; এই দুনিয়ার মলামাটি লেগে তার রূপ, তার রং, তার ওজন, কমে গিয়ে ক্রমে সে একখানা 'নামরূপ'-বর্জ্জিত রূপার চাকতিতে পরিণত হয়। কিন্তু কবি যাই বলুন—রঙ্গীন কল্পনার চোখে মানবশাবকের যে মুর্ত্তিই ফুটে উঠুক সাদা চোখে শিশু একটি অনাবিষ্ট, স্বার্থপর, অসংযত, উদরসর্ব্বস্ব বর্ব্বর বলেই প্রতিভাত হয়। আর, পুনঃশিশুত্বের কবি যে চিত্র দিয়েছেন—

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything —তাতে দেবত্বের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। মনুষ্য-সমাজ বা মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য—"আদিতে পশু ছিলেন, অন্তেও পশু থাকিবেন।" যত গোল সুধু মাঝখানটাতে, কিন্তু সে গোল আর কিছুই নয়, সুধু ঢাকাঢাকির তারতম্য। এই ঢাকাঢাকির

তারতম্যেই সভ্যতা-অসভ্যতার তারতম্য—যে সমাজ বেশ করে’ গুছিয়ে ঢাকতে শেখেনি সে এখনও অসভ্য—সেই আদিম অশ্বত্থ-পত্রই Civilizationএর আদি মুদ্রা।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

৩৪

সত্যযুগ

কেউ বলতে পার এই সত্যযুগের কল্পনা মানুষ কোথাথেকে পেয়েছিল ? এই সংসারের হাসিখেলা কান্নাকাটি কি অসত্য ?

সত্যযুগটা কবে তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ নিয়ে সপ্রকাশ হয়েছিল তা' নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ সেই পরম রমণীয় যুগটা সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই, কেউ কেউ তারই কিছু পরে, কেউবা এই সেদিন আবির্ভূত হয়েছিল বলে' মনে করেন।

সবদেশেই এক একটা স্থান চিহ্নিতনামা করা আছে যেখানে সত্যযুগের নরনারী বিহার করেছিলেন, পূর্ণ সরলতা, পূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ সুখ নিয়ে তাঁরা স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের পার্থক্য তুলে' দিয়ে, এক রকম দেবতাদেরই মত এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করতেন।

কোন্ গিরিদরীবেষ্টিত উপত্যকার বক্ষস্থলে ফল ফুল প্রস্রবনের মেলা, তার মধ্যে—আদি নর ও আদি নারী মানবজাতির আদি জনক-জননী, পরিপূর্ণ আনন্দে বিহার করতেন ; অমরার দূতগণ নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন ; কখনও স্বয়ং ভগবান এসে তাঁদের প্রফুল্ল কুসুমোদ্যানের দ্বারে অতিথি হতেন। স্বর্গের হাওয়া মর্ত্ত্যে বইত, স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হ'ত—সে একদিন ছিল ! কাঁটা গাছে কাঁটা ছিল না, শৃঙ্গী, নখী, দংষ্ট্রীগণের শৃঙ্গ-নখ-

দন্ত আয়ুধরূপে ব্যবহৃত হ'ত না, বিষধরে বিষ ছিল না, "বাঘে গরুতে" ও সেই সঙ্গে মানুষে, একসঙ্গে এক ঘাটে জল পান করত।

আর এক যুগে, বৈশাখী শুক্লপক্ষে, অক্ষয় তৃতীয়ায় রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হ'য়ে লক্ষাধিক বর্ষ ব্যেপে বর্ত্তমান ছিল। দশাবতারের প্রথম চারি অবতার—"মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহাঃ"—এই চতুর্মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন; বৈবস্বত মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নরপতিগণ পৃথিবী শাসন করেছিলেন; একবিংশতি-হস্তপরিমিত মনুষ্যগণ লক্ষবর্ষব্যাপী পরমায়ু লাভ করে', ইচ্ছামাত্র দেহত্যাগ করতে পারতেন; পূর্ণ পুণ্য, পাপের লেশমাত্র ছিল না— নন্দন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সত্যে সত্যপরাঃ নরাঃ।

এ হেন সত্যযুগে, দেবতার আনন্দ এবং মানুষের সত্যানুবর্ত্তিতার মধ্যে ভগবানের চারিবার অবতীর্ণ হওয়ার কি কারণ হয়েছিল? তিনি যুগে যুগে যে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" এই পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, পূর্ণ সত্যের ও পূর্ণ আনন্দের মধ্যে, দুষ্কৃত কোথা হ'তে ক্রূর সরীসৃপের মত, কোন্ ছিদ্র অবলম্বন করে' প্রবেশলাভ কল্লে, যে তার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য চারিবার বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবানকে নেমে আসতে হ'ল? এ সকল বড় কথা হয়ত বিচারের বস্তু নয়, কিন্তু বিচার করা না-করা কি মানুষের হাত? আমার অন্তরের অন্তর ভিন্ন করে', ক্রূর ফণিনীর মত, সন্দেহ তার ফণা তোলে কেন? আমার হৃদয়ভরা পবিত্র বিশ্বাসকে বিষে জরজর করে কেন? আমার বুকের ভিতরকার সত্যযুগকে আচ্ছন্ন করে', পর পর ত্রেতা দ্বাপর শেষে কলির অন্ধকার আসে কেন?

সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব চিরদিন, আলো আঁধারের দ্বন্দ্বের মত,

সুরাসুরের যুদ্ধের মত, সুখ-দুঃখের পারম্পর্য্যের মত, হাসি-কান্নার মত, শাশ্বত ও সনাতন। তাই সত্যযুগের কল্পনাটা কেউ কেউ মনে করে সুধু কল্পনা মাত্র। ইতিহাস সত্যযুগের সাক্ষ্য দেয় না, বিজ্ঞান সত্যযুগের পরিচয় দেয় না। অলক্ষ্য অতীতের বিশাল প্রাঙ্গণে তার চরণের অলক্তরাগ দেখা যায় না, তাই নিত্য বিভ্রান্ত মানুষ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে—কবে মুক্ত পুরুষগণ সমভিব্যবহারে ভগবান এই সন্তপ্ত পৃথিবীর বক্ষে পদার্পণ করে', বৈকুণ্ঠের বাতাসে সব দুঃখ-দৈন্যের নিরসন করবেন—কবে সত্যসন্ধি সময়ে, "ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে", কল্কিরূপে ভগবান শেষবার নেমে আসবেন ইত্যাদি।

এ ত গেল শাস্ত্রকথা; কিন্তু মানুষমাত্রকে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তা হ'লে সে একটা সত্যযুগের সংবাদ দেবে, সেটা হয়ত সেই সেদিন পর্য্যন্ত ছিল, এখন আর নাই। কত নরনারীর জীবনে সে সত্যযুগের হাওয়া ব'য়ে গেছে—গাছে গাছে ফুল, মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ, ফুলে ফুলে অপূর্ব্ব সৌরভ, কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীত, কথায় কথায় হাসি ভুবন ব্যাপিয়া রূপরসগন্ধ ও গানের উৎসব, জগৎটা আনন্দময় কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠ—সে একটা যুগ এসেছিল চলে' গেছে। যার আসেনি সেই হতভাগ্য কেবল আসবে বলে', অনাগতের প্রতীক্ষায় বসে' আছে।

ছোট-বড় সব কথায়, পুরুষ ও নারী এই সত্যযুগের সঙ্গে তুলনা করে' বর্ত্তমানের সমালোচনা করে। আহা আর কি সেদিন আছে? কিন্তু সেদিন কোন্ দিন, কবে এসেছিল, কবে চলে' গেছে, এ প্রশ্ন করলে সকল মানুষ একটা স্থির উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু অন্তরের অন্তরে বোঝে "তে হি নো দিবসা গতাঃ"।

যদি কেউ তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে তা হ'লে বুঝতে পারে—যে শৈশব গিয়ে যখন কৈশোর এসেচে—যৌবনের বার্ত্তা নিয়ে, উষার রাগ যেমন দিনের আলোর বার্ত্তা নিয়ে আসে—তখনই তার জীবনের সত্যযুগের সূচনা হয়েচে। যখনই তার এই দেহরূপ দেবমন্দির সুগঠিত সুন্দর হয়ে উঠেচে, আর সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতা জাগ্রত হয়েচেন তখনই তার সত্যযুগ এসেচে। এই বিশ্বচরাচর তখন তার চক্ষে নিষ্পাপ, জরাব্যাধির বিভীষিকা তার সরল সতেজ কল্পনার বাহিরে, দুঃখ-শোক তার ভৃত্য; নদীর কলনাদ, পাখীর কলধ্বনি, বায়ুর নিঃস্বন, সকলই সুমধুর সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত; তার সাহস তখন অপরিমিত, তার বল তখন সকল বিঘ্ন-বিপত্তিকে ছাড়িয়ে উঠেচে, তার বুকের প্রশস্ত বিস্তারের মধ্যে সে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে স্থান দিতে পারে—এই তার সত্যযুগ, এই তার স্বর্গ, তার বৈকুণ্ঠ।

তারপর তার দেহের তেজ যখন নিভে আসে, তার রক্তের গতি যখন মন্থর হয়, তার হৃদয়ের বিস্তার যখন কুঞ্চিত হ'য়ে আসে, তখনই তার সত্যযুগের অবসান হয়ে. ত্রেতা দ্বাপর ক্রমে কলি এসে উপস্থিত হয়;—বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সন্দেহ, সাহসের পরিবর্ত্তে ভয়, সহৃদয়তার পরিবর্ত্তে স্বার্থ, চরিতার্থতার পরিবর্ত্তে আশা এসে তাকে ক্ষুদ্র নিস্তেজ করে' ফেলে। বৎসর গুণে এ সত্যযুগের নির্ণয় হয় না; কার কোন্ বয়সে পরিপূর্ণ দেহ মন ফুটে উঠবে কেউ বলতে পারে না, আর কতদিনই বা প্রস্ফুটিত থাকবে তা'ও কেউ বলতে পারে না। কারও কারও এই যৌবন এই সত্যযুগ আসে, আর যায় না; স্থির যৌবনের কথা গল্প নয়, অনন্ত মহাপুরুষগণের সত্যযুগের অবসান হয় না—তাঁরা চিরযৌবন ভোগ করেন—একথা আমি মানি। কিন্তু সকলের কি এই সত্যযুগ

আসে? না, তা আসে না; যাদের আসে না, তারাই সুদূর অতীতে, না-হয় তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতে, তাদের সত্যযুগকে স্থাপন করে, আর বর্ত্তমানকে দু'দিনের লীলাখেলা বলে' উপেক্ষা করে।

আমার মতে সত্যযুগের এই প্রকৃত Psychology. মানুষের মত মনুষ্যসমাজেরও সত্যযুগ এই রকমেই আসে যায়—সমাজদেহের যৌবনই তার সত্যযুগ—সে যুগ কোনো সমাজে এসেছে, কারও আসে নি; কারও এসেছিল, আবার হয়ত আসবে; কারও চিরদিনের জন্য চলে' গেছে—তার পথ চেয়ে থাকাই সার হবে—কারও বা স্থির-যৌবন—চিরদিনই থাকবে।

আমি কমলাকান্ত আমার ইচ্ছানুরূপ স্বর্গ আসে যায়—যখন আমার মৌতাত তখনই যৌবন, তখনই সত্যযুগ—যখন খোঁয়ারী তখনই কলি—যখন আফিমের কৌটা খালি, তখনই ঘোর কলি।

৩রা পৌষ, ১৩৩০

৩৫

আগে-পিছে

বিচি থেকে গাছ, কি গাছ থেকে বিচি, ডিম্ থেকে মুরগী, কি মুরগী থেকে ডিম্—এ হেঁয়ালীর আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হ'ল না। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছে সব সময় ঠিক করে' উঠতে পারা যায় না বলেই দুনিয়ায় বহুত জটিল প্রশ্নের আজও উত্তর মিলল না। আফিম খেলে তারপর মৌতাত, আফিম না খেলে তারপর বেয়াড়া, এ পারম্পর্য্যটা যত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য সেই রকম যদি আমাদের জোটপড়া শতগ্রন্থি জীবনরূপ সূতার নুটিতে (tangled skein of life) একটা স্পষ্ট পারম্পর্য্যের সন্ধান মিলত অর্থাৎ 'খাই' পাওয়া যেত, তা হ'লে জীবনটা মৌতাতীর জীবনের মতই সরল সহজ স্পষ্ট হ'ত, তার কোন ভুল নেই।

কিন্তু এই আগে-পিছের সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না বলে' পদে পদে গোল বাধচে। দেশের যাঁরা মাথা তাঁরা বলচেন—দেশের লোক পেট ভরে' খেতে **পাচ্চে** না, অতএব আগে দেশের লোকের উদরান্নের ব্যবস্থা কর তারপর অন্য কথা। আগে ক্ষিদের উপায় কর তারপর আর কিছু—যাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি হ'য়ে লোকের ট্যাঁকে পয়সা হয়, তার ব্যবস্থা কর, তা হ'লেই ক্ষিদে মিটবে আর কোন দুঃখ থাকবে না। এটা মাথাওলাদের কথা হ'লেও—আমি স্থিরমস্তিষ্কের **কথা** বলে' গ্রহণ করতে পারলাম না।

আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর, ক্ষিদে পেলে আমাদের দেশের লোক কি করে? আমি বলব—"খাই খাই করে" এবং ঘরে যদি খাবার থাকে ত খায়; না থাকে ত শুকিয়ে মরে—কপালে হাত দিয়ে—যেমন মৌতাতী লোকের যখন খোঁয়ারী ধরে, তখন তারা হাই তুলতে থাকে এবং কৌটায় যদি অহিফেন থাকে তা হ'লে উহা বদনে দেয়। যদি না থাকে ত ধনুষ্টঙ্কার হ'য়ে মরে। আফিমের চাষ করতে লেগে যায় কি? চাষী তবে না খেতে পেয়ে চাষ করতে যাবে কেন? পেটের ক্ষিদেয় যার নাড়ী শুকিয়ে যাচ্চে তার চাষ করতে যাওয়াটা বুঝি খুব সহজ কথা? কোমরে বল থাকলে তবে ত চষবে, না কোমরে বল না থাকলেও চষতে চষতে কোমরে বল হবে—কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছে? খাওয়া না চষা?

কেউ কেউ বলেন, আমাদের এই অজ্ঞানান্ধ-তমসাচ্ছন্ন দেশে আগে জ্ঞানের আলো বিকীরণ কর—কুসংস্কারের পাহাড় কেটে সমভূমি করে' দাও, তবে যদি জ্ঞানের চাষ হয়—বিজ্ঞানের ফসল ফলে! কিন্তু কেউ বোঝে না আলো জ্বাল্‌লেই অন্ধকার দূরে যায়—জ্ঞানের বাতি জ্বাল্‌লেই অজ্ঞান তিমির অপসারিত হ'য়ে যায়। কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞানের বাতি জ্বলে কিসে? সব সেঁতিয়ে মিইয়ে রয়েছে—কত ঘর্ষণ করা যাচ্চে, জ্ঞানের দেশলাই জ্বলচে না—কত আঘাত করা যাচ্চে, চক্‌মকির ভিজে শোলায় আগুন ধরচে না—সে উত্তাপ কোথায়, সে তেজ কোথায়, যে এই ভিজে শোলাকে শুকিয়ে দিয়ে জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গপাতে প্রোজ্জ্বল করে' তুলবে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছে? যে দাবানলে কাঁচা কাঠও ধরে' উঠে গন্‌গন্ করতে থাকবে সেটা আগে, না স্বধু নীরস জ্ঞানের বিদ্যাপীঠে পাঠ মুখস্থ করা আগে?

কেউ বলবেন অসভ্য জাপান দেখ, অহিফেনসেবী চীন দেখ, ক্ষুদ্র আফগানিস্তান দেখ, (প্রতীচ্যের দিক নাই বা দেখলে) জ্ঞানের সিদ্ধ মন্ত্রবলে তারা আজ কত বড় হয়েছে। কিন্তু ঠিক ভেবে দেখ দেখি মূল সূত্র জ্ঞান থেকেই কি না, জ্ঞান বিজ্ঞানের 'মার্তণ্ড ময়ূখমালা" যে অজ্ঞান তিমির নাশ করে' দেশটাকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে' তুলেচে, তার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না;—জাপান স্বাধীন, চীন স্বাধীন, আফগানিস্তান সম্প্রতি স্বাধীন হয়েচে। সেটা বুঝি কিছু নয়? তুর্কী যতদিন পরাধীন ছিল, ইজিপ্ট যতদিন পরাধীন ছিল, আয়র্লণ্ড যতদিন পরাধীন ছিল, রুষিয়া যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন তাদের বল বুদ্ধি, চেতনা, চেষ্টা—মৃতের মত জড়ের মত ছিল কি না। ততদিন তাদের জ্ঞানলাভের চেষ্টা, জ্ঞান বিকীরণের প্রয়াস, ব্যর্থ, খর্ব্ব, নিষ্ফল হয়েছিল কি না। তবে কোন্‌টা আগে? শেখা আগে, না শেখবার স্বাধীনতা আগে? কাজ আগে, না কাজের স্বাতন্ত্র্য আগে? চষা আগে না ক্ষেত্র আগে?

তাতেও কেউ কেউ বলবেন শিক্ষা না থাকলে পরস্পরে মিলবে কেন? পরস্পরে বোঝাপড়া হবে কেন? পরস্পরে ভাবের, চিন্তার ঐক্য হবে কেন? আদান-প্রদান চাই, বোঝাপড়া চাই, ঐক্যও চাই—কিন্তু কেউ দেখাতে পার যে, পৃথিবীর কোনও রাজ্যে আগে শিক্ষা, আগে স্কুল মাষ্টারের পাঠ শেষ করে', কোনও পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জ্জন করেচে। আমি দুটা পরাধীন জাতির কথা বলব—প্রথম ফ্রান্স, ফ্রান্স বুরবঁ রাজার কবলে যখন চর্ব্বিত নিষ্পেষিত হচ্চে, ফ্রান্স তখন পরাধীন ও নিরক্ষর; রুষিয়া যখন জারের নির্ম্মম শাসনে শাসিত অর্থাৎ হস্তপদ বদ্ধ, তখন রুষিয়া পরাধীন ও নিরক্ষর। ফ্রান্সের

বা রুষিয়ার নরনারী কি তাদের ঘাড়ের জোয়ালটা নামাবার জন্য স্কুল মাষ্টারের শরণাগত হয়েছিল? ফ্রান্সের বা রুষিয়ার নিপীড়িত নরনারী কি যথাক্রমে রুশো ভলত্যার হজম করে’, বা ম্যার্কস্ বা কুরোপাট্‌কিনের theory হজম করে’, তবে বাস্তিল ভাঙ্গতে অগ্রসর হয়েছিল—না Kronstadt দুর্গ অধিকার করে’ বসেছিল? আমি জানি তা করে নি, কেননা ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব্বে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ছিল, রুষিয়ারও তাই। আর আমার বিশ্বাস নিরক্ষর ছিল বলেই অত বড়, অমন বিরাট কার্য্যটা এক কথায়, সহজ বুদ্ধিতে করে’ ফেলেছিল—পড়াশুনা থাকলে হয়ত তত্ত্বজ্ঞান আসত, ইহকাল ফেলে, পরকাল নিয়েই কাল কাটাত, আর সর্ব্বধর্ম্মের মূল আধা সত্যটাকে, অর্থাৎ “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ”, এই কথাটা আঁকড়ে ধরে’ থাকত। আমি এত বড় কথাটা বলে’ ফেল্লুম হয়ত লোকে আমাকে ছিছি করবে—কিন্তু আমার তা’তে ব’য়ে গেল। আমি বলি মার খেয়ে চুপ করে’ থাকা ভগবদভিপ্রেত তখনই হবে, যখন সেই মারাটা ভগবৎপ্রেরণা হবে; আমার অহিংসা তখনই ধর্ম্ম হবে যখন আমার প্রতি যে হিংস হ’য়ে উঠেচে সে ভগবদভিপ্রায় অনুযায়ীই হিংস হয়েছে। তার মারটা যদি ভগবানের অনভিপ্রেত হয়, তবে আমার প্রতিমারটা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত হবে। সুতরাং অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ তখনই—যখন হিংসাটা পরমো ধর্ম্মঃ, নহিলে নয়।

এ কথায় লোকে আমায় গালি দিক তা’তে আমার এসে যায় না, কেননা গালি যুক্তি নয়, যুক্তির অভাবজনিত গাত্রদাহের ঝাঁজ। সে ঝাজ আমি সহ্য করতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যুক্তির তহবিল খালি হ’য়ে গেলেও যে মানুষ তর্ক করে সেটাই অসহ্য। তারা তথাপি তর্ক

করে' বলবে—এ যে destructive philosophy কিন্তু চাই constructive programme. কিন্তু আমাকে কেউ এ পর্য্যন্ত দেখাতে পারলে না যে, destroy না করে' কেউ construct করতে পেরেচে। জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে দেখতে পাচ্চ – আগে destruction পরে construction —শিশু হাত-পা নেড়ে শরীর-ধাতুর ক্ষয় করচে, তারপর ক্ষয় জনিত ক্ষুধার সৃষ্টি হচ্চে—তারপর মাতৃবক্ষে সঞ্চিত অমৃত-পান করে' ক্ষুধা নিবৃত্তি—সঙ্গে সঙ্গে construction আরম্ভ হচ্চে—ছেলে শশিকলার ন্যায় বাড়চে। ক্ষয় যদি না হ'ত, ক্ষিদে হ'ত না, ক্ষিদে না হ'লে ছেলে কাঁদত না, ছেলে না কাঁদলে মাও স্তন্য পান করাতেন না, স্তন্য পান না করলে ছেলে বাড়ত না। অতএব ক্ষয়, ক্ষুধা, খাদ্য ও গঠন পর পর চলেচে – এ পারম্পর্য্যের কি ব্যত্যয় আছে? তবে রাম রাম বলতে বলতে মধ্য পথে মরা মরা শুনায় বটে, কিন্তু আদি অন্ত বিচার করে' দেখলে রা-এর পর ম—যার নাম আনন্দ, ম-এর পর রা নয়, যার নাম মৃত্যু।

তোমরা হিন্দু পরজন্ম মান, (ইহজন্মটা না মানলেও মানতে বাধ্য হও) তোমরা দেখচ মৃত্যু না থাকলে কি জন্ম হ'ত? মানুষ মরে তবে জন্মায়, আগে মরা তবে জন্মান, যাকে বিদেশী দার্শনিক death-birth বলেচেন। এই death হয় lest one good custom should corrupt the world. তবে মৃত্যুতে এত ভয় কেন? পুনর্জ্জন্ম যদি লাভ করবে ত আগে মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম কর তবে ত বাঁচবে? যদি মৌতাতের মৌজ উপভোগ করবে ত একটু খোঁয়ারীর কষ্ট ভোগ কর!

বুদ্ধিমানেরা তখনও তর্ক করে' বলবেন যে এ সব তত্ত্বকথা নিরক্ষর

লোক কি করে’ বুঝবে? তা হ’লেই ত পাকে প্রকারে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানতে হ’ল।

আমি বলি শিক্ষা দিয়ে যদি স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করাতে হয় ত সে অসাধ্য সাধনা; তুমি কি শিক্ষা দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাফ্রীকে বুঝাতে পেরেছিলে স্বাধীনতা ভাল? সে ভয়েই আকুল হয়েছিল— তার দাসত্ব গেলে সে কি বাঁচবে! তুমি স্বাধীন, কত কথাই বলেছিলে—স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা অমূল্য নিধি স্বাধীনতা পরম কল্যাণের হেতু—সে সব বয়েৎ কি সে কাফ্রী বুঝেছিল? কেন বোঝেনি? স্বাধীন না হ’লে স্বাধীনতার মহিমা ঠিক বোঝা যায় না; যেমন আফিং না খেলে আফিমের মহিমা বোঝান যায় না, ঠিক সেই রকম। তবে এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, যে-বুদ্ধি নিয়ে অশিক্ষিত মানুষ আপনার ভালমন্দ বিচার করে, ক্ষিদে পেলে খায় (খাবার থাকলে), অক্ষিদেয় খায় না, অশিক্ষিত হ’লেও তার যে সহজ বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে তুমি ধর্ম্মের গুরু, তাকে ইহ পরকালের সম্বল স্বরূপ ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বকথা, এবং নিজে বোঝ আর নাই বোঝ, সুরলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোকের গল্প শোনাও, যে সহজ বুদ্ধিতে বেচারা দুঃখ হ’লে কাঁদে, সুখে উৎফুল্ল হয়, তার ক্ষুদ্র জীবনের লাভ-লোকসানের হিসাব রাখে—সেই বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে যদি বোঝাতে চেষ্টা কর ত সে বুঝবে বই কি। প্রাথমিক শিক্ষা আগে চাই বলে’ হাম্‌লাতে থাকলে মুক্তির দিনকে নির্ব্বাণ-মুক্তির সমসাময়িক করে’ তোলা হবে মাত্র। তাই বলি আগে-পিছের তত্ত্বটা আগে মীমাংসা করে’ নাও, পিছে যা করবার তা কোরো।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩১

৩৬

মকরধ্বজ

মানুষ ব্যাধি জরা মৃত্যুর বেড়াজালে বেষ্টিত; এ ত্রয়ীর অপেক্ষাও অধিকতর বেদনার নিদান যে পেটের জ্বালা, তারও জ্বালায় নিশিদিন জ্বলে মরচে। এখন মানুষ করে কি? উদর পুরে খেলেও আবার ক্ষিদে পায়, যত সাবধানেই থাক না কেন কোথা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি এসে ধরে; তার হাতও যদি এড়ান যায় ত—

কহে শুভ্রকেশ শিরে
এই ত ফুরাল দিন

—জরা আসে, গাছের পাতা রাঙ্গিয়ে যেমন শীত আসে, কালমেঘ সাদা করে' যেমন শরৎ আসে, তেমনি মাথার চিকুর শুভ্র করে' জরা হানা দেয়; তারপর নদীর মোহানায় যেমন নীলাম্বুর জলোচ্ছ্বাস এসে নদী আর সমুদ্রের পার্থক্য মিলিয়ে দেয়—তেমনি জীবন মরণের মোহানায় মেশামিশি হ'য়ে সব একাকার হ'য়ে যায়। কিন্তু কালাপানির কিনারা পর্য্যন্ত প্রতিদিনের ক্ষিদে পিছু পিছু যায়—তার হাত একদণ্ডও এড়াবার যো নেই। অসহায় মানুষ করে কি?

যেটা সইতেই হবে তার আর উপায় কি? কিন্তু মানুষ উপায় খুঁজেচে—যুগে যুগে খুঁজেচে, দেশে দেশে খুঁজেচে—কেউ বলে পেয়েচে, কেউ বলে পায়নি।

সেকালের মুনি ঋষিরা পাকা হরিতকীর সন্ধান করেচেন, পাকা হরিতকী খেলে নাকি খাওয়ার দায় থেকে, ক্ষিদের জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ বনে, কে, করে, পাকা হরিতকী পাবে তার ত ঠিকানা নেই; সবারই ভাগ্যে মেলে কি না মেলে! তাই মানুষ মৃতসঞ্জীবনী সুধার (Elixir of Life) তল্লাস করেচে; কেউ বলে পেয়েচে কেউ বলে পায়নি—এ সন্দেহের জ্বালা ক্ষুধার জ্বালাকে বেশী করে' তীব্র করে' দিয়েচে মাত্র। কেউবা ফল বা জলের উপর নির্ভর না করে', নাক টিপে পাহাড়ের ধারে বসে' গেছে—পদ্মাসনে—জিহ্বা তালুসংলগ্ন করে',—ভ্রূমধ্যদৃষ্টি হ'য়ে—নিরুদ্ধ-শ্বাস হ'য়ে। উদ্দেশ্য, আর খেতে হবে না, আর ব্যাধির কবলে পড়তে হবে না, আর জরা এসে কেশ ধরে' টানবে না—মহিষপৃষ্ঠে ধর্ম্মরাজ এসে অবশ্যদেয়-কর আদায় করবেন না। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি বলেই আমার ধারণা।

পাকা হরিতকী কার মিলেচে জানি না, মৃতসঞ্জীবনী কোন্ বৈজ্ঞানিকের ভাঁটিখানায় চোলাই হয়েচে বা হবে কে জানে, নাক টিপে কে সপ্তচিরজীবীর ন্যায় যুগে যুগে বেঁচে থাকবে তা জানি না; কিন্তু যদি থাকে তা হ'লে তারা কৃপার পাত্র তার ভুল নেই। নব নব রূপ রস গন্ধের, নব নব মন-প্রাণের সুরভিত ভাবতরঙ্গের, পতন ও উত্থানের, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের পর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে চির পরিবর্ত্তনশীল জগতের panorama উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে—অমর মানুষ সে রসের গন্ধের রূপের ভাবের সুরের সঙ্গে আপনার অমর অজর, সুতরাং অচল অচঞ্চল জড় জীবনের তন্ত্রীগুলিকে এক সুরে বাঁধতে পারবে না—তার অমরত্ব মরণহীন বিষাদ ও বিজনতার চাপে দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠবে—তখন তাকে বলতে হবে—কেড়ে নাও আমার অমরতা, আমাকে মরতে দাও, বাঁচতে

দাও, পুরাতন মহাস্থবির অমরতার হাত থেকে উদ্ধার কর, নবজীবন লাভ করতে দাও।

মানুষ আপনার জীবনে এই ক্ষুধাহীন জরাব্যাধিহীন অমরতার কামনা করেচে—মহাপুরুষগণ, যাঁদের "বসুধৈব কুটুম্বকম্", তেমনি জাতির জীবনে, মনুষ্যগোষ্ঠীর জীবনে—পাকা হরিতকী বা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করে' অমরত্ব লাভের উপায় করে' দিয়েচেন। কেউ দিয়েছেন নিষ্কাম সেবাব্রত, কেউ দিয়েচেন অহিংসা, কেউ দিয়েচেন খদ্দর, কেউ দিয়েচেন ভাঙ্গনভরা গঠন-পদ্ধতি, কেউ দিয়েচেন পতিতোদ্ধার, কেউ দিয়েচেন ধর্ম্ম-সমন্বয়, কেউ দিয়েচেন কর্ম্ম-সমন্বয়, কেউ দিয়েচেন বিশ্ব-সমন্বয়, বিত্ত-সমন্বয়—যার যেখানে আটকেচে বলে' মনে হয়েচে তিনি সেইখানেই উপযুক্ত স্নেহ পদার্থের প্রয়োগ দ্বারা এই জটিল বিশ্বচক্রের বিষম গতিকে সমতা প্রদান করতে চেষ্টা করেচেন। মকরধ্বজের গুণকীর্ত্তনে কবিরাজ মহাশয় যে-কথা বলে' বিপন্ন মানুষকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেয়েচেন,

বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়স্তম্ভনঃ।
সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুরযোগপঞ্চাননঃ॥

—পলিত কেশ, গলিত পেশী, বিদূরিত করে' বয়ঃস্থৈর্য্য সম্পাদনকারী, সকল রোগের খণ্ডনকারী এই মকরধ্বজ মানুষকে ক্ষয়ের, বার্দ্ধক্যের, জরার হস্ত হতে রক্ষা করে, যে যে-বয়সে সেবন করবে সে সেই-বয়সেই থাকবে,- এই যে আশ্বাস-বচন উচ্চারণ করেচেন—তা'তে মানুষ মরচে সমানই, জরাব্যাধির আক্রমণ সমানই সহ্য করচে, আর শেষে মরে' বাঁচচে। মহাপুরুষগণ ব্যাধিমন্দির এই সমাজদেহকে নিরাময় করবার জন্য যে মকরধ্বজের ব্যবস্থা করেচেন—তা'তেও সমাজদেহের সকল ব্যাধির নিদান যে ক্ষুধারূপ মহাব্যাধি এবং তার আনুষঙ্গিক যত উপসর্গ, তার

কোনটারই এ পর্য্যন্ত নিরাকরণ হয়নি। চিকিৎসকগণ নিজ নিজ "যোগপঞ্চাননে"র যে রকম গুণকীর্ত্তনই করুন, সনাতন দুঃখের **centre of gravity** যেখানে ছিল সেইখানেই আছে,—যে না খেয়ে মরছিল সে ঠিক না খেয়েই মরচে—যে খেয়ে মরছিল সে ঠিক খেয়েই মরচে। অতএব আমি স্পষ্টই বলচি, কবিরাজ মহাশয়ের তথা বিশ্ববৈদ্য মহাপুরুষগণের মকরধ্বজ বা panaceaতে আমার বিশ্বাস নেই; আমি যে মহৌষধি লাভ করেচি তাতে আমার এখনও বিশ্বাস আছে—পরে কি হবে জানি না—এতে তুমি সুখে বাঁচবে এবং দরকার হ'লে সুখে মরতেও পার; মুনিগণবাঞ্ছিত ইচ্ছামৃত্যু তোমার হাতে বা কৌটায়, কারণ আমি কবিবাক্য মানি—

Happy men that have the power to die.

১১ই ভাদ্র, ১৩৩১

৩৭

পৈতৃক

পৈতৃক মানেই পাকা কায়েমী ; যথা পৈতৃক ভিটে, পৈতৃক স্বত্ব, পৈতৃক দাবী ইত্যাদি—বাপ-পিতামহ যে-ভিটে পবিত্র ক'রে' গেছেন, সুখে-দুঃখে যেখানে তাঁদের জীবন-নাটকের অভিনয় হ'য়ে গেছে—সে রঙ্গমঞ্চ যে কত মধুর, কত সরস তার কি ইয়ত্তা আছে ;— উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই জমিজমা ঘরবাড়ির উপর যে দাবী তার কি কোন সংশয় থাকে—সে কায়েমী দাবীর নড়চড় করে কে ?

কিন্তু সব পৈতৃক উত্তরাধিকার খুব পাকা হ'লেও, মধুর বা মনোজ্ঞ না ও হ'তে পারে—হয়ত বা পাকা ও কায়েমী বলেই অশেষ দুঃখের হেতু হয় !

চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে, যে-ব্যাধি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপিতামহদের নিকট হ'তে লাভ করা যায়, সে পৈতৃক ব্যাধি পৈতৃক ভিটের চেয়েও কায়েমী—দেনার দায়ে ভিটে বিকিয়ে যেতে পারে, উত্তমর্ণের জবরদস্তিতে উদ্বাস্তু হ'য়ে যাওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কিন্তু পৈতৃক ব্যাধির কবল থেকে বাহির হ'য়ে আসা কোন ধন্বন্তরীর ঔষধে সম্ভবপর নয়। ভিটে বাহিরের জিনিষ, বে-দখল হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু যে ব্যাধির বীজ বা প্রবণতা, রক্তের সঙ্গে পৈতৃক দেহ হ'তে আমার দেহে এসে পৌছবে, সে বীজ অঙ্কুরিত হবেই হবে,

সে প্রবণতা প্রকট হ'য়ে উঠবেই উঠবে; পৈতৃক মন ও পৈতৃক দেহের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে এমন স্মৃতিশাস্ত্রের পাঁতিও কেহ দিতে পারে না।

কমলাকান্তের যদি বংশ থাকত, তা হ'লে তার বংশধর যে কমলাকান্তের শূন্য অহিফেনের আধারের সঙ্গে তার আধিব্যাধিপূর্ণ শোণিত নিয়ে পৈতৃক আধিব্যাধিরও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হ'ত তার কোন সংশয়ই নাই। অর্থাৎ তার বংশাবতংস অহিফেন সেবন করত, কাজের মত কাজে সম্পূর্ণ অনাস্থাবান হ'ত, একটা প্রসন্ন খুঁজে নিয়ে, তার অন্ধ বিশ্বাসের সহায়তায়, তারই স্কন্ধে ভর করত, তার কোন ভুলই নেই। তবে দপ্তর লিখত কি না সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকত। কেহ কেহ বলেন দপ্তর লেখাটা অহিফেন সেবনেরই sequelae অথবা উপসর্গ, ওটা নিষ্কর্ম্মারই কর্ম্ম, সুতরাং কমলাকান্ত-বংশধরও দপ্তরের বোঝা বাড়িয়ে যেত।

আমি কিন্তু অন্য রকম ভাবি; দপ্তরটা আমার প্রাণ, আমার সত্তা, প্রাণটা উত্তরাধিকার সূত্রে নেমে আসে না—নেপোলিয়ানের পুত্র নেপোলিয়ান হয়নি, বিদ্যাসাগরের পুত্র, বিদ্যাসাগর ছেড়ে, বিদ্যার খালবিল পর্য্যন্ত হয়নি। প্রাণের উত্তরাধিকার দেহ অবলম্বন করে' নামে না; দপ্তরে অধিকার একমাত্র আমারই, জন্ম জন্ম আমারই থাকবে, তবে কোন্ জন্মে কোথায় যাব তার সন্ধান জানি না।

মোট কথা, পিণ্ডদান করে' পুত্র পিতার ধন হরণ করে, পিতার শোণিতের সঙ্গে তার ব্যাধি আ-হরণ করে, কিন্তু কোনদিনই তার প্রাণ, তার সত্তার বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় না। বাপের মত ছেলে হওয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়; যদি হ'ত তা হ'লে আদম ও হবা, মানুষের আদি

জনকজননীর replica ভুবনময় ছেয়ে পড়ত—সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার হ'ত তা সহজেই বোঝা যায়। তা না হ'য়ে, যত মানুষ তত প্রাণ, তাই এই বিপুল বৈচিত্র্য, এই নিত্যনব ভাবের, কার্য্যের, বাক্যের স্ফুরণ!

আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যেপে এই শাশ্বত আইনের প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি; আমি দেখতে পাচ্ছি পূর্ব্বতন কমলাকান্তগণের প্রাণটা ভারতবাসী পায়নি—তাঁদের আহিফেন সেবাটি পেয়েছে। যাকে আমরা ধর্ম্ম বলে' গর্ব্ব করি সেটাকে বিচক্ষণ লোকে অহিফেন বলে' ধরে' নিয়েচে—La Religion c'est l'opium du peuple এই বাণী আজ ঘোষিত হচ্ছে, এবং এই বাণী অন্ততঃ দুটা সজীব জাতির মধ্যে সত্য বলে' গৃহীত হয়েছে। আমরা ভারতবাসী সেই অহিফেন-সেবনরূপ উত্তরাধিকার খুব পাকা রকম লাভ করেছি—সেই অহিফেনের মৌতাতকে বলি ধর্ম্ম-প্রাণতা, এবং খোয়ারিকে বলি ধর্ম্ম-পিপাসা, সেই আফিমের ব্যবসায়ীকে বলি গুরু ও পুরোহিত, সেই আফিমের দোকানকে বলি মন্দির ও মঠ! ভিন্ন নামকরণ করলে বস্তুর বস্তুত্ব বদলায় না, লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটান যায় এই মাত্র।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই আফিমের মৌতাতে আমরা ঐহিক ছেড়ে পারত্রিকের প্রতি অধিক আস্থাবান্। এই পারত্রিক মানে বৈতরণীর পরপার। পারত্রিকের আর একটা অর্থ আছে—অর্থাৎ এই ঐহিক জগতের অনাগত অবস্থা, আমার পর আমার পরজন্মের অর্থাৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রগণের শুভাশুভ। সে অর্থে পারত্রিক কথাটা বুঝি না। বুঝি এ কয়টা দিন কোন মতে গোঁজামিল দিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, বৈতরণী পারে যাতে শিবলোক বা ব্রহ্মলোকের দরজা আমার জন্য খোলা থাকে তা'র ব্যবস্থা করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই দুর্জ্জয়

গরমে সন্ধ্যাবেলা আমার কুঁড়ের ভিতর যখন মশার ঐক্যতান বাজতে থাকে এবং সেই ঐক্যতানের সঙ্গে সঙ্গে যখন, মধুর সঙ্গে হুলের মত, সৌরভের সঙ্গে কাঁটার মত, মশার কামড় অনুভব করতে হয়, তখন একদিন আমি বলেছিলাম যে,—কি আশ্চর্য্য! আমাদের এই দেশীয় মশক দংশনের জ্বালা হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য চীন দেশীয় বৈজ্ঞানিকের স্মরণাপন্ন হ'তে হয়। তা'তে আমার একজন অনুচর (যিনি পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মরূপী অহিফেনের সেবা করে' এসেছেন) বলেন যে, ইহকালের মশা ক'দিন বা যন্ত্রণা দেবে, আমরা যাতে পরলোকের মশা মাছি তেলাপোকা নিবারণ করতে পারি তারি ভাবনা ভাবছি—কেননা সে অনন্ত জীবনের কথা—সেখানে মশার কামড়ও অনন্ত—তার অন্ত করতে পারাই কাজ। ঐহিক মশক দুটা না-হয় হুল ফোটালেই বা। আমি বললাম—আফিম কি অপূর্ব্ব জিনিষ! তবে ছেলেটা আমার সঙ্গে রহস্য করলে কি না ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আর একটি জিনিষ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। সেটা আফিমের অধীনতার মতই কায়েমী, এবং অন্য সকল পৈতৃক ব্যাধির মতই পাকা। তার নাম পরাধীনতা; এই পরাধীনতা-ব্যাধি যে স্বোপার্জ্জিত নহে, অহিফেনের সঙ্গেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তা কেহ অস্বীকার করলে আমি শুনব না;—তার সাক্ষ্য ইতিহাস, তার সাক্ষ্য পলাশীর আমবাগান, তার সাক্ষ্য মীরজাফর, তার সাক্ষ্য উমীচাঁদ, তার সাক্ষ্য শ্রীমন্-মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তার সাক্ষ্য অহিফেন-সরবরাহকারী, অহিফেনসেবী মাত্রেই। এমন জ্বলন্ত সাক্ষী মিলে না।

কেহ কেহ বলেন—এই অহিফেন ও অধীনতা কার্য্যকারণ

সূত্রে আবদ্ধ। অহিফেন-সেবনের অবশ্যম্ভাবী ফলই অধীনতা, এবং অধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল অহিফেন-সেবন। সে কথার মীমাংসা আমি করব না,. কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করবে যে, যখন চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী নদীয়ার সিংহদ্বারে হানা দিল, তখন অহিফেন-সরবরাহ-কারীরা লক্ষ্মণসেনকে অহিফেন-সেবনের সৌকর্য্যার্থে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে, সমরক্ষেত্রে না পাঠিয়ে, শ্রীক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিলেন ; এবং যখন পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধ বাধে তখন অহিফেন-সেবাব্রত দেশের লোক, আমার মত বুঁদ হ'য়ে বসে' রইল—এবং যখন সমগ্র দেশটা হস্তান্তরিত হ'য়ে গেল, তখন প্রসন্ন গরুটাকে এ-গোজ থেকে ও গোঁজে বাঁধলে যেমন তার কোন বিকারই লক্ষিত হয় না—তেমনি দেশের কোন লোকের কোন বিকারই লক্ষিত হ'ল না। বরং কতকগুলা লোক নূতন গোহালে এসে নূতন জাবনার লোভে ডাবায় মুখ ডুবিয়ে দিলে।

যারা সেকালে টাকায় দু' মণ চাল পাওয়া যেত বলে' বড়াই করেন, তাঁরা বুঝে দেখবেন যে সে দু' মণ চাল খেয়েও দুকড়ার শক্তি বা বুদ্ধি সঞ্চয় হয়নি ; যাঁরা "আহা সেদিন কি চমৎকারই ছিল" বলে' সে কালের বিরহে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসান, তাঁরা যদি সেকালটির তারিখ নির্ণয় করে' বলেন ত বেশ দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সেকাল যেকালই হ'ক তার জন্য রোদন করবার কোন কারণই নেই ; তার প্রধান হেতু এই যে "সেকাল"ই একালের পরাধীনতার জন্মদাতা ; আমরা যে আজ দাসের জাতি তা আমাদের পিতৃপুরুষগণ দাস ছিলেন বলেই—আমাদের দাসত্ব পৈতৃক। "সেকালে"র অপূর্ব্ব অবদান অহিফেন ও অধীনতা, উভয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৩

৩৮

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্

এক যে ছিল রাজা। রাজা সভাপণ্ডিতকে বল্লেন—পণ্ডিতজী, এমন কোন বাক্য আছে যা সুখে দুঃখে, রোগে অরোগে, মানে অপমানে, সর্ব্ব অবস্থায় সুপ্রযুক্ত হয়?

পণ্ডিতজী বল্লেন—রাজন্, সে বাক্য এই "য়্যাসা দিন নেহি রহেগা"। দুঃখীকে বলুন, সে বুকে বল পাবে; সুখীকে বলুন, সে সুখের মোহে আত্মহারা হবে না; রোগীকে বলুন, আশায় তার বুক ভরে' উঠবে; অরোগীকে বলুন, সে সাবধান হবে; মান-গর্ব্বিতকে বলুন, তার চোখ ফুটবে; অপমানিতকে বলুন, তার বিক্ষুব্ধ বক্ষে পদ্মহস্ত বুলানর কাজ হবে।

রাজা খুব মোটা রকম পারিতোষিকের হুকুম দিলেন।

পণ্ডিতজী সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রযুজ্য আর একটা কথা বলতে পারতেন—সেটা এই "কালে কালে কতই হবে!" আফিমের ভরি দু' সিকে থেকে দশ সিকে হয়েছে—কালে কালে কতই হবে। মেয়েমানুষে বাইসিকেল্ চড়চে—কালে কালে কতই হবে! ছেলেরা উড়ানি ছেড়ে দিয়েছে—কালে কালে কতই হবে! ব্রাহ্মণ রাঁধুনি হয়েচে, আর শূদ্র বেদাধ্যয়ন করচে—কালে কালে কতই হবে! এক দিনের পথ এক ঘণ্টায় যাওয়া যাচ্চে—কালে কালে কতই হবে!

আশ্বিন মাসে কচি আঁবের ঝোল খাওয়া যাচ্চে—কালে কালে কতই হবে! বহু বিবাহ উঠে গেচে—কালে কালে কতই হবে! বিধবার বিবাহ হচ্চে—কালে কালে কতই হবে! স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে' অপরাধী হচ্চে—কালে কালে কতই হবে! প্রহৃতা সহধর্ম্মিণী কেরোসিনে পুড়ে' মরচে—কালে কালে কতই হবে!

কোন স্থরসিক স্থক্ষ্মদর্শী চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন গাছের মগডালে দুটা বাঁদর বসে' আছে, স্ত্রী আর পুরুষ। গাছের তলা দিয়ে আর দুটা. বাঁদরের মত কিন্তু বাঁদর নয়, তবে বাঁদরের বংশধর বটে, হাতে-পায়ে না চলে' খাড়া হ'য়ে দুপায়ে চলে' যাচ্চে—উলঙ্গ, একখানা মৌমাছির চাক চুষতে চুষতে। বৃক্ষশাখারূঢ় শাখামৃগ তার আজানুলম্বিত বাহু প্রসারিত করে' ঐ দুটা নূতনতর জীবকে দেখিয়ে, বধূকে বলচে-কালে কালে কতই হবে! দ্বিতীয় চিত্রে চিত্রকর এঁকেচেন—সেই উলঙ্গ দম্পতি পর্ব্বতের গুহাদ্বারে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে' দেখাচ্চেন, তাঁদেরই অধঃস্তন পুত্রকন্যা ভাল্লুকের চামড়া পরিধান করে' তীর ধনু হাতে মৃগ শীকার করতে যাচ্চে। উলঙ্গ পিতামহ ও পিতামহী বলচেন—কালে কালে কতই হবে!

ছবির সংখ্যা যত খুসী বাড়িয়ে দেওয়া যায়, ঋক্ষচর্ম্মের পর বল্কল, তারপর সুতার কাপড়, তারপর দরজীর পোষাক; পায়ে চলা থেকে অশ্বারোহণ, তারপর শকট ও মোটর ইত্যাদি; গুহা থেকে পর্ণকুটীর, পরে আটতোলা বাড়ী; এবং প্রত্যেক ছবিখানার তলায় লিখে দেওয়া যায়—কালে কালে কতই হবে!

আরও ছবি এঁকে দেখান যায়—জরাগ্রস্ত বুড়োবুড়ীকে চালকুমড়ো করা থেকে তাজমহল তৈরী পর্য্যন্ত—বনভূমিতে শালবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে

নৃত্যশীল পুরুষ ও স্ত্রী থেকে বোধিদ্রুম তলে ধ্যানী বুদ্ধ পর্য্যন্ত—ভাইবোনের পরস্পর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ থেকে আরম্ভ করে' পুরুষ এবং নারীর বহুবিবাহ, পরে সগোত্র consanguinity বর্জ্জন করে' একনিষ্ঠ স্বামী স্ত্রী পর্য্যন্ত—কাঁচামাংস ভক্ষণ থেকে সাত্ত্বিক আহার পর্য্যন্ত—নানা ছবি আঁকা যায় এবং প্রত্যেক ছবির নীচে লেখা চলে—কালে কালে কতই হবে!

কাহাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না বোধ হয়, যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নরনারী ও-কথাটাকে পরবর্ত্তী যুগের নরনারীর প্রতি বিদ্রূপ করেই বলবেন, এবং এই রকম ধাপে ধাপে চলে' যাবে। আর পরবর্ত্তী যুগের মানুষ— আপনাদের উন্নত অবস্থার গর্ব্ব করেই বলবেন—কালে কালে কতই হবে!

মোটের মাথায় বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমগ্র পৃথিবীতে সত্যযুগকে যদি জ্ঞানের যুগ ও প্রকৃত পবিত্রতার যুগ বলে' ধরা যায়, তা হ'লে সেটা অতীতে অবস্থিত না হ'য়ে কোন অনাগত কালের কোলে অবস্থিত বলেই ধরতে হবে; এবং সে সুবর্ণ যুগকে কল্পনা করে' বর্ত্তমানের সকল ত্রুটী সত্ত্বেও, এই আশায় বুক বাঁধা চলবে যে "য়্যাসা দিন নেহি রহেগা"—ইহার অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, পুণ্যতর যুগ আসবে।

অতীত ও বর্ত্তমানকে ঠিক পাশাপাশি রেখে তুলনা করবার উপায় নেই। বৃদ্ধ যাঁরা তাঁরা বলবেন—"আমরা সেকালও দেখলুম আর একালও দেখলুম, অতএব আমাদের কথা শোন—সেকাল আর একাল, স্বর্গ ও নরক।" আমি কিন্তু তাঁদের কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। তাঁরা সেকালটা দেখেচেন সত্য, কিন্তু একালটাকে বেশ দেখতে পাচ্ছেন না। "চাল্‌সে" বলে' একটা চোখের ব্যাধি আছে; তেমনি মনশ্চক্ষুরও "চাল্‌সে" আছে,

astigmatism আছে ; তা'তে স্পষ্ট দর্শন ও অবিকৃত দর্শনের বাধা হয়। তাঁরা যে চক্ষুতে সেকাল দেখেছেন সে চক্ষু, চল্লিশ পার হওয়ায়, তাঁদের নেই ; তাঁদের এখন অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় একদেশদর্শিতা এসেচে, বর্ত্তমানকে তাঁরা খুব ঘোলাটে রকম দেখচেন। বর্ত্তমানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের সংযোগ নেই বলে' তাঁদের দেখার সম্পূর্ণতা হচ্চে না ; 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' একথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে যাকে দেখতে পাইনা সে না জানি কি রকম কিম্ভূত, এটাও খুব সত্য। বৃদ্ধদেব এই দশা হয়েচে।

আমি ৪০ বৎসর পরে, আমার জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলাম ;—বানপ্রস্থের জন্মস্থান দেখার বিধি আছে ; আমি বহুদিন যাবৎ প্রসন্নর বাড়ী বানপ্রস্থ নিয়ে আছি। ৪০ বৎসর আগে আমার চোখ ছিল উজ্জ্বল, কল্পনা ছিল সজীব, আশা ছিল এক বুক, উদ্যম ছিল সীমাহীন, দেহ ছিল ক্ষুদ্র, জ্ঞান ছিল অল্প। আমি আমার ছোট হাত পা দিয়ে, আর উদ্দাম কল্পনা দিয়ে আমার জন্মস্থানের পরিমাপ করেছিলাম। সুতরাং দেখেছিলাম বাড়ীটা কত বড়, উঠানটা মাঠের মত বিস্তৃত ; উঠানে দাঁড়ালে ঘরের পোঁতা ছিল আমার এক বুক, ঘরের দরজা জানলা ছিল উঁচু—আমি পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নাগাল পেতাম না। আর সেই রঙ্গীন কল্পনায়—ছেলেবেলার সহচর সহচরীরা, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা, তাদের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহ কত মধুর রঙ্গীন Mosaic রচনা করে' রেখেছিল। ৪০ বৎসর পরে যখন সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন কোথায় বা সে বিশাল প্রাঙ্গন, আর কোথায় বা সে উচ্চ ঘর বাড়ী ; তারা ক্ষুদ্র হ'য়ে, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে, আমায় যেন চেপে মারবার মত চারিদিকে ঘিরে' দাঁড়াল। খেলার

সাথী যারা বেঁচেছিল—তাদের সে রঙ্গীন উজ্জ্বল লীলাময় চাঞ্চল্য নেই; তারা সব স্থবির, অবনত, ভগ্ন—সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানা, সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষসম্বল অন্ধকারময় কক্ষ, সেই ক্ষুদ্র উঠানের মতই ভগ্ন, নিষ্প্রভ সংকীর্ণ হ'য়ে দেখা দিল। সুধু একটা জিনিষ আমার ছেলেবেলাকার কল্পনাকে ছাড়িয়ে উঠে আমাকেই ক্ষুদ্র করে' দিলে—সেটা উঠানের প্রান্তস্থিত কাঁঠালগাছটি। আমি বড় হয়েছি, আমার হাত পা বড় হয়েছে, তাই যেটা মোটেই বাড়েনি, যা ছিল তাই আছে—তাকে ক্ষুদ্র দেখলাম; আর যে আমার চেয়েও ত্বরিত বেগে বেড়ে উঠেচে—সেই প্রকৃতির জীবন্ত বৃক্ষটি—সেই সুধু আমাকে ক্ষুদ্র করে' দিলে। এই রকম প্রাণময় বর্ত্তমান মৃতবৎ বৃদ্ধদের ক্ষুদ্র করে' দেয়; এবং বৃদ্ধেরা শোধতোলা হিসাবে তাঁদের মৃত অতীতকে বড় করে' বর্ত্তমানকে ক্ষুদ্র করে' দেখেন।

আমার বিশ্বাস যদি আমাদের কালের বুড়ারা তাঁদের যৌবনের কল্পিত রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন, তা হ'লে তাঁদের কল্পিত স্বর্ণপুরীকে নিষ্প্রভ মাটির ঢিবীর মত দেখবেন, কারণ মৌজের চোখে যেটা যতখানি রঙীন দেখায়, সাদা চোখে সেটা ঠিক সেই পরিমাণেই মলিন দেখাবে—আর কল্পনা ও মৌজ মোটের মাথায় একই পদার্থ।

তবে একটা কথা এই যে, যুগে যুগে সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ করে' কৈফিয়ৎ কাটলে, জমায়-খরচে মিলে যাবে। আমার এক ছেলেবেলাকার খেলুনী বলত (তার মা যখন তার মাথার একরাশ চুল নিয়ে বিন্যাস করতে বসতেন) যে, "বেটা ছেলে হওয়া ভাল, বেশ চুল বাঁধতে হয় না,"—(চুল বাঁধাটা যুবতীর পক্ষে এক, শিশুর পক্ষে আর-এক)—এবং পরক্ষণেই বলত—"নাঃ, বেটাছেলে হ'লে আবার

পাঠশালে যেতে হয়—কিচ্ছুই ভাল নয়"। এই যে ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে জীবন চলেছে—এগিয়ে, আরও এগিয়ে, সম্পূর্ণতার দিকে,—তার মধ্যপথে যে-কোন-অবস্থায় দেখা যায়, যত ভাল তত মন্দ, মাতৃজঠরে দুটি যমজ শিশুর মত পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে আছে, ছাড়াছাড়ি নেই। কিন্তু মানুষ চায়, আমার খেলুনীটির মত, সুধু সুখ, তাই সে পায় না; মানুষ চায়, দুঃখের পরিসমাপ্তি, তা' সে হয় না। মানুষ চায় সুধু মলয়ানিল, সুধু হাসি, সুধু জ্যোৎস্না—তা' সে পায় না; মানুষ চায় না চোখের জল, ক্ষিদের জ্বালা, মনের আগুন—তা' সে হয় না।

সুতরাং পণ্ডিতজী রাজার প্রশ্নের উত্তরে একথাও বলতে পারতেন —কারণ সকল যুগে সকল অবস্থায়, একথাও সত্য—যা' চাই তা পাই না। কবি বলেচেন—

The moving sun shapes on the spray
The sparkles where the brook was flowing
Pink faces, plightings, moonlit May
These were the things we wished would stay
But they are going.
Seasons of blankness as of snow
The silent bleed of a world decaying
The moan of multitudes in woe
These were the things we wished would go
But they were staying.

—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৩

৩৯

পাগল

একটা পাগলা একখানা টিকে ধরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে গাঁয়ের ভিতর ঢুকলো,—হুহু কচ্চে হাওয়া, ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে রৌদ্র, পাগলা গিয়ে শুকনো ঝন্‌ঝনে খড়ের চালে সেই টিকেখানা সংযুক্ত করে' দিলে; ছোঁয়াচে রোগের মত টিকের আগুন খড়ে গিয়ে প্রবেশ করলে;—প্রথমে ধূম, তারপর অগ্নি, তারপর হুতাশনের লেলিহান শিখা গগন ছেয়ে ফেল্লে—দেখতে দেখতে, একখানা, তুখানা, দশখানা খড়ের চাল ধরে' উঠল—সমগ্র গাঁখানা হাহাকার করে' উঠল—ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুরুষ, প্রাণ রাখবে কি ধন রাখবে বুঝে উঠতে না পেরে, ছুটাছুটি সাব করলে;—তাদের আর্ত্তনাদ অগ্নিশিখার সঙ্গে আকাশের দেবতাব দিকে ছুটে চলল—আগুন থামলো না, ঘরের সঙ্গে তাদের কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

তখন তারা দেখে—পাগলা সেই জ্বলন্ত টিকেখানা হাতে করে' দাঁড়িয়ে হাসচে। সকলে বললে, পাগলা কি করলি! কি সর্ব্বনাশ করলি! প্রশ্ন করে' উত্তর নেবার যাদের অবকাশ বা ধৈর্য্য ছিল তারা শুনলে, হাহা করে' হেসে, পাগলা বলচে,—"বাবা, সুদের ঠেলায় এত, এই দেখ আসল আমার হাতে!"

তোমরা এই তুর্দ্দিনে সুধু সুদের বহর দেখে চমকে উঠচ;—হেথায়

খুন, হোথায় জখম, ওখানে আগুন, সেখানে লুট—পথে লোক নেই—এত বড় সহরটা একদিকে তোলপাড়; আর একদিকে চুপ চাপ, যেন প্রতিদিনের প্রকাণ্ড পরিশ্রান্তির পর ঘুমুচ্চে, আর থেকে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠচে, আর্ত্তনাদ করে' চেঁচিয়ে উঠচে। কিন্তু এটা জানবে কেবল সুদ মাত্র—সুদের সুদ চক্রবৃদ্ধির নিয়মে বৎসর বৎসর বেড়ে এসে আজ বিপুল হয়েচে। এই সুদের বহর দেখে চমকে উঠলে চলবে না; সুদের পরিশোধ, মেসিন গান্ আর কড়া পাহারা দিয়ে করলেও. দেনা-পাওনা মিটবে না। পাগলার হাতে জ্বলন্ত টিকেখানার সন্ধান করে' তা'কে জল দিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে।

তোমার আমার সকলকার ভেতর এই পাগল বর্ত্তমান; আর একখানা ক্ষুদ্র টিকের আগুন জ্বালিয়ে দেশটাকে ছারখার করে' দেবার প্রবৃত্তি তোমার আমার ভেতরই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। Lucid interval বলে' যে একটা অবসর আছে, সেটা তোমার আমার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রতিফলিত করে না; সেটা খুব বুদ্ধিমানের চেহারা হ'লেও আমাদের সেটা স্বরূপ নয়; আমাদের স্বরূপটা পাগলেরই রূপ।

তোমরা হয়ত চটে অগ্নিশর্ম্মা হচ্চ; কিন্তু আমি জানি, এবং তোমরাও তোমাদের lucid intervalএ হয়ত স্বীকার করবে যে, পাগলকে পাগল বল্লে চটে, মূর্খকে মূর্খ বল্লে চটে, ধনীকে ধনী বল্লে চটে, এই চটাই তার ধনবত্তার, মূর্খতার বা পাগলামির পরিচয়। অতএব চটো না, চটলে আমার কথা বুঝতে পারবে না।

তুমি পাগল—কিন্তু কিসে তোমাকে পাগল করলে? আমি অহিফেনসেবী, অর্থাৎ যে অহিফেন গাছে ফলে তাই আমি খাই; কিন্তু প্রকৃত মৌতাতী যদি কেউ থাকে ত সে তোমরা;—তোমরা যে

আফিম খাও সেটা গাছে ফলে না, অর্থাৎ তাহা ভগবানের সৃষ্টপদার্থ নয়—তোমাদের আফিম তোমাদের মস্তিষ্কে জন্মায়, ভগবান তার স্রষ্টা নন ; অথবা যে "ভগবান" তার স্রষ্টা, তাঁর স্রষ্টাও তোমরা। অতএব তোমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি—ভগবান ও তোমাদের আফিম এতদুভয়েরই স্রষ্টা। সেই তোমাদের সৃষ্ট আফিম তোমরা খাও, এবং নিজেকে আফিমখোর না মনে করে', আমাকে বল আফিমখোর, আর তোমরা হও ধার্ম্মিক।

তোমাদের ধর্ম্মকে আমি আফিম বলি, তার জন্য তোমরা আমাকে গালি দিতে থাক, তার জন্য আমি দুঃখিত নই—এ গালির ভাগ নেবার আমার অনেক লোক আছে। কিন্তু আমার আফিম আর তোমাদের ধর্ম্মে যে কতখানি সৌসাদৃশ্য আছে তা একবার আমি প্রকাশ করে' বলব। পার্থক্য একটু আছে, সেটা পূর্ব্বে বলেছি,—যথা, আমার আফিম খাঁটি ভগবানের ঘরে চোলাই করা, আর তোমার আফিম, অর্থাৎ ধর্ম্ম, তোমার ভাটিখানায় তৈরী—আমার আফিম natural, তোমার আফিম একটা synthetic product মাত্র।

আমার আফিমে আর তোমাদের আফিমে সাদৃশ্য অনেক। প্রথমতঃ, আফিম জিনিষটা একটু বয়স হ'লে ধরতে হয়। ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসাধারণ নিয়ম হচ্চে এই যে, আমার মত যদি লক্ষীছাড়া হওয়া কারও উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে আশৈশব সেবনই বিধি। তোমাদের আফিম সম্বন্ধেও তাই। এই যে দেশ জুড়ে' ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে আফিমের আড্ডা গজিয়ে উঠচে—সেখানে কচি কচি ছেলেগুলোকে—যারা বুক পুরে' খাবে, আর স্বচ্ছন্দে হুড় হুড়

করে' বেড়ে উঠবে—তাদের শৈশবে আফিম ধরিয়ে হাড্ডিসার, খর্ব্বাকৃতি, রসহীন, বলহীন ব্রহ্মচারী করে' তোলা হচ্চে। তারা বড় হ'য়ে (যদি বড় হওয়া পর্য্যন্ত টি'কে) আমার মতই লক্ষ্মীছাড়া হবে, তার কোন ভুলই নেই; নয় ত কাঁচকলাভাতে ভাত খেয়ে শীঘ্রই দেবভোগ্য হ'য়ে উঠবে এটাও অবধারিত।

আমি বলছিলাম সাধারণতঃ একটু বয়স হ'লে আফিম ধরতে হয়! বয়স হ'লে মানে, ধর ৪০এর কোটা পার হ'লে—যখন হজমটা একটু কম হ'য়ে আসচে, গাটে একটু বাত আশ্রয় করচে, প্রস্রাবের পরিমাণ একটু বেড়েচে—সেই সময় আফিম ধরলে উপকার হয়, কবিরাজ মহাশয়েরা বলবেন। আর ঠিক সেই সময়েই তোমাদের আফিমটা সাধারণতঃ ধরবার নিয়ম। অর্থাৎ রক্তের জোরটা যখন কমে' এসেচে, নিজের হাত পা বুকের জোরটা যখন কমে' এসেচে, দুনিয়ায় ঘা খেয়ে খেয়ে যখন আপনার শক্তির উপর অনাস্থা এসে পড়েচে—ঠিক সেই সময় গুরুকরণ, গীতাপাঠ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, গঙ্গাস্নানাদি আফিমের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার আরম্ভ করতে হয়, এবং উঠতে, বসতে, হাই তুলতে, আফিমের স্রষ্টার (যার স্রষ্টা তুমি) নাম উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু জানবে এই সব লক্ষণাক্রান্ত যে ধর্ম্ম সেটাও একটা ব্যাধি, রক্ত কম্‌জোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ব্যাধির মত এসে চেপে ধরে।

আমার আফিমের সঙ্গে তোমার আফিমের আর এক সাদৃশ্য এই যে, দুটারই anodyne properties আছে; অর্থাৎ যন্ত্রণার মাত্রা হ্রাস করে। পেটের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, আফিম খেলে বা আফিমের প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে। তোমার আফিমেও মনের জ্বালা, সংসারের

ঝালাপালার হাত থেকে কখনো কখনো অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু তা বলে' আমার আফিম আর তোমার আফিম বিষ নয় এটা প্রমাণিত হয় না। ধর্ম্ম মানে অমৃত, আর আমার আফিমও অমৃত—আমরা উভয় আফিমখোরই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই অমৃত মানে আভিধানিক বলেন বিষ এবং অমরত্বপ্রদায়িনী সুধা দুই-ই।

আমার অহিফেন আর তোমার অহিফেনের এই তৃতীয়বিধ সাদৃশ্য একবার প্রণিধান করে' দেখ। যদি অল্প মাত্রায় খাও, আমার আফিমে dyspepsia সারে, তোমার আফিমেও হয় ত মাত্রানুযায়ী সেবন করলে, রস পরিপাক হ'য়ে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য প্রদান করে। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে উঠলে উভয়বিধ অহিফেনে বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে—মানুষটাকে মেরে ফেলে। আমার মত অহিফেনসেবী সকল কাজের বা'র; আর তোমার অহিফেনের উপাসকও সকল কাজের বা'র হ'য়ে যায়। তার প্রমাণ, আমার জীবনধারণের জন্য আমার হাত-পা কোন কাজে লাগে না—একটা প্রসন্নরূপিনী আশ্রয়দায়িনীর প্রয়োজন হয়; তোমার আফিমখেকোগুলোকে দশ জনে না পুষলে তাদের চলে না। তাই মঠ, মন্দির, আখড়া ইত্যাদির প্রয়োজন—এই আফিমখেকোদের পোষবার জন্য।

তোমাদের আফিম আর আমার আফিমে আর একটা সাদৃশ্য এই যে, কোন মৌতাতীকে যদি তোমার কোন প্রকার আধিব্যাধির কথা বল ত তিনি অমনি চিকিৎসকের আসনগ্রহণপূর্ব্বক বলবেন—একটু আফিম খাও। পেটের অসুখ?—একটু আফিম খাও। মাথাধরা?—একটু আফিম খাও। বহুমূত্র?—একটু আফিম খাও। নিদ্রা হয় না?—আফিম খাও। বড় গরম?—একটু আফিম খাও। বড়

ঠাণ্ডা ?—একটু আফিম খাও। তোমার আফিমখেকোরও ঐ ধারা। দেশের রাজা অত্যাচারী ?—আফিম খাও। মুসলমান communal representation চায় ?—আফিম খাও। পুত্র বুড়ার কথা মানে না ? —আফিম ধরাও। কাউন্সিলে ভোট সংগ্রহ করতে হবে ?—আফিম চালাও। মেয়ের বিয়ের বড় কষ্ট ?—আফিম ধর। সে আফিম আবার দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বিভেদে বহুতর; জাতিবর্ণবিশেষে বহুতর—সে এক বিপত্তির উপর বিপত্তি। আমার আফিম 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—যাহা মগধ বা মালবের মাঠে জন্মায়—কোন বিপত্তি নেই।

এইখানেই তুলনার শেষ—কেননা সাদৃশ্যের শেষ। আমার আফিম যখন মাথায় চড়ে তখন আমার চক্ষু মুদ্রিত হয়, নিদ্রা আসে; আর তোমার আফিম যখন মাথায় চড়ে তখন তুমি পাগল, তুমি উন্মত্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন—তুমি তোমার আফিমের মৌজে মানুষ খুন কর, ঘরে আগুন দাও, দস্যুবৃত্তি কর, পাগলার মত গ্রামসুদ্ধ জ্বালিয়ে দিয়ে, সুদের বহর দেখে হাসতে থাক।

কিন্তু তার মধ্যে মজা এই—আর কেউ যদি তার নিজের বকযন্ত্রে চোলাই করা উন্মাদিনী সুরাগ্র সেবন করে' তোমার প্রতি ধাওয়া করে, অমনি তুমি চমকে ওঠ—গোমাতার বধে বুক ফেটে যায়, মানুষ ভাইকে খুন করতে ছোট—তার বকযন্ত্রটা ভেঙ্গে চুরমার করতে প্রধাবিত হও।

আমার অনুরোধ এই—খাঁটি অহিফেনসেবীর এই উপদেশ গ্রহণ কর। আমি মৌতাতী লোক, তোমাদিগকে তোমাদের মৌতাত বর্জ্জন করতে বলতে চাহি না—কারণ মৌতাত বর্জ্জন করা যায় না—যদি যেত আমি বহুদিন পূর্ব্বে আফিম ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যেতাম; সুতরাং সে অসাধ্যসাধন তোমাদের করতে বলি না। আমার উপদেশ

এই—তোমার অহিফেন নিয়ে তুমি নিজের ঘরে, নিজের মণিকোটায় যা খুসী তা কর—তোমার আফিম সার্থক হ'ক—"অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী" পারে তোমাকে ব্রহ্মলোকে বা শিবলোকে বা গো-লোকে নিয়ে যা'ক; অন্য কাহাকেও সঙ্গে নেবার ব্যস্ততা দেখিও না; আর কেউ তোমার সঙ্গের সাথী হ'ল কি না তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না; যেহেতু তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমারই—আর কারও নয়; একথা না বুঝলে গা জ্বলবে, মানুষ মরবে। বাহিরের সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তাই স্থাপন কর,—হিন্দুর সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গে, জৈনের সঙ্গে, শিখের সঙ্গে, সুধু মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন কর—এই ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম, আর সব পাগলামি। তোমার আজকের এই পাগলামি দেখে যিনি আদিদেব পুরুষপ্রধান—তিনি হাসচেন, আর বলচেন, দেখ আমার পাগলেরা কি খেলা খেলে।

৩১এ বৈশাখ, ১৩৩৩

৪০

বহুবচন

চাষার ছেলে যখন মাঠে কুড়ুল কুড়িয়ে পেলে, তখন তার সহচর আর একজন চাষার ছেলেকে বল্লে—"ভাই আমি একখানা কুড়ুল পেলাম"; কিন্তু কুড়ুলের অধিকারী যখন চোর বলে' তাকে ধরলে, তখন 'বুদ্ধিনাশা' হ'লে কি হয়, খুব সুবুদ্ধির মতই বল্লে—"ভাই এইবার আমরা বিপদে পড়লাম।" কুড়ুল পাবার বেলায় উত্তম পুরুষের একবচন, আর বিপদের বেলায় অন্যকে টেনে "বহুবচন"—এ বুদ্ধি পাঠশালে না গিয়েও বুদ্ধিনাশার যোগায়।

"অহংটা" mother-tincture, "আমরা"টা তার dilution; potency বাড়াতে হ'লে, dilution বাড়াতে হয়, একথা সকলেই জানে।

"বাঙ্গালীর কি একতা আছে?"—একথা প্রায় সকল বাঙ্গালীর মুখেই শোনা যায়। একতা নাই সত্য হ'লেও, বক্তা যেন বাঙ্গালী পদবাচ্য জনসমষ্টির বাহিরে দাঁড়িয়ে খুব নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করে', judicial detachment-এর বাহাদুরী নিয়ে থাকেন। অতটা নির্লিপ্ত না হ'য়ে কখনও কখনও বলেন—আমাদের কি একতা আছে? এই "আমাদের" প্রকৃত অর্থ "আমার" অর্থাৎ আমি অন্য কাহারও সঙ্গে একীভূত, মিলিত, যুক্ত হ'য়ে কাজ করতে পারি না। কিন্তু সেটা বক্তার গুণপনা ব্যক্ত করে' ফেলে বলে', অহংরূপ mother-tinctureকে

dilute করে' "আমরা" করা হয়, তা'তে কথাটার জোরও হয়, আর ধরাও পড়তে হয় না। "আমাদের" সে নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রবণতা কই ?—তার মানে, আমি একান্ত স্বার্থপর। "আমাদের" স্বদেশের প্রতি মমতা কই ? তার মানে, "আমি" স্বদেশ বলে' কোন entityকে চিনি না। "আমাদের" কি সে সাহস আছে যে—,তার মানে, "আমি" কাপুরুষ। এ দুর্যোগে "আমরা" কি করতে পারি ?—তার মানে, "আমি" কিছু করতে পারি না। লোকটা "আমাদের" জান হায়রাণ করেচে—তার মানে, "আমার"। লোকটা "সকলের" বিরক্তির কারণ—তার মানে, "আমার"। "আমি" বল্লে যে নিজের রূপ প্রকাশ পায়, তারই প্রতিষেধক বহুবচন প্রয়োগ—যাকে বলে hiding in a crowd, এটা তাই। এটাকে গৌরবে বহুবচনও বলা যায়, কিন্তু বৈয়াকরণ ছাড়া সে গৌরবের মাহাত্ম্য কেউ বুঝতে পারবে না।

আর এক রকম বহুবচন আছে, তার সূত্রটা এই রকম ছন্দে লেখা আছে—

অস্মদো দ্বয়োশ্চাবিশেষণাৎ

অর্থাৎ বিশেষণহীন যে "আমি" তার বহুবচন হয়। লৌকিক ব্যবহারে দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষণহীন অর্থাৎ বিশেষত্বহীন যে "আমি" তাকে বিশিষ্টতা দিতে গেলে "আমি" বলতে একটা দল—একটা সম্প্রদায়—এই ভাবে কথা কইতে হয় ; বহুত্বের মধ্যে নিমজ্জিত করে' এই অবিশেষণ অর্থাৎ অপদার্থ "আমাকে বড় করে' দেখাতে হয়। কিন্তু বৈয়াকরণের দিক দিয়েও বটে, এবং ব্যবহারিক জীবনেও বটে—যদি আমার কোন বিশেষত্ব থাকে, তা হ'লে আমাকে দলে ভিড়িয়ে বড় করবার প্রয়োজন থাকে না।

আর এক দিকে, শাস্ত্র বলচেন, অহংকে নষ্ট করাই মোক্ষ। এ কথার আধ্যাত্মিক মানে যাই হোক, practical applicationএর দিক দিয়ে, আমি আমার অহংকে "বয়েমের" মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্যপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। যেহেতু, দলে ভিড়ে যাওয়ার লাভ এই, যদি লাঠি পড়ে ত চারিয়ে পড়বে, যদি মাথা ফাটে ত ভাগাভাগি করে' ফাটবে—বচনের জোরে উপস্থিত মোক্ষলাভ এই রকম। আমরা অহংকে এই রকমেই নষ্ট করেচি, যথা,—দশের কাজ করবে কে?—আমরা, অর্থাৎ "তুমি আমি সে"; এ অবস্থায় আমি ঠিক মাঝখানেই পড়ে যাই; যদি গুঁতো আসে ত আগে আছ "তুমি," আর পাছে আছে "সে"; তোমাকে ও তাকে ছাড়িয়ে গুঁতোটা "আমি" পর্য্যন্ত নাও আসতে পারে। বহুর মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দেবার "চালাকি" এই,—হাতে হাতে মোক্ষলাভের অর্থাৎ গুঁতা হ'তে মুক্তিলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সে মুক্তিলাভে যে বড় একটা এসে যায় না তা বলাই বাহুল্য।

"সোঽহং" বলতে বলতে ভগবান হওয়া যায় কি না জানি না—কিন্তু মানুষ হওয়া যায় এটা আমি বিশ্বাস করি। সেটা এই রকম—দেশের কাজ করবে কে?—সোঽহং; বিপদে মাথা দেবে কে?—সোঽহং; আগুন নেভাবে কে?—সোঽহং; আগুন জ্বালবে কে?—সোঽহং; দুঃখ দৈন্য ঘোচাবে কে?—সোঽহং; এই মরুভূমিতে ফুল ফোটাবে কে?—সোঽহং; শত্রুর মুখে চূণ কালী দেবে কে?—সোঽহং; বিপন্নকে কোল দেবে কে?—সোঽহং—পণ্ডিতজী নন, গুরুজী নন, পুরোহিতজী নন, গ্রন্থজী নন—সোঽহং। এই রকম সোঽহং মন্ত্র জপ করলে মানুষ হওয়া যায় আমি বিশ্বাস করি।

প্রত্যেকে এই সোঽহং মন্ত্র সাধনা কর, সেই সাধনার ফলে যে বহুর উদ্ভব হবে—সে বহুবচনে কাজ হবে। অতএব আমার উপদেশ অহংকে ঘুম না পাড়িয়ে—জাগাও, উদ্বুদ্ধ কর, কর্ম্মক্ষমতাকে ফোটাও, যা-কিছু করবার আছে সেটা একমাত্র তোমারই কাজ এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হও—এই অহংকে পূর্ণতা প্রদান কর—মোক্ষলাভ হবে। চালাকির বহুবচনে, আর গৌরবের বহুবচনে কিছু হবে না। কেননা, হে শ্বেতকেতু, হে ভারতের তরুণ, নবীন, তুমি ভগবান কি না জানি না, কিন্তু তুমি ভগবানের প্রেরিত এ কথা মানি,—যে তাঁর বিশ্বরথ টেনে তার নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবে, সে তুমি ;—যে এই রথের অব্যর্থ অগ্রগতি সংরক্ষিত, পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত করবে, সে তুমি ;—যে সে পথের সকল বন্ধুরতা, সকল কণ্টক দূর করবে, সে তুমি। আমি স্থবির, আমাকে বহুর মধ্যে আত্মগোপন করতেই হবে, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিতেই হবে—কিন্তু তুমি নবীন, তুমি একবচনের সাধনা কর,—তুমি একাই করুণা, জ্ঞান, তেজ, ত্যাগের সাধনা করে' রাজার আসনে বস।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

জানিনা কি বোঝে

দেশমাতৃকা, Vaterland, Fat
Motherland—নানান্ দেশের লোকে এ
অভিহিত করেচেন; বাঙ্গালী জনক-জনন
"জনক-জননী-জননী" বলে' আরাধনা করেচে;

এর মানে কি সুধু এই যে "এই দেশেতে জন্ম
এই দেশ আমার জনক বা আমার জননী? "এই দে
এই দেশেতে মরি" এ কথা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী অনেকেরই
তারা সকলে কি এই বঙ্গভূমিকে মাতৃজ্ঞান করে? বাঙ্গালী ম
এই দেশকে—এই সুজলা সুফলা, এই নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বলা জন্মভূ
মাতৃভূমি বলে' সম্বোধন করে না; এমন লোকও ত দেখা যায় যিনি মাকে আপনার না বলে', ফুফুকে আপনার জ্ঞান করেন—বিলাতকে Home বলেন;—অথবা যাঁরা যাযাবর-প্রকৃতি, সকল দেশই যাঁদের সমান, "যখন যেথানে থাকেন তখন তার";—অথবা যাঁরা বিশ্বপ্রেমিক কোন দেশবিশেষকে স্বদেশ বললে যাঁরা ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেন, যাঁদের বসুধৈব কুটুম্বকম্, যাঁরা জন্মসম্বন্ধটাকে অস্বীকার না করলেও, সেটাকে নিতান্ত accident বলেই উড়িয়ে দেন; তাঁদের কথা কি ছেড়ে দেব?

কর্ত্তব্যের বোঝাটা বেশীর
ধে ততটা পড়ে না ; স্নেহ
ক, এমন কি কুসন্তান হলেও।
ভসন্ধি এই।

নহেন, আমার জননী নহেন ;
পূর্ব্ব জন্মে আর এই জন্মে তাঁকে
আবার গড়েচি—আমি তাঁর জনক,
তিপালক রক্ষক, আমি তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-

—দেশ আগে না মানুষ আগে ? সে পুরাতন
ন, হবে না—ডিম আগে কি মুরগী আগে ?
গে, না আম গাছ আগে ? তার মীমাংসা হবে
দি আমার দেশ বলতে সিন্ধুবারি-বিধৌত, তুষার-কিরীটী,
মুনা-প্লাবিত ভূখণ্ড মাত্র বুঝাত—তাকে আমরা সৃষ্টি করিনি
যুগে যুগে সে ভূখণ্ডটা একই ছিল, একই থাকবে—সিন্ধুজলের লবণ কমবে না, তুষার গলে' শেষ হবে না, জাহ্নবী যমুনা শুকিয়ে যাবে না ; তার জন্য আর ভাবনা কি ? তাকে মা বলাই বা কেন, বাবা বলাই বা কেন ? মা-বাবা সম্বন্ধটা তখনই আসে যখন লালনপালনের কথা আসে—ভাঙ্গাগড়ার কথা আসে—হ্রাসবৃদ্ধির কথা আসে—উঠানামার কথা আসে—জন্মমৃত্যুর কথা আসে। এ সব কথাই মানুষের সঙ্গেই আসে, আর মানুষের সঙ্গেই থাকে। সেই মানুষ আমরা ; পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী, উর্ব্বরক্ষেত্র মরুভূমি, চিল্‌কা-হ্রদ বা লবণসমুদ্র ছাড়া যে পদার্থগুলি—চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞানময়,

ইচ্ছাময়, কর্ম্মময় যে মানুষ
আমরাই রক্ষক, এবং অ
প্রলয়কর্ত্তা—আমরা জনকজননী.
দেশটা মা নয় আমরাই তা
তপঃক্ষেত্রে বেদের উদ্ভব করেছি
জ্বেলে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার করেছি
করেছি, আমরাই শঙ্করাচার্য্যের সব
করে' বুদ্ধত্বকে নিমজ্জিত করেছি ; আম
গড়েছি, শাস্ত্র লিখেছি, আবার তাকে
মুচেছি ; আমরাই মহম্মদ ঘোরিকে ডেকে
বসিয়েছি—এই যে বিপুল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—তার
হিমালয় নয়, বিকানীরের মরুভূমি নয়, পঞ্চনদ নয়;
সাগর-সঙ্গম নয়, বারাণসী নয়, সেতুবন্ধ নয়, পুরুষোত্তম নয়
মাতৃভূমি বোলো না, পিতৃভূমি বোলো না, তা'তে জনকের স্রষ্টা
কমে' যায়—সে দায়িত্ব কমানই যদি অভিসন্ধি হয় তা'তে আমার
বলবার নেই।

নিরাশায় যখন বুক ভাঙ্গে, নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলে যখন জর্জ্জরীভূত হই, তখন 'মা নিস্তারিণী' বলে' ডাকবার কেউ থাকলে একটু বল পাই, আশা পাই, কূলকিনারাহীন দুঃখ জলধির তরঙ্গে একটা আশ্রয় পাই—তাই হয়ত মা বলে' ডাকি, চীৎকার করি, রোদন করি—কিন্তু কোথায় মা? তোমার সহায়হীনা কন্যা, তোমার দুষ্কৃতির ফলভাগিনী হ'য়ে তোমারই মত রোদন কচ্চেন—শুনতে পাচ্চ না? অতএব দেশকে মা বলে' নিজের দায়িত্ব খাট কর' না, যেখানে অবলম্বন

: আপনার কর্ত্তব্য চাপা দিও
.থকে হাতটাকে টেনে নিয়ে,
না—নয়ত তোমার "মা" অর্থাৎ
তা যদি না পার ত আমার কাছ
ম তোমাকে যথা পরিমাণে পাঠিয়ে

হে মা

হে মা কালী কল্‌কত্তেওয়ালী, আমি
না মা! যুযুৎসু কুরুপাণ্ডবের মধ্যস্থলে দাঁ
বাক্যেন” মধ্যম পাণ্ডবের মোহ উৎপন্ন ক
তুমিও যুযুৎসবঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবস্থিত হ
বুদ্ধিং মোহয়সীব মে”—আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে
হে মা কালীঘাটের কালী, হে মা ঠন্‌ঠনের কালী, হে
কালী, হে মা রাজসাহীর কালী—তোমার মন্দির ভেঙ্গে
বিগ্রহকে গাছে লটকে দিয়ে ব্যভিচারী যদি নির্ব্বিবাদে ঘরে গিয়ে
তা হ’লে কবির কথায় যে বলতে ইচ্ছা করে—

“দেখ, দেখ, কি করে’ দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!”

অত্যাচারী, অবিচারী যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করেও অনাহত গৃহে ফিরে যেতে পারে— তা হ’লে যে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে,

কোথা? কবি যে বলেচেন

"কোথাও সে

নাই, কোথাও সে—

না কখনো!"

নয়ো না মা, কেননা যে তোমার

; অতি ভয়ে ভয়ে বলচি মা,

াধ নিয়ো না। যে তোমায় মানে না,

তোমার মূর্ত্তি নিয়ে ফাঁসি দেয়, তার তুমি

তোমার মন্দির রক্ষা করতে ভলান্টিয়ারের

তোমার শঙ্খিনী, যক্ষিনী, চিত্রানী কোথায়

স্যরসিকের কথায় বলতে হবে—

াথ শুয়ে আছেন,—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন;

জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন।

শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা;

আমরা সব 'নোব' শরণ মোগল দেবের চরণতলায়;

—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

যদি হাস্যরসিকের কথাই আমরা গ্রহণ করি তা হ'লে অন্ততঃ আমাদের রসজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে, আর কিছু হ'ক আর নাই হ'ক। এই হাস্যরসের অভাবেই বীভৎস রসের প্রাবল্য হয়েছে বলে' আমার মনে হয়। মস্‌জিদের জন্য বা মা কালীর জন্য মানুষ ভাইয়ের মাথা ভাঙ্গতে থাকলে আমরা যে কত বড় অরসিক বা বদ্‌রসিক তারই প্রমাণ দিতে থাকব। হে হিন্দু-মুসলমান, এক শত বৎসর পরে যখন তোমাদের বংশধরগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই মাথাভাঙ্গাভাঙ্গির

বিবরণ পড়বে, তখন তারা

ছিলেন, তাই জেনে হেসে খুন

stock না হ'য়ে একটু হাস, এ

হিন্দু-মুসলমান—এক মায়ের দু

হাস্যোদ্দীপক এইটাই বোঝ, যে-মুহূর্তে

ভাইয়ে বিরোধ থেমে যাবে।

পিঠোপিঠী দুই সন্তানের হিংসা দ্বেষ

মার কোল জোড়া করে' বসেছিল, হঠাৎ

নবাগত ভাইটি তার একচ্ছত্রা রাজত্ব থেকে

কোল একেবারেই বাজেয়াপ্ত করে' নেয়, তার

হ'য়ে থাকে। কোল ভাগাভাগি হ'য়ে যায় বলে'

স্নেহপ্রস্রবণ বিভক্ত হ'য়ে যায় না; সকল আইন সক

ব্যর্থ করে' সে প্রস্রবণ দুই মুখে সমান বেগেই প্রবাহিত হ'

অতএব হে হিন্দু-মুসলমান, একই মাতৃক্রোড়ের অধিকারী দুই ভ্রা

সমান অধিকার যে স্নেহে, যে মমতায়, তা হ'তে বঞ্চিত হবে না।

কালীর করুণা, আর খোদাতাল্লার আশীর্ব্বাদ এক পুণ্যধারার দুই স্রোত বলে' ভিন্নমুখী নয়, বিরুদ্ধ নয়, কমবেশী নয়, এ কথাটা বোঝ, তোমাদের ভাল হবে। কারণ, এটা জেনো কালীমূর্ত্তির চেয়ে এবং মসজিদের চেয়ে সত্য অধিক বলবান, অধিক কল্যাণপ্রদ।

তোমাদের এই মসজিদ ভাঙ্গা, আর মা কালীর মূর্ত্তিকে গাছে লট্‌কে দেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে এক অপূর্ব্ব চিত্র আমার মানস-সরোবরে ভেসে উঠল! আমি দেখলাম কল্যাণময়ী মাতা পদযুগ প্রসারিত করে' তাঁর সন্তানকে তার উপর শায়িত করে' মুখচুম্বন কচ্চেন,

টিকুটি হচ্চে। মাতা যখন
চেন, শিশু তাঁর চুলের মুটি দুই
ার তার দুরন্ত পা দুখানি মাতার
মাতা কোপের অভিনয় করে' নিজ
সন্তানের মুখ চুম্বন কচ্চেন। আমি
সন্তানের। এ থেকে কবি মা কালীকে
ব না, আর সন্তানকে ভৎসনা করলেও

———

DEMOCRACY–

গল্প নহে, ইতিহাস। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ, ৫
বক্ষঃস্থলে ইংরাজের ক্ষুদ্র উপনিবেশ-
বাগান—অদূরে গোমতী লক্ষ্ণৌ সহরের প
প্রবাহিত। সেই প্রাচীর বেষ্টিত বন্ধুর বাগা
Sir Henry Lawrence, তাঁহার ক্ষুদ্র, মুষ্টিমেয় ে
ইংরাজ নরনারী ও বালকবালিকাগণকে লইয়া বিচি
পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতেছেন।

বিশাল লক্ষ্ণৌ সহর নিস্তব্ধ, মৃত; প্রত্যেক গৃহ অর্গলবদ্ধ-হইতে বা ভিতর হইতে। সিপাহীর ভয়ে যে যেখানে পারি পলাইয়াছে—নহেত ঘরের দরজা জানালা আঁটিয়া অপঘাত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। পথ জনশূন্য, ক্বচিৎ লুণ্ঠন-রত সিপাহীর চীৎকার শুনা যাইতেছে।

চারিদিন ধরিয়া অগণিত সিপাহী Residencyর দ্বারে হানা দিতেছে; Residencyর প্রাচীর বন্দুকের গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে; কিন্তু অবরুদ্ধ মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সেনার কিছুই করিতে পারে নাই। প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আজ প্রাচীরের বনিয়াদের নীচে mine করিতেছে—সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রাচীরের তলায় দুই মণ বারুদ

া অধিনায়কের ইঙ্গিতে

স্তূপে, ভাঙ্গ খাইয়া প্রায়

রিল—প্রাচীরের অনেকখানি

া উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

্য করিতে লাগিল—কে একজন

র্য্যন্ত, কাল প্রাতঃকালে কার্য্য

করিগে।”

—“ঠিক, বহুত ঠিক। লুট—চলো লুট

য়ক বলিলেন—“সে কি, এত পরিশ্রমের পর

য়া, অর্দ্ধেক পথে থামিয়া গেলে সব পণ্ড হইবে।

esidencyর মর্ম্মস্থল উৎপাটিত কর; লুটিতে হয়

y লুট কর।”

ন্ত সিপাহীর দল একবাক্যে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—“আরে

রা বলচি লুট, আর তুমি বলচ লড়াই। লড়াই কাল হবে—

আজ লুট—চলো ভাইসব—”

সিপাহীর অধিনায়ক বলিল—“না, তাহা হইবে না; আজই কাজ শেষ করিতে হইবে; চতুর ইংরাজ এক রাত্রিতে কি ফন্দী করিবে কে বলিতে পারে—আজকের কাজ আজ শেষ কর—”

সিপাহিগণ বাধা দিয়া বলিল—“আরে, আমরা তামাম লোক বলিতেছি—না, তুমি একা বলিতেছ—হাঁ;—এ হুকুম চালাইবার অধিকার কে তোমাকে দিল? আমরাই ত! আমরা বলিতেছি—আজ লুট, কাল লড়াই।”

অধিনায়ক তথাপি বলিলেন—"যে আমার হুকুম অমান্য করিবে তাহাকে কঠিন সাজা দিব।"

সিপাহিগণ—"আরে আমার সাজাদেনেওয়ালা! মারো শালাকো।"

যেমন কথা তেমনি কাজ—অধিনায়কের মৃতদেহ ধূলায় গড়াগড়ি গেল।

সিপাহিগণ অন্য আর একজন ব্যক্তিকে নায়ক মনোনীত করিল এবং প্রশ্ন করিল—"লুট, না লড়াই?" সে মৃতদেহের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"লুট!"

হৈ হৈ শব্দে সিপাহিগণ দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে ছুটিল।

এই তোমাদের তথাকথিত First War of Indian Independence, আর আমি বলি—The first organized plunder of the people, by the people, for the People (with a capital P). এই এক দিনের ঘটনা, সমগ্র বিদ্রোহের প্রতীকরূপে প্রমাণ করিয়া দিল যে, দেশবাসীর রক্তে অকারণ নদী বহাইয়া দেশোদ্ধার হইবার নহে। আরও প্রমাণ করিয়া দিল যে, Democracy মানে ভূতের নৃত্য—যদি প্রমথনাথের শিঙ্গা ভূতগুলিকে পরিচালিত বা প্রশমিত না করে।

Democracyর নামে অনেকে নৃত্য করিতেছেন—কিন্তু Democracy বলিতে কি বুঝায় তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝা গেল না। Democracyর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একজন খুব বড় Democratic দেশের পণ্ডিত কবুল করিয়াছেন—Like many unquestioned words it is not only vaguely sublime

but sublimely vague. যেমন তোমাদের "স্বরাজ"।

কেউ বলেচেন—Democracy means that any man could do as he liked if he called it freedom and equality.

কেউ বলেচেন—Democracy is want of Government which like equality offered great rewards to every unequal work.

কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা তিনিই দিয়েচেন, যিনি বলেচেন—Democracy is that artful organization wherein nine fools have the privilege of shouting down one wise man.

এই মাথাগুন্তি করে', ভূয়সিকা (majority) দ্বারা সত্য আবিষ্কারের উপর আমার আস্থা নাই। জগতের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে সত্য একজনেই আবিষ্কার করে' থাকে—সে আবিষ্কারক বেদব্যাসই হন বা বুদ্ধদেবই হন, নিউটনই হন বা গ্যালিলিওই হন, রুশোই হন বা লেনিনই হন, গান্ধিজীই হন বা দেশবন্ধুই হন। কমিটি করে' ভোট নিয়ে সত্য আবিষ্কার হয় না। একজন মহাপুরুষ বলেন—If Newton were to sit down in a Round-table conference with Liebnitz and Descartes, the law of gravitation would never have been discovered. একথা আমি মানি। গ্যালিলিও কমিটি করবার মত লোকই পেতেন কিনা সন্দেহ; যদিই বা পেতেন, সমগ্র খৃষ্টীয়-জগৎ খড়্গহস্ত হ'য়ে সে কমিটীকে unlawful assembly বলে' বরিশালী দাওয়াই দিয়ে দিত। Democratরা বলবেন—সত্য আবিষ্কার,

মন্ত্রদর্শন না হয় কমিটী করে' হয় না, কিন্তু কোন আবিষ্কৃত সত্যের প্রয়োগের বেলা, মন্ত্র-প্রয়োগের সময়, দশের মত না লইলে কি চলে? হয়ত চলে না। কিন্তু এ দশের মত মানে কি আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

"ধামা" কথাটির প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি শব্দে আছে—ধামা-চাপা এবং ধামা-ধরা। ধামা-চাপার ধামা অর্থে আমি বুঝি আবরণ অর্থাৎ ঢাকা। কোন অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখবার নাম "ধামা-চাপা" দেওয়া, ইংরাজীতে যাকে বলে—shelving. কমিটী, বা assembly, বা কমিশনের মত অপ্রিয় বিষয়কে চাপা দিবার সুব্যবস্থা আর কোথাও আছে কি না জানি না। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচার-কাহিনী প্রমাণিত হ'লেও Mother of Parliamentএ "ধামা-চাপা" দেওয়া হয়েছিল। Parliament গণতন্ত্রের রচিত একটা খুব শক্তিশালী যন্ত্রবিশেষ। হেষ্টিংসের ব্যাপারটা কোন জজের আদালতে পেশ হ'লে "ধামা-চাপা" দেওয়া তত সহজ হত না; কিন্তু গণতন্ত্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ জজ হ'য়ে বসায় "ধামা-চাপা" সহজে দেওয়া গেল।

কমিশন বসাইয়া উপস্থিত ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণের হেতু টাকায় ১৬ পেন্স Exchangeকে "ধামা-চাপা" দিয়া, টাকায় ১৮ পেন্স বাহাল করা হইয়াছে। কমিশন বসাইয়া কোন প্রস্তাব বিশেষকে "ধামা-চাপা" দিবার নিদর্শন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভূরি ভূরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত নিদর্শন চোখের উপর বিদ্যমান থাকিতে Democracyকে ধামা-cracy বলিলে স্বরূপ বর্ণনাই করা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস—দশের মত লইয়া চাপা দেওয়া হয় বলিয়া যে

"ধামা-চাপা" নহে তাহা আমি মানি না। Democratরা ইহাতে খুসী হইতে পারেন যেহেতু দশজনের পরামর্শ লইয়া ধামা-চাপা দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু যাহাকে কর্ম্মভোগ করিতে হইবে তাঁহার তাহাতে কি আসিয়া যায়? Operation শাস্ত্রসঙ্গত হইলে লাভ কি, রোগী যদি মরে।

"ধামা-ধরা" অর্থে ভারবাহী, আজ্ঞাবাহী। এই অর্থেও Democracyকে ধামা-cracy বলা যাইতে পারে, প্রমাণ করিতেছি; তবে ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ।

সকলেই জানেন "জনসঙ্ঘ" খুব জাঁকাল নাম হইলেও তাহাকে crowd বা দঙ্গল বলিতেই হইবে। Crowdএর মনস্তত্ব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—It is now generally realised that crowds are not to be regarded as mere assemblages of individuals but as a kind of creature more or less completely organized, and that the opinion of a crowd is not either the greatest common measure or the least common denominator of the opinions of the individuals composing it, but something altogether different—a kind of compelling emotion that controls the minds of the individual components, constraining them to act and feel not as they, as individuals, would have acted and felt but in a manner often quite opposed to their individual tendencies.

আমি বিদ্রোহী সিপাহীদলের চিত্র দিয়াছি—সেটা এই crowdএর চিত্র। ব্যক্তিগতভাবে দঙ্গলের মধ্যে বহু সিপাহী হয়ত লুটের নহে, লড়ায়েরই পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু দলের মনোভাব তাহার বিপরীত হওয়ায় সকলেই লুট করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। এই রকম crowd, অনেক রকমের থাকিতে পারে—জাতি (nation) একটা crowd, University একটা crowd, একটা রাজনীতিক দল বা party একটা crowd, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একটা crowd, এমন কি সংবাদপত্র-বিশেষের পাঠকগণ, বা বিদ্যালয়-বিশেষের ছাত্রগণ একটা crowd ; এবং একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন crowdএর অন্তর্গত, বিষয়-বিশেষের আলোচনার সময় কে কোন্ crowdএর অন্তর্গত তাহা ফুটিয়া উঠে। এই crowdএর মধ্যে মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলে—যেমন পুষ্পবিতানে, পুষ্প আপনার পুষ্পত্ব হারাইয়া বিতানের শোভা বর্দ্ধন করে মাত্র ; কোন একটি ফুল কেমন, জানিতে হইলে তাহাকে দলের মধ্য হইতে তুলিয়া দেখিতে হয়—কেননা তাহার নিজের রূপ পুষ্প-বীথিকার রূপে ও রঙ্গে ঢাকা পড়িয়া থাকে।

এই crowd—automobile নহে, অর্থাৎ আপনি চলে না ; "It is an amorphous creature without a brain" একজন leaderকে উপলক্ষ করিয়া অগ্রসর হয় ; এই leader বা জননায়ক দ্বিবিধ - নীত এবং নেতা—crowd-exponent ও crowd-compeller. জনমনের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া যিনি সেই গতিপথ অনুসরণ করেন তিনি—নীত ; তাঁহার মতামত জনমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। আর যে শক্তিধর জনমনকে আপনার উদ্ভাবিত পন্থায় পরিচালিত করেন তিনিই নেতা—নেপোলিয়ান, মুসোলিনি, লেনিন,

C. R. Das নেতা; আর লুটের সিপাহীদলের নব-নির্ব্বাচিত নায়কটি নীত মাত্র। আজকাল পথে ঘাটে যে leader পালে পালে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই নীত মাত্র, নেতা নহেন। তাঁহাদিগকে যদি "ধামাধরা" বলা যায় এবং তাঁহাদের তাঁবে যে crowd আপনার গোঁ-ভরে সাতপুরুষের সঞ্চিত অন্ধকারের বোঝা বহিয়া গড্ডলিকা প্রবাহবৎ চলিয়াছে, তাহাদের সমষ্টিগত জীবনকে যদি "ধামা-cracy" বলা যায়—কিছুই অন্যায় হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই "ধামাধরা"-নেতাগণ-পরিচালিত Democracyর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। Democracyর জননী বর্ত্তমান ফ্রান্স ও তাহার ছয় পয়সা মূল্যের ফ্রাঙ্ক তাহার নিদর্শন; আমাদের দেশের বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত অবস্থাও আর একটি নিদর্শন।

কিন্তু প্রকৃত নেতা যিনি তিনি crowdএর আব্দার এক মুহূর্ত্তও সহ্য করেন না; crowdএর সযত্ন-সঞ্চিত অন্ধকারের পরিপুষ্টি সাধন লোক-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন না; জনমতের নামে বাঁদরামি ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতে হইবে এ কথা স্বীকারই করেন না; পরন্তু জনমতকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজমতে পরিণত করেন; তাঁহার নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চালনে বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে এক অপূর্ব্ব সম্মিলনে মিলাইয়া দেন, যাহা কিছু আছে, আছে বলিয়াই, অনেকদিন আছে বলিয়াই, তাঁহার কাছে সম্মানের বস্তু নহে। যাহা আছে, তাহা কল্যাণের জন্য কি না, তাহাই তিনি দেখেন, এবং অব্যর্থ দৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পান; ধ্বংস যোগ্য বিবেচনা করিলে নির্ম্মম আঘাতে তাহার ধ্বংস সাধন করেন। তাঁহার কাছে—ক্রমে ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ, র'য়ে বসে'—এ সবই নিরর্থক

দুর্ব্বল-জনোচিত অছিলা মাত্র বলিয়া বোধ হয় ; অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে "আপোষ" তাঁহার প্রকৃতিগত নহে।

সুতরাং প্রকৃত নেতাকে autocrat হইতে ভিন্ন করিয়া দেখা সহজ নহে। প্রভেদ মাত্র এই—সম্রাট পৈতৃক অধিকারে সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের নিয়ন্তা, আর প্রকৃত নেতা ন্যায় ও সত্যের সহজ অধিকারে রাষ্ট্র সমাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম—জনমনের সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টার নিয়ামক! এবম্ভূত নেতৃপরিচালিত জনসঙ্ঘ বা crowd, সম্প্রদায় বা party, নেতার "ধামাধরা" মাত্র।

Democratগণ পুনশ্চ আমার উপর রুষ্ট হইয়া বলিবেন—তবে কি মনোনয়ন (election) ভোট, ভূয়সিকা (majority) এ সকলের কোন অর্থ নাই? ভূয়সিকার দ্বারা যে মত ও পথ নির্দ্দিষ্ট হয় সে কি অভিনয় মাত্র?

আমি বলি সেটাকে—অভিনয় বল অভিনয়, শিষ্টাচার বল শিষ্টাচার। অভিনয় এই জন্য যে, vote ও ভূয়সিকা একটা fiction-এর উপর অবস্থিত ; সে fiction এই যে মানুষে মানুষে সমান—মত ও পথ নির্দ্ধারণে সকলের সমান পারদর্শিতা আছে।

"Democracy implies an hypothesis which is absolutely false; that men by the mere fact of growing up into men, are competent to decide about their government; that they are all born with judgment and power; and that they have rights irrespective of their duties."

অতএব যাহা fictionএর উপর অবস্থিত—সে fictionটা

যতই মনোজ্ঞ হউক না কেন (আশু মুখুয্যে আর কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী একই বস্তু বলিলে আমার বুকখানা সাত হাত না হবে কেন ?)—তাহাকে, সমগ্র ব্যাপারটাকেই অভিনয় বলিতে হইবে।

সম্রাট লেখেন—"I command etc." এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্রের নায়ক লেখেন—"In the name of the people etc." আপাততঃ মনে হয় প্রথমটা জবরদস্তীর কথা, দ্বিতীয়টা শিষ্টাচারের কথা। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ই সমান।

কারণ কোন Napoleon যখন "In the name of the people" কোন হুকুম জারি করেন, তখন peopleএর আত্মাভিমান পরিতুষ্ট হইলেও, এবং কমিটি ও কাউন্সিলের ভিতর দিয়া হুকুম চোলাই হইয়া বাহির হইয়া আসিলেও, সেটা যে peopleএর কথা নহে, একমাত্র Napoleonএরই কথা, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। Mussolini, Lenin, C. R. Das সম্বন্ধেও সেই কথা।

আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই যে, প্রকৃত নেতার শিষ্ট উপদেশ সম্রাটের আদেশের মত জনসঙ্ঘ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই। অতএব প্রকৃত নেতার (crowd-propeller) তাঁবে জনসঙ্ঘ "ধামা-ধরা" মাত্র এবং Democracy এক্ষেত্রেও ধামা-cracy মাত্র।

আমি বলি Autocracy, আর Democracy কথার মার-পেঁচ, কবির কথায় বলি "ভুলো না, কথায় ভুলো না"। কে কি দিতে পার বল, সেই বুঝে তোমার দাবা, তোমার দাম। নতুবা তুমি শূন্য মাত্র, একটা অঙ্কের পর অবস্থিত বলে' তোমার মূল্য ? সেই অঙ্কটাই সব।

আমি প্রসন্নর সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি—তাহারও ঐইমত! সে বলে—এক গোয়াল গরু, সবই গরু, আর দুটো করে' সিং আছে, এবং সবাই ঘাস খায়, আর ভাগাড়ে যায় বলে' কি সব গরু সমান, এবং সব গরু সমান মনে করে'—সকলের সমান কদর হবে? যে গরু যেমন দুধ দেয় তার তেমনি আদর, সে তেমনি ঘাস জল, খুদ ভুসী পাবে। তবে মুসলমানের সঙ্গে যুঝিবার সময় সবাই গোমাতা বটেন। কেননা আমার গোহালে অযত্নে না খেতে পেয়ে মরা এক, আর ছুরির আঘাতে মরা আর এক। আমাদেরও সেই দশা, ছত্রিশ জাতের খপ্পরে পড়ে হিন্দু হাবুডুবু খাক না, কিন্তু রাজার সভায় আমরা সব সমান। এটা খুব জবর অভিনয় বটে!

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৩

৪৪

নারী

আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কবির কথায় বলিতে পারি –

I never felt the kiss of love
Nor maiden's hand in mine.

তথাপি আমার মন বুঝিতে পারে—

How sweet are looks that ladies bend
On whom their favours fall !

সেইজন্য—

For them I battle till the end
To save from shame and thrall.

আমি "খুঁজি খুঁজি নারী" করিয়া আমার নারীকে খুঁজিয়া পাই নাই—তবুও নরনারীর কল্যাণের জন্য আমার পত্রে অনেক কথা বলিয়াছি ; তারপরও তোমরা, হে নারীকুল, রাগ কর, অভিমান কর, গালিবর্ষণ কর, প্রসন্নর মঙ্গলার মত অকস্মাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ভঙ্গী কর ; জানিও, গোঁজকে অস্বীকার করিয়া, দড়িকে অমান্য করিয়া ছুটিয়া পলাইবার ঠাঁই একটি মাত্র আছে—সেটার নাম Pound, যেখানে আটকপড়া গাভীজীবনের অতি শোচনীয় পরিণাম।

তোমাদের চিরদিনের অভিযোগ, শাশ্বত অভিযোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তোমরা স্বাধীন সৈরিন্ধ্রী নহ, তোমরা নির্য্যাতিতা, তোমরা প্রচুর শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা।

এ পোড়া দেশে শতকরা ছয়জন মাত্র শিক্ষিত অর্থাৎ লিখিতে-পড়িতে জানে—ইতিপূর্ব্বে, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম ও সনাতন সমাজ-স্থিতির পূর্ণ প্রকোপের যুগে তাহাও ছিল না। এই ছয়জনের মধ্যে যদি পাঁচজন পুরুষ ও একজন নারীও হয়—তাহা হইলে বেশী উতলা হইবার কারণ এখনও সমুপস্থিত হয় নাই।

তারপর শিক্ষা লইয়া হইবে কি? যদি স্বতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের কবলের বাহিরে যাইবার পারদর্শিতালাভই তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে—হে নারী! মনেও করিও না যে সে শিক্ষালাভের সহায়তা কোন পুরুষ করিবে এবং করা উচিত। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না, শতের মধ্যে একজন নারী সৈরিন্ধ্রী হইয়া কল্যাণময় জীবন যাপন করিতে পারেন বলিয়া আর ৯৯জনের মধ্যেও তাহা সম্ভব। যাহা সাধারণভাবে সম্ভব নহে, তাহা সাধারণের অবলম্বনায় ব্যবস্থা হইতে পারে না—অর্থাৎ কোন সমাজের ধারা হইতে পারে না।

তারপর সৈরিন্ধ্রী হইলে নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি না তাহাও দ্রষ্টব্য। নারীজীবনের সার্থকতা পুরুষ-সম্পর্ক এবং সন্তানোৎপত্তি! একথা যে নারী ভুলিবেন তাঁহাকে কমলাকান্ত "বাবা মেয়ে" বলিয়া নমস্কার করে। "আঁটকুড়ী"র জীবন—কুমারীরই হউক আর পরিণীতারই হউক—যুগে যুগে, দেশে দেশে নারীহিসাবে ব্যর্থজীবন।

'স্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে, এ হতভাগ্য দেশে পুরুষগণ কি পরিমাণ স্বাধীনতা উপভোগ করেন অগ্রে সে কথা বিচার করিয়া দেখ। মানুষ মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস; কোন পুরুষ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ বা ভট্টপল্লী-নদীয়া-কাশী-কাঞ্চিলব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া নিজের হিতবুদ্ধি অনুসারে কতখানি চলিতে ফিরিতে পারেন তাহা দেখ; তাহার তুলনায় সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নারী কতখানি আপনার মতে বা খেয়ালে চলিতে পারেন তাহার পরিমাণ কর, দেখিবে—"তুমি যে তিমিরে, তিনিও সে তিমিরে"!'

স্বাধীনতা একটা negative condition,—freedom from unnecessary restraint. স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কে কতখানি necessary restraintএর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, কে কোন্ গোজে বা কোন্ দড়িতে বাঁধা থাকিবে, তাহা এক দিকে পরস্পরের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে, অপর দিকে পরস্পরের বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে। সেই বুদ্ধি খরচ করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লও, ভালই হইবে। দাবী হিসাবে যেমন একটা কিছু খাড়া করিবার চেষ্টা করিবে তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে প্রতিবন্ধক আপনি আসিয়া খাড়া হইবে। হাজার হউক স্ত্রী, পুরুষ দুই বিরুদ্ধ শক্তি—মিলনে প্রণয়, বিরোধে প্রলয় ইহা নিশ্চয় জানিবা।

সর্ব্বশেষে নির্য্যাতনের কথা বলিয়া এ পত্র শেষ করিব। নারীর নির্য্যাতনের প্রধান গুরু নারী, পুরুষ নহে—এ সত্য ভুলিলে চলিবে না। অত্যাচার যে করে এবং অত্যাচার যে সহে, কবি বলিয়াছেন, ভগবানের রোষ-বহ্নি যেন উভয়কেই দগ্ধ করে। এই অত্যাচারী ও

অত্যাচারিতের উপর কবির অভিসম্পাত সর্ব্ববিধ অত্যাচারের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য—প্রজার উপর রাজার অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচার, অজ্ঞানের উপর জ্ঞানীর অত্যাচার, দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার, নারীর উপর নারীর বা পুরুষের অত্যাচার। ভগবানের রোষ-বহ্নি জ্বালিবার অধিকার কিন্তু দুর্ব্বল মাত্রেরই আছে—সুতরাং নারীরও আছে; এবং অত্যাচারিত নারী সুধু কেরোসিনে নিজেকেই দগ্ধ করিয়া অত্যাচারের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে যথেষ্ট হইবে না। আমাদের দেশে শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী যে বধূর উপর অত্যাচার করে, তাহার প্রধান কারণ সুধু অশিক্ষা বা কুশিক্ষা নহে; যেহেতু বর্ত্তমানকালে যাহাকে সুশিক্ষা বলা যায়, ভর্ত্তায় তাহা বিদ্যমান থাকিতেও বহুক্ষেত্রে অত্যাচারের কিছু অপ্রতুলতা হয় না; অতএব অশিক্ষা বা কুশিক্ষাকে দায়ী করিয়া সৎশিক্ষা দ্বারা সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে গেলে বধূকুল এখনও অনেক দিন মরিতে থাকিবেন।

"মায়ে পোয়ে" বধূর গণ্ডে খুন্তি পোড়াইয়া দেওয়া বা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া মারার নিগূঢ় কারণ আমাদের দেশের সনাতন কালের প্রবচনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—"ভাগ্যিবানের মাগ মরে, অভাগ্যিবানের ঘোড়া মরে"—যার ঘোড়া মরিল, সে অভাগা এই হেতু যে, পুনশ্চ অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে ঘোড়া কিনিতে হইবে। আর যার "মাগ" মরে সে এই হতভাগ্য দেশে ভাগ্যবান এই হেতু যে, তাহাকে পয়সা খরচ করিয়া ত পুনশ্চ "মাগ" কিনিতেই হইবে না, পরন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার যতবার খুসী অর্থসঞ্চয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। ধোপার ঘরে আগুন লাগিলে, বা চুরী হইলে, মাড়োয়াড়ী

গণেশ উল্টাইলে যেমন তাহারা ধনবান হয়, মৃতদার বাঙ্গালীর ছেলের, স্ত্রীর মৃত্যুর সংখ্যার অনুপাতে, ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব অত্যাচার করিলে যখন এই আক্রাগণ্ডার দিনে উপায়ের সুবিধা হয়—মূর্খ বাঙ্গালী, যুবক প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, এত মূর্খ নহে যে, সে ধনাগমের পথ বন্ধ করিবে।

অতএব কমলাকান্তের উপদেশ, হে অত্যাচারিত বধূ, তুমি অত্যাচার সহ্য করিয়া নিজের মস্তকে ভগবানের রোষবজ্র পাতিত করিও না ; অত্যাচার ফিরাইয়া দিবার তোমার অধিকার আছে—তা সে ভর্ত্তাকেই হউক বা ভর্তৃজননীকেই হউক। নিঃশব্দে নীরবে অত্যাচার সহ্য করার বাহাদুরী অপেক্ষা অত্যাচারীর শাস্তিবিধান করায় গৌরব বেশী। শেষে যদি পুড়িয়াই মরিতে হয়, তোমার গহনাগাঁটী গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিয়া, তোমার সাড়ী, জ্যাকেট, সেমিজ, বাক্স, পেঁটরা—সমগ্র গৃহস্থালীতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, তাহার মধ্যে পুড়িয়া মর—তাহাতে তোমার কল্যাণ, তোমার পরবর্ত্তিনীর কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, আর শয়তানের শাস্তি হইবে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা, উপদেশ, নাটক, গল্প, গান, শাস্ত্র, যুক্তি—অনেক ভেষজ এই উৎকট ব্যাধির নিরাকরণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হয় নাই। পাপ বড় ভীষণ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও ভীষণ হওয়া উচিত।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৩

৪৫

"রক্ষে কালী"

প্রসন্ন খুব চিন্তান্বিত হয়েই আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিল। বল্লে—"বড় মুস্কিলেই পড়েচি"।

আমি। কি হ'ল আবার? মুস্কিল ত' লেগেই আছে; সমস্ত জীবনটাই একটা বিরাট রকমের মুস্কিল, জানলে প্রসন্ন! ওতে অত বিচলিত হ'লে চলে না। জীবন-নদীর স্রোতটাকে অখণ্ড অব্যাহত রাখতে গেলে, অসমতল ক্ষেত্র চাই; ভগবান পৃথিবীকে যে অখণ্ড মণ্ডলাকার করেচেন তার মানে আছে; সব সমান সমতল হ'লে নদীর স্রোতটা থেমে যায়; স্রোতটা থেমে গেলে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছান যায় না—উঁচু থেকে নীচু, এপার থেকে ওপার, ধাক্কা খেতে খেতে, এঁক্‌তে বেঁক্‌তে, উঠতে পড়তে কল্লোলময়ী জীবন-নদী "কালসিন্ধু-নীরে" গিয়ে মেশে, তখন সব মুস্কিলের আসান হ'য়ে যায়—

আমি বক্তৃতা করেই যেতুম, কিন্তু প্রসন্নর ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল দেখে থেমে গেলুম। প্রসন্ন বল্লে—"মাথা খারাপ হয়েচে জানলে তোমার কাছে আসতুম না।"

আমি জানি সব বড় কথাকেই মাথা খারাপের কথা বলে'

ক্ষুদ্র-বুদ্ধিরা গ্রহণ করে' থাকে, তাই আমি প্রসন্নর উপর রুষ্ট হলুম না ; কবি বলেচেন—

পাগলকে যে পাগল ভাবে
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।

কিন্তু উপস্থিত, প্রসন্ন চটে উঠে যায় এই ভয়ে বল্লুম—"তা মুস্কিল, কিসের বল না, আমি আসান করে' দিচ্চি।"

প্রসন্ন। কাল সন্ধ্যার সময় একদল ছেলে "রক্ষে-কালী"র চাঁদা চাইতে এসেছিল, আমি বলেছিলুম আমার যা সাধ্য তাই দেবো। তারা যাই চলে' গেছে, আর একদল এসে বল্লে—'মাসি, চাঁদা যদি দেবে ত আমাদের হাতে দেবে, খবরদার ওদের হাতে দিও না।" আমি বল্লুম—"বাপ সকল, ওরা আর তোমরা কি তফাৎ? আমার ত সবাই সমান—তোমরা সবাই আমার সোনার চাঁদ—"

প্রসন্নর কথার বাঁধুনি শুনে বিস্মিত হলাম না ; কোন এক বিদুষী স্বজাতীয়া সম্বন্ধে বলেচেন—"Woman is a born actress". প্রসন্নর এই অভিনয়কুশলতা দেখে সেই বিদুষীর কথা মনে পড়ল ; কারণ আমি জানি প্রসন্নর স্বাভাবিক মূর্ত্তিটা অত নরম নয়—সেটা উগ্রচণ্ডীরই মূর্ত্তি। সে ইচ্ছা কল্লে বাছাদের অক্লেশে দুটা স্পষ্ট কথা বলে' খেদিয়ে দিতে পারত, তা দেয়নি। কেন দেয়নি তা'ও বুঝতে পারলুম—ঐ "রক্ষে কালী"র নামটার জন্য ; প্রসন্ন ঐখানটাতে একটু জখম।

কথার বাঁধুনির তারিফ করে' আমি বল্লুম,—"প্রসন্ন, তুমি নেতা হ'লে না কেন? জননায়ক হ'লে না কেন? বেশ ত কথার হার

গাঁথা শিখেচ ; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, চতুর্দ্দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে শিখেচ ; এ বিদ্যার পরিচয় তোমার ত পাইনি—

প্রসন্ন। শোন—শোন, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। এই খানেই শেষ হ'লে না হয় দু'দলকেই চুপি চুপি কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতুম। দুইএর নম্বর ছেলের পাল আমার উঠান থেকে গেছে-কি-না-গেছে, আর এক দল এসে হাজির। তারা খুব তেরিয়া হ'য়ে বল্লে,—"দেখ, মাসি, 'রক্ষে কালী' নিয়ে উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়ায় দুটা দল হয়েচে। খবরদার, কাউকে চাঁদা দিও না—ও রক্ষেকালী ফক্ষেকালীতে কিছু হবে না।" এখন কি করি—

আমি। দেখ, সব ছেলেদের শিবতলার উঠানে ডেকে এনে তোমার যা দেবার হরির লুটের মত ছড়িয়ে দাও, যে যা পারে কুড়িয়ে নিয়ে যাক, কোন গোল থাকবে না।

প্রসন্ন। তা'তে কি হবে জান, আমার টাকাও যাবে, আর কেউ সন্তুষ্টও হবে না ; সবাই চটে থাকবে, কোন্ দিন আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

আমি। আচ্ছা তবে এক কাজ কর—সবাইকে বল—"আমি কাউকে আগে টাকা দেবো না, তোমাদের কালীপূজা চুকে যাক, তারপর আমার যাকে যা দেবার দেবো।" যেহেতু 'রক্ষেকালী' পূজার পর আর কোন গণ্ডগোল থাকবে না ; সব এক হ'য়ে যাবে—এ কাজের দস্তুরই এই।

তখন প্রসন্ন আমাকে পেয়ে বসল ; বল্লে,—"যদি তাই হয় ত, তুমি গিয়ে তাদের বলে' এস না কেন!"

আমি। তা'ও কি হয়, অযাচিত উপদেশ দিতে নেই—আসুক

তারা আমার কাছে, বলুক আমাকে তাদের বক্তব্য, সাধুক তারা আমার বাণী, তখন আমি আমার বাণী ছাড়ব। আর তারা আমার কথা ত চায় না, চায় তোমার টাকা; অতএব আমার কথা নিতান্তই অবান্তর, এমন কি অপ্রিয়ও হবে।

প্রসন্ন আমার কথায় তার উপস্থিত বিপত্তির কোন প্রতিকারের সন্ধান না পেয়ে মুখখানা তোলো হাঁড়ি করে' বসে' রইল। পরে বল্লে,—"আচ্ছা তুমি কেন তাদের ডেকে, তাদের দলাদলিটা মিটিয়ে দাও না, তা হ'লেও একটা উপায় হয়।"

আমি। দলাদলি ত আমি মেটাতেই পারি না, এবং মনে করি হয় ত মেটান উচিতও নয়; এই দলাদলির ভেতর থেকেই শুভ মিলনের ভিত্তি গজিয়ে উঠবে, (দলিত নখরের তলে অলক্ষিতে যেমন নূতন নখ গজায়) গ্রামের কল্যাণ হবে। তখন যা হয় করা যাবে—

বাস্তবিক আমি দেখলুম "রক্ষেকালী" পূজাটা কিছুই নয়, একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ওটা ঠিক Council entry'র মত—Council থেকে স্বরাজ গজাবে না, I have no faith in the Councils giving us Swaraj; তবে এই Council entry-রূপ "রক্ষে-কালী" পূজা নিয়ে যে গণ্ডগোল, দলাদলি সেটাই পরম কল্যাণের নিদান—It is like the wars of the Roses. তারপর, দলাদলিটা ঐ ছোঁড়াগুলোরই মধ্যে; ঠাকুরতলায় হরে, শ্যামা, যেদো, মেধো, এমন কি রহিম, রহমান পর্য্যন্ত সবাই গিয়ে জোড়হাত করে' দাঁড়াবে, এবং এই দলাদলির পর একটা বিরাট শক্তিশালী জাতির উত্থান হবে—Out of it will arise a mighty nation. এখন

বিভিন্ন পক্ষের চাঁইদের মধ্যে আমি ভালমন্দ বিচার পর্য্যন্ত কর্ত্তে চাই না, **Who shall say that only one is right ?**

. . তারা সবাই আমার ভাল
কেউ বা দিব্যি গৌর বরণ
কেউ বা দিব্যি কাল।

I can make room for all these various schools of thought—পরে পরস্পর যুদ্ধ মিটে গেলে—**when the storm is over and parties are united** তখন আমি—

প্রসন্ন বিরক্ত হ'য়ে বলে' উঠল—"আমার দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে কচ্চে—"

আমি বল্লাম,—"সেও মন্দ নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য সে পথও আবিষ্কৃত হয়েচে—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা—মক্কায় না যেতে পার, নিদেন পেঁড়োয় অর্থাৎ চন্দননগর যাও।"

প্রসন্ন। দেশের মঙ্গলের জন্য ত আমার ঘুম হচ্ছে না—

প্রসন্ন ত রেগে বেরিয়ে গেল ; আমার ঝিমুনি ধরল, সেই আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণের মধ্যে দেখলুম—রণরঙ্গিণী করালী নৃমুণ্ডমালিনী মাতা "নিজ শিব ভাঙ্গিছে চরণ ঘায়"—আমার চোখে অগ্নি জ্বলতে লাগল, আবার তখনই জলে ভরে' উঠল—দেখলাম মাতার ভ্রূকুটির ভিতর হাসি, খর্পরের সঙ্গে বরাভয় !

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৩

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না

বাবুর বাড়ীর হরে চাকর অল্প মাইনে পায়, এই আক্রাগণ্ডার দিনে তার কড় কষ্ট। সে তার এক বন্ধুর কাছে তার দুঃখের কথা বলে' পরামর্শ চাইলে।

বন্ধু তাকে উপদেশ দিলে—"তুই বাবুকে বল্—'বাবু, আমার এই অল্প মাইনেয় চলে না; মাইনে বাড়িয়ে দিন নইলে আমি—' বস্ এই পর্য্যন্ত বলে' থেমে যাবি; বাবু মনে করবে নইলে তুই অন্য চাকরির চেষ্টা করবি।"

হরে তাই করলে—বাবুর তামাক সেজে এনে, জোড়হাত করে' বল্লে—"বাবু আমার এই অল্প মাইনেয় চলে না; কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিন নইলে আমি—"

বাবু। নইলে তুই কি? করবি কি?

হরে। নইলে আমি এই মাইনেতেই আপনার চাকরি করব!

হরেটা মূর্খ, আর তোমরা খুব পণ্ডিত, তোমরা এই কথা ত বলতে চাও? কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে হরিচরণের কোন পার্থক্য দেখতে পাই না!

এই অন্নকষ্টের দিনে, তোমাদের অর্থকষ্ট বাড়চে বই কমচে না;

তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিটি কমিশন বসচে, কারণটা ধরাও পড়চে ; তোমরা হরিচরণের মত কর্ত্তার কাছে আরজি পেশ করে' দাঁড়িয়েছ—কাগজে কলমে বক্তৃতায় বলচ—যদি এ দৈন্যের প্রতিকার না হয় তা হ'লে—

কর্ত্তা বলচেন,—"কি তা হ'লে ? করবে কি ?"

তোমরা বলচ,—"আজ্ঞে, তা হ'লে আধপেটাই খেতে থাকব।"

*

আইনের চক্ষে সাদায়-কালায় প্রভেদ নেই, কিন্তু আইন-প্রয়োগ-কর্ত্তাদের অনেকের চক্ষু একটু টেরা ; এটা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চ এবং তার জন্য ভোগও ভুগচ। কর্ত্তার কাছে, জোড়হাত করে' দাঁড়িয়ে বলচ—"ধর্ম্মাবতার, এ অধর্ম্ম দূর কর, দূর কর, না হ'লে—"

কর্ত্তা বলচেন—"না হ'লে কি ? করবে কি ?"

তোমরা বলচ—"কি আর করব, যা করচি তাই করব, স'য়ে যাব।"

*

দেশের লোক অন্ধকারে, গ্রামে গ্রামে স্কুল কর, অজ্ঞান তিমির নাশ কর ; কর্ত্তা, আলো দাও, আরও আলো দাও ; যদি না দাও তা হ'লে—

কর্ত্তা বল্লেন—"যদি না দি, তা হলে কি ? করবে কি ?"

তোমরা বলচ—"তা হ'লে অজ্ঞান তিমিরেই থাকব।"

*

আমার ঘরে আমি পর ; সিন্ধুক আমার, চাবিকাটিটী তোমার ; দাও আমার চাবি আমার হাতে, আমার ঘর সত্য সত্য আমার ঘর হোক। যদি না দাও তা হ'লে কিন্তু—

কর্ত্তা বল্লেন—"তা হ'লে কিন্তু কি ? করবে কি ?

তোমরা বল্লে—"তা হ'লে আমার ঘরে পর হয়েই থাকব।"

জবরদস্ত বল্লে - তোমার টাকার বাদ্যি সুমিষ্ট—Flood Relief-এর সময়, আর হুণ্ডি কাটবার সময় তা বুঝতে পারি ; কিন্তু তোমার ঢাকের বাদ্যি আমার কানে সহে না ; ঢাক থামাও আর টাকা দিতে থাক।

সাত্ত্বিক বল্লে -"যদি তাই করতে হয় তা হ'লে কিন্তু —"

জবরদস্ত বল্লে—"তা হ'লে কি ?"

সাত্ত্বিক বল্লে—"ঢাক বন্ধ, টাকা লও।"

আমরা জানি ব্যবসায় তোমার জান্, তোমার ধর্ম্ম, তোমার ইজ্জৎ ; আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি স্বচ্ছন্দে না করতে পাই তা হ'লে—মাড়বাড়ি বল্লে – আমরা কিন্তু—

ব্যবসাদার চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বল্লে—"কি তা হ'লে ? করবে কি ?"

মাড়বাড়ী বল্লে—"তা হ'লে Lucky Dayতে যেমন indent দি তেমনি দিব !"

কন্যার বিবাহ হয় না—বরকর্ত্তা, বরগিন্নী, বরপুত্র, সবাই টাকা চায় ; বাপের চৌদ্দপুরুষে যত টাকা একত্রে দেখে নি, দেখবে না, তারও অধিক চায় ; কন্যার বিবাহ হয় না ; তুমি চীৎকার করতে থাক—"এ শোষণ নিবারণ কর, সমাজ গেল, জাত গেল।" এ অরণ্যে রোদন কে শোনে ? তখন জ্বালার চোটে তুমি বলে' উঠলে—"তা হ'লে কিন্তু—"

ত্রিমূর্ত্তি ছয়টা চক্ষু রাঙ্গিয়ে বল্লে—"তা হ'লে কিন্তু কি? করবে কি?"

তুমি উত্তর দিলে—"জাত বাঁচাব, চাঁদা করে' জাত রক্ষা করব, থিয়েটারে benefit night জোগাড় করেও জাত বাঁচাব—টাকা দেবো।"

*

সমাজের দশা হ'ল কি?—বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে, কিন্তু এ বুভুক্ষিত দেশে সে পিত্তি ত কারও পড়ে না! কন্যাগুলা কি ভেসে এসেচে? এ রকম কন্যার প্রতি অত্যাচার কি এই সনাতন ধর্ম্মের রাজ্য ছাড়া আর কোথাও হয়? অসীম ধৈর্য্যের সহিত পরিণয়-সরিৎপারগমনেচ্ছু বুড়া হনুমানকে বুঝাও, বিবাহের পরিবর্ত্তে বৈতরণীর ব্যবস্থা করতে উপদেশ দাও, বুড়া বাঁদর নাচতে শিখে না তথাপি চেষ্টা কর—যদি এত শিক্ষা এবং উপদেশে না শিখে তা হ'লে –

বৃদ্ধ টাকার থলি দোলাইয়া, পুরোহিত রজঃস্বলা শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া, বলিল—"তা হ'লে কি?"

তুমি অভাগিনীর জন্মদাতা বলিলে—"তা হ'লে—বিবাহ দিব আর কি?"

*

ভণ্ডামিতে দেশ ছাইয়া গেল।

বঙ্গমাতার পিণ্ড চড়েচে
আলোচাল আর কাঁচকলাতে।

এই যে সনাতন ভিয়ান চড়েচে তা'তে বর্ত্তমান জীবনের খোরাক জুটবে না; পরকালের ভোজ্য যে অমৃত তারই পূর্ব্ব সংস্করণ হ'তে পারে

আলোচাল আর কাঁচকলা—কিন্তু ইহজীবনের সহস্র জটিল জখমী কার্য্যে শক্তি দান করতে পারে এমন সারবস্তু তা'তে নেই। যদি থাকে, হে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ! শাস্ত্রবাক্যের এমন অর্থ কর যেন এই জীবন-যজ্ঞের সজীব মন্ত্র হ'য়ে আমাদের শক্তি দান করে, বিচক্ষণতা দান করে, বিক্রম দান করে! তা যদি না পার, তা হ'লে কিন্তু—

ভণ্ড শিখা হেলিয়ে বলে' উঠল—"কি তা হ'লে? করবে কি?

তুমি বল্লে—"তা হ'লে ষষ্ঠী, মাকাল ও ওলাইচণ্ডীর পূজা করব, আর তোমার পাদোদক পান করব।"

*

কাবুলিওয়ালা অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য উনানে পা দিয়ে দাঁড়ায়, তোমার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ করে—প্রসন্ন বাকী টাকা আদায়ের অন্য উপায় না পেলে, খোকার দুধ বন্ধ করে' দেয়, আর তোমরা তোমাদের জীবনের শত শত অনাদায়ী দাবীর পূরণ প্রার্থনা করতে গিয়ে, হরিচরণের মত সুধু—"তা হ'লে কিন্তু—" বলেই থেমে যাও! তোমাদের সকল আন্দোলনের মধ্যে—রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, ধার্ম্মিক আন্দোলনের মধ্যে দেখি—ঐ এক স্থানেই এসে দাঁড়িয়ে পড়—তারপর চেপে ধরলেই যা কর্‌ছিলে মুখটি বুজে তাই করতে থাক।

আমি জানি কেন? যা চাচ্চ তা না পেলে তুমি কি করবে তা জান না; অথবা মনে মনে জানলেও রক্তচক্ষুর সমক্ষে মুখ ফুটে বলতে পার না। কিন্তু মুখ ফোটো, নহিলে—বুক ফাটবে!

১৪ই আশ্বিন, ১৩৩৩

৪৭

ঘড়ি মিলাও

ঘড়ির কাঁটা ঘুরিতেছে—কালের নিঃশব্দ পদক্ষেপ মাপিয়া মাপিয়া চলিতেছে। কিন্তু যদি দম ফুরায় বা চাকায় চাকায় বাধিয়া যায়, কাঁটা থামে বটে, কিন্তু কালের গতি অবাধে চলিয়া যায়, ঘড়ি থামিলে কালস্রোত থামে না।

আবার, কাঁটা উল্টাদিকে ফিরাইয়া দিলে, সময়-স্রোতে উজান বহে না; কালস্রোত বহিয়াই চলে—ধীরে নিঃশব্দে অব্যর্থ প্রবাহে বহিয়া চলে। যে সেই ঘড়ির উল্টা কাঁটার উপর চক্ষু রাখিয়া কালের বিসর্পণ লক্ষ্য করে সেই পিছাইয়া পড়ে, স্রোত বহিয়া চলে।

আমি দেখিতেছি দেশ জুড়িয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিশ্বের ঘড়ির সঙ্গে টোলের ঘড়ির মিল নাই। কোথায় চাকায় চাকায় আটকাইয়া গিয়াছে—টোলের ঘড়ি এক অতীত যুগের মধ্যাহ্নকাল নির্দ্দেশ করিয়া থামিয়া গিয়াছে—টোলের পণ্ডিত আঙ্গুল দিয়া ঐ ঘড়ির বুকে মধ্যাহ্নভাস্করের স্থিতিকাল দেখাইয়া বলিতেছেন—দেখ আমরা কোথায়!

কিন্তু বিশ্বের ঘড়ি বলিতেছে—তোমার মধ্যাহ্ন গিয়াছে,—সন্ধ্যা আসিয়াছিল,—তামসী নিশীথিনী আসিয়াছিল—এখন ঐ দেখ নবারুণ-রাগ প্রাচীর গগনে উদীয়মান।

টোলের অধ্যাপক বলিতেছেন—তা'ও কি হয়? ঐ দেখ না মধ্যাহ্নের পদচিহ্ন—ঐ দেখ না ঘড়ির কাঁটার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ।

এই যে দুই ঘড়িতে অমিল, ইহাতে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে—এ গণ্ডগোলে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। মাঝে যে একটা সমগ্র রাত্রি কাটিয়া গেল—সে কথাটা টোলের অধ্যাপককে বুঝান যাইতেছে না, তিনি সেই মধ্যাহ্নের কাঁটার দিকে তাকাইয়া স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন,—বলিতেছেন—ঐ রক্তিমা যদি সত্য সত্যই নবযুগের উষারাগই হয়, তাহা হইলে ত দ্বিপ্রহর আগতপ্রায়; আবার মধ্যাহ্ন সূর্য্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিবে, আমার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিবে!

কিন্তু কে বুঝাইবে পণ্ডিত মহাশয়কে যে, যদিই বা তাই হয়, প্রদীপ্ত তপন ভারতের ভাগ্য-আকাশে বিরাজ করে, আবার মধ্যাহ্ন আসে, সে অনাগত মধ্যাহ্ন এবং বিগত মধ্যাহ্ন এক হইবে না।

কমলাকান্তের দুঃখ এই—প্রবহমান কাল যে তোমার কর্ণে সন্ধ্যার করুণ পূরবীতে মরণের গান গাহিয়া গেল, তারপর মৃত্যুর অন্ধকারে, সুদীর্ঘ রজনীর তমিস্রার মধ্যে যে বিভীষিকা ও দুঃস্বপ্ন দেখিলে—সে কি সব ব্যর্থ যাইবে? ভ্রান্ত পথিক যে পথ হারাইয়া মৃত্যুর কবলে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল—অতীত গৌরব, অতীত জ্ঞানগরিমা, অতীত কীর্ত্তি ভুলিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল—সে মোহ, সে মৃত্যু কি ব্যর্থ যাইবে? কিছুই ত ব্যর্থ যায় না। ঐ নবারুণ জ্যোতি যুগপৎ তোমার মরণ ও পুনর্জ্জন্মের বার্ত্তা আনিয়াছে—স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ করিলেই জাগিবে, স্মরণ করিলেই বাঁচিবে। "রাত্রির্গতা মতিমতাম্বর মুঞ্চ শয্যাং"—ঐ বৈতালিকী দিগন্ত ভরিয়া উদ্গীত

হইতেছে। হে মতিমান্, জাগো জাগো। কিন্তু মনে রাখিও তুমি মরিয়াছিলে, জাগিতেছ, কালনিদ্রার পর তোমার জীবনে নব সুপ্রভাতের ভৈরবী বাজিতেছে!

পণ্ডিত মহাশয়ের ঘাড় বন্ধ; তথাপি তিনি বলিতেছেন—মরি নাই, বাঁচিয়া ছিলাম, বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিব।

এ গর্ব্বের মূলে একটি সত্য আছে—কিছুই একেবারে মরে না, কীটপতঙ্গ হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত। জীবনের প্রবাহ চলিয়াই চলে, মৃত্যুর পর জন্ম, এ নাগরদোলা ঘুলিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হয় বলিয়া মৃত্যু মৃত্যু নহে, অথবা জন্ম মৃত্যু একই ঘটনা তাহা বলা চলে না।

বাঙ্গালায় যখন বক্তিয়ারের বাহিনী আসিয়া দেশকে গ্রাস করিল, হে বাঙ্গালি, তার পূর্ব্ব হইতেই তুমি মরণের পথে আগুয়ান হইয়াছ; ঐ নিদারুণ ঘটনার বহু পূর্ব্বে মৃত্যুর ছায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তারপর সুদীর্ঘ অন্ধতমসা তোমার কুটীর-খানিকে ঘিরিয়াছিল—তখন তোমার সেই ভগ্নকুটীর বেড়িয়া বেড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনের খোলই বাজুক, অথবা তোমার উঠানে হাড়িকাট ছাগরক্তে রঞ্জিতই হউক—তুমি কালনিদ্রায় বিভীষিকা দেখিতেছিলে। তোমার তেজ, তোমার তীক্ষ্মবুদ্ধি, তোমার স্বাচ্ছন্দ্য স্বাবলম্বন সবই অন্তর্হিত হইয়াছিল—তোমার জ্ঞানের পরিধি এই সুদীর্ঘ কালে এক-পর্ব্ব পরিমাণও বাড়ে নাই। তোমার ঐ দ্বিপ্রহরে যে ঘড়ি থামিয়াছিল তাহা থামিয়াই রহিল—সন্ধ্যা এল, ঘোর অমানিশায় ঘিরিল, ঘড়ি থামিয়াই রহিল। তুমি স্বগৃহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রসন্নর পবিত্র গো-গৃহে কমলাকান্তের মত, বেওয়ারিশ পরলোকে বাস বাঁধিবার

ব্যবস্থায় মগ্ন হইলে—একদিকে খোল বাজিল, শিঙ্গা ফুকারিল, অপরদিকে ছাগশিশু মরিল—কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালায় তুমি বাঁচিলে না, ঘড়ির কাঁটাও নড়িল না।

পণ্ডিত বলিলেন, ঐ যে কাঁটা অচল দেখিতেছ তাহার অর্থ—সকল দিকে আমাদের চরম চরিতার্থতা আসিয়াছে—হিমাদ্রি শিখরের মত বাড়িয়া বাড়িয়া স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—অগাধ জলধির মত পৃথিবীর কূলে কূলে হানিতেছে, পাতাল পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে—আমাদের পুরুষার্থ। উহাদের ঘড়ির মাথামুণ্ড নাই—ক্ষণে ক্ষণে তার পরিবর্ত্তন—আমার ঘড়ি স্থির ও সুনিশ্চিত—

পণ্ডিত বলিতে চাহেন—যে, জ্ঞানের চরম সীমায় উঠিয়াছি আমরা, তাই—

নাহি আর কালের হিল্লোল
স্থির স্থির সমুদয়
বর্ত্তমান বিরাজিত

ত্রিকাল এক হইয়া আমাদের জীবন কেন্দ্রস্থ, কূটস্থ হইয়া আছে—ইহার না আছে মৃত্যু, না আছে পরিবর্ত্তন।

এই দম্ভ মৃত্যুর সূচনা করিয়াছিল—যেদিন সকল জ্ঞান হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়াছ বলিয়া দম্ভ করিয়াছ, হে পণ্ডিত, সেই দিনই তোমার ঘড়ির দম ফুরাইয়াছে—তোমারও দম ফুরাইয়াছে; ঘড়ি থামিয়াছে—তুমিও থামিয়াছ; সঙ্গে সঙ্গে তোমার শ্রুতি থামিয়াছে, স্মৃতি থামিয়াছে, কাব্য থামিয়াছে, চতুঃষষ্টি কলা থামিয়াছে, চিকিৎসা থামিয়াছে, বিজ্ঞান থামিয়াছে, অর্থশাস্ত্র থামিয়াছে, নীতিশাস্ত্র থামিয়াছে!

ফল হইয়াছে—পণ্ডিত মহাশয়ের সময়ের ধারণা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তিনি চারি যুগ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই চারি যুগের বিভাগ, আদি অন্ত মধ্য, বর্ষ মাস দিন, ঘটনার পূর্ব্বাপর, অগ্রপশ্চাৎ এ ধারণা লোপ পাইয়াছে; ঘড়ি থামিলে কি সময়ের খেয়াল থাকে? মৌজের মাথায় কমলাকান্তের মত—অন্ধ জাগো! না—কিবা রাত্রি কিবা দিন, এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় মনে করেন যেন মনু যাজ্ঞবল্ক্যের পর, পরাশর আদি হারীতের পরই, হলায়ুধ এবং রঘুনন্দন ও তাঁর অব্যবহিত পরেই তাঁহারা স্বয়ং। মনু হইতে টোলের স্মৃতিতীর্থের মধ্যে যে যুগ-যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে—তাহার সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা মনু পড়িতে পড়িতে পরাশর পড়েন, তারপর একলম্ফে রঘুনন্দনে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সে যে কত বড় লম্ফ তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। বায়ুপুত্র সাগরলঙ্ঘনে যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন সে লম্ফ ইহার তুলনায় কিছুই নহে। অন্তরীক্ষচারী হনুমতের নিম্নে কয়েক যোজন মাত্র সমুদ্রজলরাশি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু মনু হইতে স্মৃতিতীর্থ পর্য্যন্ত এক বিশাল কালসমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে—সে সমুদ্রের তরঙ্গবিভঙ্গ পণ্ডিতগণের নয়নগোচরই হয় না।

বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ চৈতন্য যেন পাশাপাশি মিউজিয়মে সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তি সকল তাঁহাদের কল্পনার Curiosity shopএ সাজান আছে—তেমনি অচল ও জড়। শরতের নৈশ আকাশে কত গ্রহ-তারকা জ্বলিতেছে, যেন একখানি দিগন্তপ্রসারিত নীলাম্বরী শাটীতে সোনারূপার ফুল জ্বলিতেছে; কিন্তু ঐ গ্রহতারকার মধ্যে কত লক্ষ কোটি যোজন ব্যবধান শিশু কল্পনায় যেমন ধারণাই হয় না—

ভারতের অতীত ইতিহাসের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গগনে বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ ইত্যাদি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে তেমনই ব্যবধান, কত বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান—টোলের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের শিশু-সুলভ কল্পনায় তাহার ধারণাই করিতে পারেন না।

কিন্তু এই কল্পান্তকালের ব্যবধান না হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ভারতের ঐতিহাসিক আকাশের জ্যোতিষ্কগণের আকার প্রকার, গুরুত্ব গৌরব, সম্যক উপলব্ধি হইবে না। এই ব্যবধানের মধ্যে যে সমগ্র জাতির উত্থান পতন, জীবন মরণ, সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত কালের অব্যাহত স্রোতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সম্যক ধরিতে না পারিলে, বুদ্ধ শঙ্কর ইত্যাদির কথা ও কার্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে না—একথা টোলের পণ্ডিতগণ বুঝিতেছেন না।

আমি একদিন গঙ্গায় খেয়া পার হইতেছিলাম; আমি ছিলাম একলা; নৌকা ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় এক পাল পণ্ডিত শূন্য কলসী ও চিনির ও সন্দেশের পাত্র হস্তে "পারে যাব" বলিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। বুঝিলাম পণ্ডিতগণ কোন শ্রাদ্ধসভার ফেরত। একে একে উঠিলেন তাঁহারা নৌকার উপর—নৌকা ছাড়িয়া দিল। আদর আপ্যায়নের কথা, পাথেয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে, তাঁহারা আমার দিকে কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন আমার হাতে ছিল এক সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্র"; প্রচ্ছদপটে ছিল, তাজমহল বুদ্ধগয়া অশোকস্তম্ভের ছবি; ভিতরে ছিল তাম্র-শাসনের চিত্র, আর কয়েকজন মুসলমান নবাব নাজীমের ছবি! জনৈক পণ্ডিত পুস্তকখানি আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া পাতা উল্টাইয়াই আমাকে ফেরত দিলেন এবং নাসা কুঞ্চিত করিয়া

বলিলেন—"ম্লেচ্ছগণের কথা"। আমার মনে হইতে লাগিল চিনি-সন্দেশ দিয়া এ পণ্ডিত পোষণের আর কোন সার্থকতা নাই। চিনি-সন্দেশের বদলে এক এক গাছি দড়ি, শূন্য কলসী ত আছে এবং এই ভরা গাঙ্গে বৈতরণী পারের ব্যবস্থা করা উচিত।

পণ্ডিতগণকে বুঝিতে হইবে এই ম্লেচ্ছ কেমন করিয়া এই হিন্দুর ভারত অধিকার করিয়া বসিল। পণ্ডিত মহাশয়েরা ত সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে কোন্ ছিদ্র দিয়া বিষধর এই লোহার বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া লখিন্দরের পরমায়ু শেষ করিল। তারপর বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া বাঙ্গলা তথা ভারতের মসনদে বসিয়া ম্লেচ্ছ কি লইল, কি দিল। তবেই চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবের মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত, রামপ্রসাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস, আউলিয়া চাঁদের কীর্ত্তিগাথা ও কমলাকান্তের মর্ম্মবাণী বুঝিতে পারিবে।

এই প্রকার, চাতুর্ব্বর্ণ্যের লীলাভূমিতে কেন রাজপুত্র ভিখারী-বেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতির বেড়া ভাঙ্গিয়া তেত্রিশকোটী দেবতার পূজা উঠাইয়া দিল; কোন্ মন্ত্রে সাগরমেখলা ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল; আবার কোন্ অপরাধে সে সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল—বুদ্ধ ও শঙ্করের পূর্ব্বে মধ্যে ও পরে কি বিপর্য্যয় হইয়া গেল তাহার পরিচয় না পাইলে—বুদ্ধকেও বুঝা যাইবে না, শঙ্করকেও বুঝা যাইবে না।

কারণ একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে, মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মানুশীলনই যদি পুরুষার্থ হয়, জাতীয় জীবনই সে ধর্ম্মের উৎস, —পুস্তক নহে, পুঁথি নহে, টীকা নহে, ভাষ্য নহে। এই জীবনের

গতি, এই জীবনের অনুভূতি না হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সুধু পুঁথি ও ভাষ্য পাঠ করিয়া ধর্ম্মেরও গূঢ় অভিসন্ধি বুঝা যাইবে না। জীবনপ্রবাহ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পরিবর্ত্তনের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

অর্থাৎ ইতিহাসই পুস্তকের, ধর্ম্মপুস্তকেরও, যথার্থ প্রবক্তা, ব্যাখ্যাতা, ভাষ্যকার—সেই ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে একটি Historic sense ফুটাইতে হইবে এবং Historic perspectiveএর ভিতর দিয়া অতীতকে দেখিতে হইবে, তবে দেখার মত দেখা, বুঝার মত বুঝা, পাঠের মত পাঠ সম্ভব হইবে; নহেত সত্যসত্যই "পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা" তাহা "পরহস্তগতং ধনং" হইয়া থাকিবে।

আমি একবার বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই অপূর্ব্ব মন্দির দেখিয়া মন্দির প্রাঙ্গনের প্রান্তভাগে অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি, একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে বলিল—"মহাশয়, পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিলেন না!" আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—"বুদ্ধ গয়ায় পঞ্চপাণ্ডব কি?" পাণ্ডা ছাড়িবার পাত্র নহে—"হাঁ মহাশয়, আসুন দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমি বলিলাম—"আমি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমি বুদ্ধগয়ায় পঞ্চ-পাণ্ডব দেখিব না।"

পাণ্ডা পুরোহিত পণ্ডিত ইত্যাদির Historic sense এবং Historic perspective না ফুটিলে এ অঘটন ঘটিবেই—বুদ্ধগয়ায় পঞ্চপাণ্ডব, কালীঘাটে বিষ্ণু পাদপদ্ম, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি, অযোধ্যায় নিতাই-গৌর, তারকেশ্বরে রাধাকৃষ্ণ!

আমার মৌজে আমি দেখিয়া থাকি বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু, কৃষ্ণ, কিংফুস, রামকৃষ্ণ সব এক বিরাট আসনে বসিয়া আছেন, কিন্তু সে ত মৌজের কথা, পাণ্ডিত্যের কথা নয়। তোমরা তাহা করিলে চলিবে কেন? আমার মত মৌতাতী হও, তখন যাহা খুসী করিও, এখন তোমাদের সে স্বাধীনতা কোথায়?

অতএব বিশ্বের ঘড়ির সঙ্গে মিলাও, তোমার ঘড়ি; বিশ্বব্যাপী যে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ছড়াছড়ি চলিয়াছে সেই নব নব সত্যের সঙ্গে, নবাবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে, মিলাও তোমার পুঁথি, যেখানে না মেলে নির্মম হইয়া তাহাকে ছাঁটিয়া নূতন কথা বসাও, যদি বাঁচিতে চাও। হে দর্পী, যদি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলে তবে সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছ কেন? অতএব সে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে শিখ, তাহা হইলেও একটা উপকার হইবে। বিশ্বের রথ চলিয়াছে—ঘড়ি মিলাইয়া লও, নহেত রথ তোমাকে ফেলিয়া চলিয়াছে, ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩

"দূর নেহি দেখ্‌তা"

নসীরামবাবু পাহাড়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময় একটা পাহাড়ী ছেলেকে চাকর করে' সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এক রকম কুড়িয়ে নিয়ে আসার মতন! কেননা এই পর্ব্বত-বাসীদের মধ্যে সংসার-বন্ধনটা খুব আলগা—কে কার ছেলে, কে কার মা, কে কার ভাই-বোন, সব সময় আমরা ঠিক ধরতে পারি না। পর্ব্বত-গৃহ থেকে যখন নসীরাম বাবুর স্যুট্‌কেস্‌ ব'য়ে খারসান ষ্টেশনে সে আসে, অজানা দেশের সেই যাত্রীটার মনে কি হয়েছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু তার মুখের সরল হাসি দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারত না যে, পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসবার পূর্ব্বক্ষণে, তার আশৈশবের বিহার-ভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তার মনে এতটুকু বিচ্ছেদ-ব্যথার মেঘ দেখা দিয়েছে।

তোড়ে বৃষ্টির পর নর্দ্দমা দিয়ে যেমন জল নামে, দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের খেলাঘরের গাড়িগুলা যখন হুড়্‌ হুড়্‌ করে' এসে শিলিগুড়ি পৌঁছাল—আর দূরে, অতি দূরে আকাশের গায় হিমালয় মেঘের সঙ্গে মিশিয়ে গেল, তখন বেচারার মুখখানা কেমন একটু যেন বিশুষ্ক হ'য়ে উঠল। শিলিগুড়ি ছেড়ে ডাকগাড়িখানা যখন হাওয়ার গতিতে কেবলই দৌড়াতে থাকল, তখন সেই পাহাড়ী বালকের মুখ দেখলে বোঝা যেত যে, তার প্রাণটা শূন্য হ'য়ে

গিয়েছে। সে দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' ব'সেছিল,—খুব কাছের জিনিষগুলাও সে যেন দেখতেই পাচ্ছিল না। রাত্রি এল, সে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রভাত হ'লে গাড়ি এসে থামল শিয়ালদা ষ্টেশনে—বিপুল জনতা আর কোলাহলের মধ্যে বেচারা দিশেহারার মত হ'য়ে গেল। নসীরামবাবু একখানা খোলা গাড়িতে তাঁর সমস্ত মালপত্র নিয়ে বালকটীকে পাশে বসিয়ে, এ-গলি সে-গলি করতে করতে একটা খুব সরু গলির ভিতর তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত। বেচারা পাহাড়ী ছেলেটার তখন মুখ দেখলে মনে হ'ত—যেন কত দিনের বিরহবিধুর যক্ষ জীর্ণ কারা-প্রাচীরের মত পথের উভয় পার্শ্বের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করে' মাথার উপর যে সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে তাকিয়ে কোন্ মেঘদূতের প্রতীক্ষায় চেয়ে রয়েছে। নসীবাবু তাকে বাড়ীর ভিতর আসতে বল্লেন;—বাড়ীর সঙ্কীর্ণ উঠানে দাঁড়িয়ে সে সেই সুনীল আকাশের দিকেই বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

দিনের পর দিন চলে' গেল, বালকের প্রফুল্লতা ফিরে এল না। একদিন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করার পর বালক উত্তর দিলে যে, তার এ জনবহুল, গৃহবহুল, শব্দবহুল, ধূলিবহুল, ধূমবহুল, দুর্গন্ধবহুল, বিরাট জনপূর্ণ অরণ্যটাকে মোটেই ভাল লাগচে না।

নসীবাবু জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কেন?"

বালকটি অতি করুণ সুরে উত্তর দিলে—"বাবুজি, দূর নেহি দেখ্‌তা!" এই কথা বলে' সে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

নসীবাবু তার কথা কিছুই বুঝলেন না; তিনি বল্লেন—"দূর নেহি দেখ্‌তা কি রে?"

বালক। বাবুজি, যেদিকে তাকাই সেই দিকেই উঁচু দেওয়াল—আমার চোখ যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—দূর দেখতে পাই না।

নসীবাবু। সে কি রে? পাগল হলি না কি?

নসীবাবু বালকের দুঃখ বুঝলেন না,—আমি বুঝলাম। সে হিমালয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে দেখত—উপরে আকাশ এবং হিমগিরির চূড়ার পর চূড়া, নীচে শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা—সুগভীর সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভঙ্গের ন্যায় বিশাল বিপুল বিস্তার দিগন্ত পর্য্যন্ত চলে' গিয়েছে। নয়ন কোনদিকেই প্রতিহত হয় না। নীল আকাশের শুভ্র মেঘ, ভেসে ভেসে সেই দিগন্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়। ঝর্ণার কুলু কুলু স্রোত অবিরাম ব'য়ে, উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে', প্রথমে শীর্ণ, ক্রমে স্ফীত, স্ফীততর রজত-ধারায় ঐ দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিশে যায়। বালক সেই সীমাহীন বিশালতা দেখে দেখে বিমোহিত, মুগ্ধ হ'য়ে যেত—তারই বিরহ আজ তাকে বেদনা দিচ্চে—সে দূর দেখতে পাচ্চে না, তার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠচে।

আবার এমন লোকও আছে, যাকে কারাগৃহের মত ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাচীর, পথের ধূলা. অবিরাম ঘর্ঘর কল-কোলাহল মোহিত করে,—এবং ফাঁকায় দাঁড়িয়ে যার প্রাণটাও ফাঁকা হ'য়ে যায়।

কিন্তু এই দূর দেখাই মানুষের স্বভাব,—দূর দেখাই মানুষের প্রকৃতি। চোখের দৃষ্টি প্রতিহত হ'লেও কল্পনার ত বাঁধ নাই—যেখানে চোখ হার মানে, ঠিক সেইখান থেকে কল্পনা বল্গাহীন অশ্বের মত ছুটতে আরম্ভ করে।

মানুষ আজকের শত কার্য্য-জালের বেড়া থেকে যেমন এক

মুহূর্ত্তের ছুটি পায়, অমনি কালকের কথা ভাবতে থাকে—এই থেকে সঞ্চয়, এই থেকে জীবনের ধারা নির্ণয়, এই থেকে অনাগতের জন্য আয়োজন আপনি আসে। যদি বর্ত্তমানই—অর্থাৎ যেটাকে দেখা যাচ্চে, যা করা যাচ্চে, যা উপভোগ করা যাচ্চে, যা সহা যাচ্চে—সেইটাই শেষ হ'ত, তা হ'লে কালকের জন্য কেউ প্রস্তুত হ'ত না—কল্পনা, আশা বলে' কোন কিছু মানুষকে প্রলোভিত, আকৃষ্ট, বদ্ধ করত না। আবার এইখানেই শেষ নহে—মানুষ জীবনের ব্যবস্থা করে' আবার জীবন-জলধির পরপারের কল্পনাও করে, তার জন্য প্রস্তুতও হয়। অতএব দূর দেখাই মানুষের স্বভাব। যেখানে দূর দেখার ব্যাঘাত,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে চিন্তা করবার অবসর পেলেই মানুষ সেইখানে চিন্তাকুল। দূর-ভবিষ্যতের কথা পরে, নিকট-ভবিষ্যৎও না দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার দেখে, আর তার অন্তর হতাশ হ'য়ে বলে—দূর নেহি দেখ্‌তা!

আমরা সকলেই দূর দেখতে পাচ্চি না; দেখতে পাচ্চি না,—চোখের সন্নিকটে যে বিরাট প্রাচীর আমাদের দৃষ্টিকে প্রতিহত কচ্চে, তাকে ভেদ করে'—দূরে—ভবিষ্যতে—দিগন্তের কোলে কোলে আমাদের জন্য কিসেব পসরা নিয়ে দিক-বালিকাগণ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন—সুখের না দুঃখের, মানের না অপমানের, জীবনের না মরণের—তা আমরা কিছু বুঝতে পাচ্চি না। অর্থাৎ আমাদের কল্পনা, আমাদের দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পর্য্যন্ত পাচ্চে না—আমরা বাঁচব কি মরব তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাচ্চে না।

যারা সেই কথা ভাবচে, তাদের হয় ত অনেকে বলচেন—

পাগল! যে দিন যায় সেই দিনই ভাল, তারপর কি হবে ভাববার কি প্রয়োজন? কিন্তু এ প্রয়োজনের কথাই নয়—ভাবতেই হবে—গড়েচেন যিনি তিনি এমনি করে' গড়েচেন আমাদের, যে, না ভেবে কেউ থাকতেই পারে না। ক্ষণিক ভুলে থাকতে পারে মানুষ, কিন্তু এক সময় না এক সময় তার সে দুর্ভাবনা আসবেই আসবে।

বর্ত্তমানের দুর্ভেদ্য প্রাচার ভেদ করে' দৃষ্টি অগ্রসর হচ্চে না—অথচ যারা দূর না দেখতে পেলে কিছুতেই স্বস্তিলাভ করতে পারে না—তারা হয় পাহাড়ী বালকটির মত বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দূর-দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত কচ্চে—নয় ত, চোখ বুজে কল্পনায় অনাদি অতীতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বর্ত্তমানকে, বাস্তবকে উপেক্ষা করচে, ভুলে যেতে চেষ্টা করচে!

কিন্তু বলাই বাহুল্য—এই দুই শ্রেণীর লোককেই অনেকে পাগল বলচে—অতীত বা অন্তরীক্ষ দেখে দেখে চক্ষু ক্ষরিয়ে ফেল্লেও বর্ত্তমানের কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে না। কিন্তু মানুষ করে কি? দূর না দেখলে সে বাঁচবে না, অতএব হয় কল্পনায় অতীতকে দেখা, নয় ত কল্পনায়-আশায় মিশিয়ে অন্তরীক্ষের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা!

আমি নসীবাবুকে বল্লাম—"এই পাহাড়ের ছেলেটাকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসুন—সে দূর দেখে তার প্রাণরক্ষা করুক।" কিন্তু হায়, কে আমাদের এই কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, সেখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে? স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি,

স্বচ্ছন্দ বিহারের ব্যবস্থা করবে? প্রাচীর ভাঙ্গ বল্লে লোকে বলে—পাগল! বাহিরে চল বল্লে লোকে বলে,—সেটা অনিশ্চিতের রাজ্য, কোথায় যাবে? কিন্তু অনিশ্চিত ত অতীতকে ফিরিয়ে আনা, অনিশ্চিত ত পরপারের প্রহেলিকা! কিন্তু তা বল্লে কেউ শোনে না।

Nations grown corrupt
Love bondage more than liberty
Bondage with ease than strenuous liberty.

দূর দেখা, সুদূর অনাগতের আহ্বানে কর্ণপাত করা যেমন স্বাভাবিক, অনেক দিনের অভ্যাসের বাধন কাটানোও তেমনি কঠিন। এ বাধন সুধু বাজার বাধন নয়, সকল রকম অবিদ্যার বাঁধন—কে মুক্ত করবে?

বসন্ত-পঞ্চমী ১৩৩৩

প্লাবন

কখনও বাদার আবাদের দিকে বেড়াতে গিয়েছ কি? যদি গিয়ে থাক ত একটা আশ্চর্য্য জিনিষ নিশ্চয়ই চোখে পড়ে থাকবে। গ্রামের পাশে পাশে বা মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃহৎ ডোবা, প্রায় একটা কল্পিত রেখার উপর অবস্থিত, যেন একটা সুবৃহৎ ডোবার মালা মাটির উপর বিছান রয়েছে। কোন ডোবার নাম "ঘোষেদের গঙ্গা", কোনটার নাম "মিত্তিরদের গঙ্গা", কোনটার বা "দে'দের গঙ্গা", কোনটার "কুণ্ডুদের গঙ্গা"। তোমরা জান গঙ্গা এক ও অদ্বিতীয়— "মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে" বলে' যাঁকে স্মরণ কর, স্পর্শ কর, প্রণাম কর। যিনি –

নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচল মূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।

কিন্তু বাদায় এতগুলো গঙ্গা এলো কোথা থেকে! আর সে সব গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মালিকের নামে নামাঙ্কিত হ'য়ে—"ঘোষের গঙ্গা", "বোসের গঙ্গা", "কুণ্ডুর গঙ্গা" হ'য়ে গেল কি করে'!

ভৌগলিক বলবেন—হয়ত কোন যুগে গঙ্গার স্রোত ঐ পথে

প্রবাহিত হয়েছিল। তারপর খাত পুরে এসে, একটা অখণ্ড জলধারা খণ্ডিত হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল ; কালক্রমে এই পূরণ কার্য্য আরও অগ্রসর হওয়ায়, জলাশয়গুলি পল্লল বা ডোবার রূপ ধারণ করেচে।—হবে!

তারপর চব্বিশ পরগণার কালেক্টারী তৌজী হাঁটকে দেখলে বোঝা যাবে কেমন করে', কবে ঐ সকল ডোবা ঘোষ বোস মিত্র, কুণ্ডু দে দত্ত মহাশয়দের সম্পত্তিভুক্ত হ'য়ে গেছে!—তা'ও হবে!

কিন্তু আমার সে দিকটা দেখবার প্রয়োজন নেই। আমি দেখচি, একটা অখণ্ড জলধারা, শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনী, তরঙ্গভঙ্গে সাগরে গিয়ে মিশেছিল—মরুপ্রান্তরকে শীতল পুণ্যতরঙ্গে সুশ্যামল করে'—সেই অখণ্ড জলধারা এখন কতকগুলো ডোবায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু গঙ্গার পবিত্র নাম লোপ পায়নি। সে পুণ্যতরঙ্গ নাই—আছে ডোবার পঙ্কিল জল, তথাপি গঙ্গার নাম সংযুক্ত হ'য়ে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করছে! যে পুণ্যস্রোত শতধারায় ধাবিত হ'য়ে সগর-বংশ উদ্ধার করেছিল—সে স্রোত খণ্ডিত হ'য়ে, বদ্ধ হ'য়ে, এখন ঘোষেদের বোসেদের মিত্রদের বাসনের ময়লা, আর কাপড়ের কালি ধৌত করে' নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পচ্চে। কিন্তু গঙ্গার নামটি সংলগ্ন হয়েই আছে।

এই পবিত্র জলস্রোতের মত একটা পবিত্র জনস্রোত ইতিহাসের প্রারম্ভে হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করে' উত্তর ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্র প্লাবিত করেছিল। নূতন জ্ঞান, নূতন আলোক, নূতন আশা, নূতন দৃষ্টি নিয়ে উত্তর ভারতের মাঠে মাঠে, নদীর তীরে তীরে, পর্ব্বতের উপত্যকায় উপত্যকায় ছেয়ে পড়েছিল। ভাগীরথী-জলতরঙ্গের মতই

কল্যাণবাহী এই জনতরঙ্গ জ্ঞানের, সমৃদ্ধির, সিদ্ধির মন্ত্র বহন করে' পতিতের উদ্ধার ব্রত নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কালক্রমে সে স্রোত খণ্ডিত হ'য়ে, বহু বিভক্ত হ'য়ে, প্রদেশে প্রদেশে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হ'ল; আরও পরে, সেই জলাশয় ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে পরিণত হ'য়ে— ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপী পল্ললে রূপান্তরিত হল; তারপর চতুর্ব্বর্ণ থেকে ছত্রিশবর্ণ হ'ল; তারপর যত দিন যেতে লাগল, গণ্ডী সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে শতধা বিভক্ত ভাগীরথী তরঙ্গের মত এক একটি ক্ষুদ্র উপ-জাতে বা ডোবায় পরিণত হ'ল—সে স্রোত নাই, সে গতি নাই, বিশাল সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে যোগ নাই, বিশ্বের চিন্তা-জ্ঞান-উদ্যম-ভাবার্ণবের সঙ্গে স্পর্শবিরহিত পূতিগন্ধময়, নির্জ্জীব ডোবায় পরিণত হ'ল। কিন্তু নাম সেই আছে—ঘোষ-ক্ষত্রিয়, গুপ্ত-ব্রাহ্মণ, কুণ্ডু-বৈশ্য ইত্যাদি—এবং সকলে মিলে আর্য্যজাতি।

বাঁশ চিরলে বাখারি হয়, ভেড়া কাটলে mutton হয়, টাকা ভাঙ্গালে শিকি দুয়ানি হয়, কিন্তু আর্য্যজাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করে' কুচিকুচি কল্লেও সেই আর্য্যজাতিই থাকে—এ হেঁয়ালি মন্দ নয়! কিন্তু রহস্যের কথা নয়। এ জীবন মরণের কথা।

এই খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যে জাতি, উপ-জাতি, প্র-জাতির সৃষ্টি হয়েচে, তার ফলে বিশ্বব্যাপি-ভাবজলধির সঙ্গে সংযোগ লুপ্ত হওয়ায় একটা জীবন্ত নিত্য নবীন পরিশুদ্ধ ভাব-স্রোতের প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে গেছে; সুধু তাই নয়, আমাদের দৈহিক অবনতিরও পরাকাষ্ঠা হয়েচে।

ভাই-বোনে বিবাহ হ'লে, দার্শনিক বলেন, সন্তানের অবনতি হয়; রক্তের নৈকট্য পরমায়ু ক্ষয় করে, বংশলোপ করে। ভাবের, চিন্তার অবাধ ধারা গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে, লোকাচার, দেশাচার, কুলাচার, ক্রমে

পারিবারিক আচারে পরিণত হ'য়ে, যেমন মনটাকে লোহার জুতা পরিয়ে ক্ষুদ্র খর্ব্ব বিকৃত করে' দেয়; রক্তের ধারার তেমনি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ খণ্ডিত হ'য়ে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নরনারীর মধ্যে চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে, যুগযুগান্তর ধরে' নবশোণিতসম্পর্করহিত হ'য়ে—প্রদেশে, গোষ্ঠী মধ্যে, এমনকি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে যায়, এবং পচে। রক্তের নৈকট্য ও অপরিশুদ্ধতা যে দেহের অবনতির কারণ সেই কারণের পূর্ণ প্রকোপ লোকচরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য-রক্তের অবাধ স্রোত এইরূপে ক্ষুদ্র জাতি উপজাতি প্র-জাতিরূপ ডোবায় পরিণত হ'য়ে পচ্চে,—দেহ-মন উভয়ই পচ্চে - ঘোষ-ক্ষত্রিয়ের ডোবা, চট্টোপাধ্যায়-ব্রাহ্মণের ডোবা, কুণ্ডু-বৈশ্যের ডোবা—সব পচে ভট্ ভট্ করচে—দেহ-মন উভয়ই পূতিগন্ধময় হ'য়ে উঠেচে। আর্য্যবংশধরগণের সংখ্যা কমচে—তার কারণ সুধু দারিদ্র্য নয়—তার মুখ্য কারণ এই দেহ-মনের "ধসা পশ্চিমে" রোগ।

বাদার আবাদের যদি "ঘোষের গঙ্গা", "বোসের গঙ্গা", "কুণ্ডুর গঙ্গা"র পূতিগন্ধ দূর করতে হয়, পঙ্কোদ্ধার করতে হয়, তা হ'লে কি করতে হবে? অনেক "পুকুর-কাটা" উপদেশ দিয়েছেন—পাঁক তুলে' পাড়ের উপর গাদা কর, তারপর আকাশের জলে যখন পুকুর ভরে' উঠবে তখন ডোবার জল কাকের চক্ষুর মত স্বচ্ছ পরিষ্কার নয়নানন্দদায়ক হবে।

অনুরূপ বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতের ডোবার সংস্কার-কল্পে, জাতের পঙ্কোদ্ধার কর্ত্তে চারিদিকে সংস্কারকের দল কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে লেগে গেছেন। তারই ফলে ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা,

বৈদ্য-ব্রাহ্মণসভা, বৈশ্যসভা, সুবর্ণবণিকসভা, তিলিসভা ইত্যাদি সভাসকল গজিয়ে উঠেচে। এই জাতির "পুকুর-কাটা"দের ধারণা জাতগুলার আভ্যন্তরীণ পঙ্ক উদ্ধার করে' পাড়ের 'উপর গাদা করলে, আকাশের জলে পুকুরে স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করবে।

কিন্তু এই সংস্কারকের দল ভুলে' যান যে জাতির পাঁক তুলে' পাড়ে গাদা করলে, কালের স্রোতে সে পাঁক পুকুরেই ধুয়ে এসে পড়বে; তারপর পাড়টাকে আরও উঁচু করে' প্রাচীর দিলে, নব-জলধারার স্রোতটাকেই বাঁধ দিয়ে বাহিরে রাখা হবে, এবং বিভিন্ন ডোবাগুলিকে অর্থাৎ ছত্রিশ জাতকে আরও স্পষ্ট ও কায়েমী করেই রাখা হবে। এবং আকাশের জলে ক্ষণকালের জন্য ডোবার মলিনতা অপনোদন হ'লেও গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে আবার জল শুকিয়ে যাবে, আবার পচ ধরবে; কেননা পচধরা রোগ পুকুরের ভিতরেই বর্ত্তমান—তার সঙ্কীর্ণতা, তার বদ্ধতা, বিশ্বের ভাব-মন্দাকিনীর প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নতাই ডোবার পচধরার কারণ।

কেউ কেউ বলেন—তবে ডোবার পাড় ভেঙ্গে চতুঃপার্শ্বস্থ জমির সঙ্গে সমতল করে' দাও; অর্থাৎ জাতের গণ্ডী তুলে' দাও, সব পুকুরগুলা একাকার হ'য়ে যাক। এ কার্য্য সম্প্রতি এক সমাজ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা'তে কৃতকার্য্য হননি। ভেবে দেখুন যদি ঘোষের গঙ্গার, বোসের গঙ্গার, কুণ্ডুর গঙ্গার, পাড় ধসিয়ে দিয়ে এক করে' দেওয়া যায় তা হ'লে কি (জলস্রোতের কথা ছেড়ে দি) একটা লম্বা দীঘিকারও সৃষ্টি হ'তে পারে? ডোবার সম্বল জল, জাতির সম্বল জীবন, ক্ষুদ্র ডোবায় গণ্ডুষপরিমাণ জল যতক্ষণ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ আছে ত আছে, পাড় সমতল করে' দিলে, জল

মাঠে গিয়ে মাঠে মারা যাবে। জাতির সম্বল যেটুকু প্রাণ এখনও ধুক্ ধুক্ কচ্চে তাকে যদি গণ্ডীর ভেতর বদ্ধ না রেখে একাকার করে' দেওয়া হয়—যে ক্ষীণ প্রাণটা এখনও দেহে রয়েছে তা'ও চলে যাবে—জাতির বাঁধনহীন যে সংস্কারকের সমাজ—সে সমাজ যে একান্ত প্রাণহীন তার কারণই এই—আর সেটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি।

তবে উপায় কি? উপায়—যদি জাহ্নবীজলস্রোতের মত একটা জীবন্ত স্রোত এই পরিশুষ্ক পঙ্কিল পূতিগন্ধময় জাতির জীবনে প্রবাহিত করে' দেওয়া যায়, একটা ভারতবর্ষব্যাপী ভাবস্রোত—যার উৎস, আকাশের সবিরাম বৃষ্টিপাত নয়, যার উৎস বিশ্বের জ্ঞান-জলধি—সেই স্রোত কোন ভগীরথ এই জাতির খণ্ডিত জীবনে প্রবাহিত করে' দিতে পারেন, তবেই এই সহস্র ডোবার পঙ্কোদ্ধার হয়—সমগ্র জাতি নূতন ভাব-বন্যার সঙ্গে নবজীবন লাভ করে।

ভারতের বিচিত্র ইতিহাসে এ চেষ্টা হয়েছিল; যখন কপিলাবস্তুর রাজপুত্র ভারতের পঙ্কিল পল্বলে নূতন জীবন-জল-প্লাবন এনেছিলেন—ক্ষুদ্র ডোবাগুলোকে ভাসিয়ে ছয়লাব করে', ভারতের মহাস্থবির কলেবরে যৌবনজলতরঙ্গ বহিয়েছিলেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির পাড় প্লাবনের পীড়নে ধসে' পড়েছিল—জাতি ছিল না, ধর্ম্মের কোলাহল কচ্ কচি ছিল না.—ছিল কর্ম্মের উদ্দাম স্রোত, সৃষ্টির দুর্ম্মদ আবেগ, গঠনের অলৌকিক প্রেরণা;—কে সে প্লাবন আনবে?

১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪

৫০

ধোঁকা

ধোঁকার উপর জগৎ-সংসার চলচে। শাস্ত্র বলেচেন—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়াময়—খুব সত্য কথা। মায়া বলতে বিভ্রম, আর মায়া বলতে মমতা—এই বিভ্রমের বনেদের উপর মমতার প্রাচীর তুলে', মানুষ তাসের ঘর বানায়—কিন্তু প্রতিক্ষণে মনে করে—কি দুর্ভেদ্য ভরতপুরের দুর্গই বানিয়েচি, কেননা একটা ফুৎকারের ওয়াস্তা—তার ধোঁকার টাটী ভূমিসাৎ হ'তে। আমাদের শাস্ত্রকারগণের মত যাঁরা চুল চিরে' মনোরাজ্যকে তন্ন তন্ন করে' দেখতে পারেননি, অথবা আমরা মনে করি যে পারেননি, সেই বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দার্শনিকও বলেন Life is made tolerable by its illusions.

একজন ফরাসি কবি বলেচেন যে, সংসারটা যে কি, মানুষ যদি তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারত তা হ'লে তার বিভীষিকা উৎপন্ন হ'ত—সে হয় পাগল হয়ে যেত, না-হয় আকণ্ঠ বিষপান করে' মরে' সে-বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচত। একটু চোখ চেয়ে দেখলে বাস্তবিক কবির কথাটা মোটেই অতিরঞ্জিত বলে' মনে হবে না।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এটা pessimism; কিন্তু pessimism বল্লেই কথাটার যথেষ্ট উত্তর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল তা নয়। কেননা optimism যে মায়া নয় সেটা কায়মি প্রমাণ

দিয়ে দাঁড় করাতে হয়, তবে pessimismকে যুক্তির আসর থেকে বহিষ্কৃত করা চলে।

মানুষ মাত্রেই আপনার রূপ-গুণের প্রতি খুব আসক্ত দেখতে পাওয়া যায়। যদি তা না হ'ত তা হ'লে জীবনটা অসম্ভব হ'ত। কিন্তু এই মুগ্ধ হওয়াটা একটা মোহ বা মায়া বা illusionএরই ফল স্বরূপ। ভগবান খুব বুদ্ধি করেই মানুষের চক্ষু দুটা এমন স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন যে, মানুষ নিজের হাত-পা'র মত, মুখখানাকে সদাসর্ব্বদা দেখতে পায় না—তার দেহযষ্টির সমগ্র রূপটা তার নয়নগোচর হয় না; যদি হ'ত,—ঠিক ঘৃণা না হ'লেও,—নিজের চন্দ্রবদনের প্রতি শীঘ্রই অরুচি জন্মে যেত। "অবসরমত" আরসিতে মুখ দেখে মুখচন্দ্রমার প্রতি মমতা বজায় থাকে।

তার মনের রূপ, তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা চলে। তার আমিত্বের স্বরূপ জ্ঞান তার চন্দ্রবদন সম্বন্ধে স্বরূপ জ্ঞানেরই মত। সেই জ্ঞান বা অজ্ঞানতা বশতই তার আপন সম্বন্ধে একটা ঘোরাল ধারণা গ'ড়ে' উঠে—গর্ব্ব দম্ভ ইত্যাদি সম্ভব হয়। স্বরূপ—মুখের বা মনের, ভগবান দেখবার অবসর দিলে মানুষ মাত্রই গলায় দড়ি দিত।

অন্যদিকে তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, নিজের প্রকৃত রূপ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ দেখতে পেলেই মানুষ মুক্ত হয়। দেহপাশ হ'তে মুক্তিই যদি মুক্তি হয়, তা হ'লে আমার কথায় আর তত্ত্বজ্ঞানীর কথায় খুব বেশী পার্থক্য নেই।

একজন আর একজনের প্রেমে যে মজগুল হ'য়ে যায়—তার মধ্যে কতখানি যে illusion আছে তা বলা যায় না। কথায় বলে Love

is blind—এ বাক্যটার সাধারণ অর্থ প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই উভয়ের দোষ দেখতে পায় না, কেবল গুণই দেখে, আর ভালবেসে চরিতার্থ হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা ভালবাসায় অন্ধ করে না—অন্ধ হ'য়ে তারপর মানুষ ভালবাসে। চোখ ফুটলে ভালবাসার নিবিড়তা কমে' আসে—Familiarity breeds contempt, ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশির পর যখন দেহ-মনের দোষগুলা চোখের বালি হ'য়ে চোখে পড়ে—তখন চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে—সেটা ঠিক আনন্দাশ্রু নয়, প্রেমবারিও নয়।

পুঁয়ে পাওয়া ছেলেকে মা বুকে করে' রাখে, তার কদর্য্য চেহারা মাতার চোখে পীড়া উৎপন্ন করে না—মাতৃহৃদয় ছেলের কুক্কুরবৎ বিশীর্ণ মুখে কত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে—রাজপুত্রেও সে সৌন্দর্য্য দুর্লভ! এখানে আর এক দিক দিয়ে Love is blind, অর্থাৎ মাতা অন্যের ছেলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও অন্ধ—নিজের ছেলেটীর মত ছেলে দুনিয়ায় তিনি দেখতে পান না। এত বড় illusion বা মায়া হয়ত সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রয়োজন, মাতার এই একান্ত একনিষ্ঠ ভালবাসা না থাকলে হয়ত সৃষ্টি থাকে না—তা হ'লেও এটা যে একটা illusionএর চরম illusion তা বলতেই হবে।

কবির কল্পনা in fine frenzy rolling, স্বর্গমর্ত্ত্য এক করে' ফেলে—মর্ত্ত্যকে স্বর্গ দেখে, স্বর্গকে মর্ত্ত্য দেখে, কোন প্রভেদ দেখতে পায় না ;—frenzy কথাটার উপর একটু ঝোঁক (emphasis) দিলে আমার বক্তব্যের সঙ্গে বেশী প্রভেদ থাকে না। আমিও মৌতাতের ঝোঁকে অনেক খেয়াল দেখে থাকি, সে খেয়ালকে কেউ দিব্যদৃষ্টি বলে' গ্রহণ করতে রাজি নয়। খেয়ালের মাথায় আমি দেখি—পুরুষ

আদিপুরুষের টুকরা, নারী আদ্যাশক্তির কণিকা, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং"এর বিরাট রূপ; কিন্তু যেমন মৌতাত পাতলা হ'য়ে আসে,—ক্রমে ছুটে যায়, মুখের স্বাদ তিক্ত হ'য়ে যায়, চোখে আর কোন সৌন্দর্য্য ফোটে না, সকল নারীকে প্রসন্নের বিভিন্ন সংস্করণ বলে' দেখায়, আর সকল পুরুষকে আমারই অর্থাৎ এই অব্যবস্থিত-চিত্ত, অন্ধ, স্বার্থপর, উদরসর্ব্বস্ব কমলাকান্তের পুনরুক্তি বলে' মনে হয়—পাখীর গানে মধু ঝরে না, সে-ডাকে ক্ষুধার জ্বালা অথবা রিপুর কামড়ের ইঙ্গিত পাই; ফুলের সৌরভে সৃষ্টিরক্ষার সনাতন প্রেরণার বিকাশ দেখতে পাই; নদীর কলকলে—ধ্বংসের আর্ত্তনাদ শুনতে পাই; বায়ুর নিঃস্বন—বেদনাবিধুর বিশ্বের দীর্ঘশ্বাস বলে' প্রতিভাত হয়।

এটা Pessimism বলে' মানুষ উড়িয়ে দেবে—give a dog a bad name and then hang it—এ ত প্রথাই আছে। কিন্তু এই উড়িয়ে দেওয়ার মনস্তত্ত্বের মধ্যেই আমার কথার সত্য নিহিত রয়েছে। ভগবানকে ঋষি 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' বলেচেন; সত্যের রূপই এই,—ভীষণ হইতেও ভীষণতর; এই সত্যকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়; কিন্তু অভাগা মানুষ জ্ঞানকে, সত্যকে চায় না; ভগবানকে, সত্যকে ভয় করে। রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু পরিবৃত মানুষ চায় বিস্মৃতি, সান্ত্বনা, শান্তি। ক্ষুধার জ্বালায় গরীব পাঁচুই খায় এইজন্য—এইজন্যই কমলাকান্ত অহিফেন সেবন করে। তাই কবি বলেচেন—

The people are looking for oblivion and consolation, not knowledge.

এ স্থধু আমাদের দেশের কথা নয় বিশ্বমানবেরই কথা। এই বিস্মৃতি ও সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষাই সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল—ইহলোকের দু'দিনের দুঃখ, পরলোকের অফুরন্ত সুখ—ধর্ম্মবিশ্বাসের এই দুই মূলকথা, সকল দেশে সকল যুগে সমস্বরে উচ্চারিত হয়েচে ; কেননা, সকল যুগে সকল দেশেই মানুষ মানুষ মাত্র—জ্ঞানের বিরোধী, ধোঁকার উপাসক।

২রা ভাদ্র, ১৩৩৪

৫১

প্রসন্ন

হে বিচারক! তুমি প্রসন্নকে অপরাধীর কাঠগড়ায় পুরে' তার বিচার করতে বস না, তোমার ধর্ম্মের দোহাই! Judge not that ye be not judged—তোমারই ধর্ম্ম বলে। বিচারকের আসন বড় উচ্চ আসন, তোমার শক্তি, তোমার ঐশ্বর্য্য তোমাকে সে আসনের অধিকার প্রদান করে না।

সে অধিকার লাভ করতে গেলে, যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, অত শক্তি, অত ঐশ্বর্য্য সে নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। শক্তিধর নিজের দিকটাই দেখে; প্রসন্নর দিক বলে' একটা দিক আছে, তার সম্যক ধারণা করবার মত স্থির চিত্ত বলদৃপ্তের থাকতে পারে না, তুমি বলদৃপ্ত অন্ধ; অতএব বিচারকের আসন কলুষিত ক'র না।

সুবিচার করতে গেলে মূলে যে idealএর তফাৎ রয়েচে, সেটা সম্যক মাথায় ধরে' রাখতে হয়। হে বিচারক, এই idealএর বিভিন্নতা সম্বন্ধে কোন খেয়ালই তোমার মনে উঠে নাই; অতএব idealএর মুক্তা তোমার সমক্ষে না ছড়িয়ে—তুমি যে detailএর উপর তর্ক চালিয়েছ আমিও সেই পথে চলিলাম।

তুমি জান কি প্রসন্ন বিধবা—সাদা থান পরে, এক সন্ধ্যা খায়, বারব্রত নিয়ে জীবনযাপন করে? সে widow's weeds পরে' বাহার

দেয় না,—ষড়রসের সমাবেশে যে উপভোগ্য ভোজ্য প্রস্তুত হয় তা উপভোগ করে' শরীরের রসবৃদ্ধি করে না; বৈধব্যের uniform পরে' সে নিজেকে advertise করে না—fresh fields and pastures newএর জন্য চরে' বেড়ায় না। তার কারণ হয়ত তোমার জানা আছে—স্বামী-বিয়োগের পর তার যে আবার স্বামী জুটবে না সেটা একরকম অবধারিত। এ অবস্থা খুব কঠিন অবস্থা; কিন্তু তোমার জানা আছে বোধ হয়, যে আমাদের সমাজ কুমারী মাত্রেরই স্বামী সঙ্গমের ব্যবস্থা করে' রেখেছে; এ জীবনে প্রত্যেক কুমারী একবার স্বামীলাভের সুযোগ পাবেই; তার দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি সে স্বামী হারায়, তার এই জীবনের lotteryতে, যেখানে স্বামীলাভ রূপ prize তার একবার উঠবেই, দ্বিতীয়বার যদি না উঠে তার দুর্ভাগ্য মাত্র। কিন্তু হে বিচারক, তোমাদের সমাজ-স্থিতিতে কন্যার বিবাহ ব্যাপারে এখনও all prizes and no blanks, এ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই; অতএব—প্রসন্নর বৈধব্য যতই কেন কঠিন হউক না, তোমাদের শিহরিবার কোন কারণ নাই।

প্রসন্নর জীবন যতই কঠিন হউক, সেটা যে ত্যাগের জীবন, এবং ত্যাগের জীবন বলে' গৌরবের জীবন—তা অবিবাহিত বিধবার সম্মান করে' তোমার নিজের দেশে তুমিই তার প্রমাণ দিয়ে থাক।

প্রসন্নর দুঃখ যে নেই তা আমি বলচি না; তার যে "অগাধ ব্যথা" তা আমি যত জানি তুমি কি তা জান? তবে কিনা, তার দুঃখে চোখের জল ফুরিয়ে ফেল না, এই সমগ্র রাজ্যটা যে অকূল পাথারে ভাসচে তার জন্য এক ফোঁটা জল রেখ; যদি তা না কর, বুঝব তোমার চোখের জলের ভিতর কোন কল আছে।

প্রসন্ন যখন সধবা ছিল, সাধু ঘোষের গৃহ-সংসারটা মাথায় করে' রেখেছিল। সে ঠিক পর্দ্দানশীন ছিল না, তথাপি বন্ধুর (friendship covers a multitude of sins) সঙ্গে স্বৈর-বিহারের স্বাধীনতা তার ছিল না; সুতরাং বন্ধুর সঙ্গে "বহির্গত" হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সাধু ঘোষের শয্যা-কণ্টক ধরিত না; এবং স্ত্রী ঘরে ফিরিয়া আসিলে—"I hope you have quite enjoyed the company" মাত্র এইটুকু বলেই মনের আগুন মনে চেপে রাখতে হয়নি। অতএব তুমি শিহরিয়া উঠিও না।

প্রসন্ন আঁটকুড়ি; তার জন্য তার বড় দুঃখ। সে কত দেবতার দ্বারে "হত্যা" দিয়েচে, তার নির্ণয় করা যায় না। যেন তার গর্ভে তার স্বামীর বংশধর জন্মায় এই আবেদন জানিয়ে সে কত ক্ষেত্রপাল, কত বাবাঠাকুর, কত পঞ্চানন, কত পীরের "দোর" ধরেচে—কত "ওষুদ" খেয়েচে, কত "ভার" বেঁধেচে, তার নির্ণয় আছে? সে কখনও আঁটকুড়ী থাকবার জন্য, যৌবনজলতরঙ্গে বালির বাঁধ দিবার জন্য, ঝাড়াহাতপা 'হবার জন্য ওষুধ খায়নি, অস্ত্রোপচার করেনি, যন্ত্রোপচার করেনি; অতএব শিহরিও না।

বিবাহকে সে নারী-জীবনের পরমার্থ বলে' ধরে' নিয়েছিল; যে-সমাজে সে জন্মেচে সে-সমাজের অত্যাশ্চর্য্য ব্যবস্থার কথা বলেছি যে, কুমারীমাত্রেই "স্বামী পরম গুরু"কে লাভ করবেই; সুতরাং তার নারীজন্ম যে সার্থক হবে তার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে বিবাহকে স্বৈর-বিহারের সহায়ক বলে' গ্রহণ করেনি; স্বামীকে safety valve হিসাবে গ্রহণ করেনি, বিবাহের পর নিজেকে enfranchie par la mariage বলে' স্বস্তির হাঁপ ছাড়েনি;

বন্ধন হ'লেও তাকে সানন্দে বরণ করে' নিয়েছিল ; অতএব শিহরিও না।

তারও পূর্ব্বে, সে যখন কুমারী (তখন সে শিশু বল্লেই হয়) তখন থেকেই সে মাতা হবার কল্পনা করেচে। তার শিবপূজার ভিতর, তার খেলাঘরের ভিতর, তার ভাবী পুত্রকন্যা ইচ্ছারূপে, আকাঙ্ক্ষারূপে বর্ত্তমান ছিল। কুমারী ও বধূর মধ্যবর্ত্তী এমন একটা অদ্ভুত অবস্থা তার কখনও ছিল না, যখন সে স্বৈরিণী ; যখন তার পিতামাতা পর্য্যন্ত স্বীকার করে' নিয়েছিল যে সে স্বৈরিণী, যে হেতু সে বিবাহ করে' পণবদ্ধ নয়। এই কৌমার্য্যের বন্ধনহীনতায় সে প্রমথনাথের পূজা করেচে, কিন্তু প্রমথগণের সহিত স্বৈর-বিবাহ করেনি ; অতএব শিহরিও না !

হে বিচারপতি, তুমি বিচার করবার অধিকারী নও, যেহেতু তুমি প্রসন্নকে বুঝতে পারবে না, প্রসন্নর দিক থেকে দেখতেই পারবে না।

প্রসন্নকে যদি গালি দিতে হয়, আমি দিব, কেননা আমি প্রসন্নকে জানি, ভালবাসি। ভালবাসার অধিকার যার নাই, তার তিরস্কারের অধিকারও নাই। মাতা সন্তানকে তাড়না করেন, সে তাঁর স্নেহের দাবী ; পথের লোকের সে দাবী নাই। তুমি পথের লোক, হে বিচারক, তোমার বিচারকের নিরপেক্ষ দর্শন নাই, ভালবাসার দাবীর কথা ত বহুদূরে।

প্রসন্নকে ঘৃণা কর আমি সহিব—

Patient as sheep we yield us
Unto your cruel hate

কেননা তুমি প্রসন্নকে ভালবাসিলে আমি ভীত হইতাম—বুঝিতাম প্রসন্ন উচ্ছন্ন গিয়াছে। কেননা তুমি ত সহজে ভালবাসিবার পাত্র

নহ—মাথাটি না খাইলে ত তুমি ভালবাসিতে পার না; তোমার "প্রাসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"; তুমি, যার কোন পদার্থ আছে, তার প্রতি ত এতাবৎকাল কখনও সদয় হ'লে না; আর যে অপদার্থ তার কপালেই তুমি জয়টীকা পরিয়ে দাও! প্রসন্নর প্রতি তুমি প্রসন্ন হ'লে ত আমার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে! প্রসন্নরা যেদিন মাথার চুল কেটে ফেলবে (রূপের ছটা কমাবার জন্য নয়), এবং পুরুষ কি নারী বোঝা যাবে না; সিগারেট টানবে; আদি জননীর অনুকরণে পোষাকের বালাই irreducible minimumএ নিয়ে গিয়ে মরদদের সঙ্গে জলে ঝাঁপাই ঝুড়বে বা দঙ্গল বেঁধে নাচবে; মদ খাবে; সেইদিন ত তুমি প্রসন্ন হবে? তাই বলি—

Add not unto your cruel hate
Your yet more cruel love

তাই বলি, প্রসন্নর বিচার আমি করব, তুমি কোথাকার কে? প্রসন্নর কি দোষ, কোথায় তার ত্রুটি তা আমি জানি, সে ত্রুটির পয়ার আমি করব। হে বিচারক, তুমি নিজের ঘর সামলাও—তোমার দুই মিলিয়ন কুমারীর পয়ার কর—তারা কোথায় যায়, কি করে, নজর কর; তারপর প্রসন্নর ভাবনা ভেব। Charity begins at home. কানীনপুত্রের জননীর বিষোদ্গার, নিমকহারামের নির্লজ্জ বিষ্ঠাবমন, পেশাদার "সুসমাচারের" ফিরিওয়ালাদের মিথ্যা সমাচারে আমি বিচলিত নই—আমি জানি—

Such varlets pimp and jest for hire
Among the lying Greeks.

৯ই ভাদ্র, ১৩৩৪

৫২

অভি-নেতা

আমি নেতা ও নীতের পরিচয় দিয়েছি। নেতা প্রসন্ন, নীত আমি—একথা বল্লেই স্পষ্ট ও চূড়ান্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু স্পষ্টকথা সকলে বুঝতে চায় না, তাই ঘুরিয়ে বলে' স্পষ্টকথা গ্রহণ করাতে হয়—কচিখোকাকে যেমন মা ভাতের গ্রাসকে ভাতের গ্রাস না বলে', এইটে আঁব, এইটে কাঁটাল, এইটে লিচু বলে', খোকার মুখে তুলে' দেন। খোকা গলধঃকরণ করবার সময় ঠিক বুঝে নেয়, আঁব খাচ্চি কি কাঁঠাল খাচ্চি, তথাপি সে খেয়ে ফেলে—মার কাজ সাঙ্গ হয়। আমরা বুড়োখোকারাও ঠিক সেই ধাতুর, যেটা যা সেটাকে ঠিক তা বল্লেই আর গলধঃকরণ কঠিন হ'য়ে উঠে।

প্রসন্ন যে নেতা তা প্রসন্নকে দেখলেই বোঝা যায়—সে তার অন্তরের ইচ্ছা আমাকে ঠিক গ্রহণ করিয়ে তবে ছাড়ে, আর আমি তার ইচ্ছাটাই গ্রহণ কল্লুম এইটে কোন রকমে ব্যক্ত না হ'য়ে পড়ে, এইটুকু সাবধান হ'য়ে—"তোমারই ইচ্ছা হউক পূরণ, করুণাময়ী নারী"—মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে', মুখে বলি "হাঁ, আমারও ঠিক সেই মত, চিরদিনই সেই মত ছিল, তুমি আজ বল্লে সেটা বাড়ার ভাগ।"

প্রসন্নদের এই ইচ্ছাশক্তির প্রকোপ এত বেশী, এবং সে শক্তির

কার্য্য এত অনাড়ম্বর ও অমোঘ যে আমরা, অর্থাৎ পুরুষরা যে অবাধে তাদের অনুগমন করি তা আমরা টেরও পাই না।

প্রসন্ন যদি আমার স্ত্রী হ'ত লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলত; কিন্তু আমার একটা খটকা লাগে—আমি যদি নেতা হতাম এবং আমার স্ত্রী যদি কায়মনোবাক্যে আমার অনুসরণ করতেন, তা হ'লে তাঁকে লোকে পতিব্রতা বলে' ধন্য ধন্য করত, এবং সেই ধন্যবাদের ঠেলায় হয়ত তিনি আমার সঙ্গে সহমৃতা পর্য্যন্ত হ'তে উদ্যতা হতেন। আমি কিন্তু এটা ঠিক বুঝতে নারলাম—স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করলে পতিব্রতা হয়, আর পতি স্ত্রীর অনুগামী হ'লে পত্নীব্রত না হ'য়ে স্ত্রৈণ হয়। এ digressionএর হয়ত কোন মূল্যই নেই, একেবারে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে তর্ক, কেননা আমি চিরকুমার, প্রসন্নর আশ্রয়ে বাস করি মাত্র।

যা হ'ক—সমাজে বা রাষ্ট্র মধ্যে যিনি নেতা তিনি কখনও একটা বিরাট ঝঞ্ঝার মত, সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে', বনানীকে মথিত করে', পর্ব্বতচূড়াকে চূর্ণ করে', আপনার গন্তব্য পথে চলে' যান, আর তুমি আমি প্রসন্ন—সকলকে ঘাড় ধরে' আপনার প্রদর্শিত পন্থায় চালিয়ে নিয়ে যান। তিনি সূর্য্যের ন্যায় জগতের জীবনরূপী—মহাদ্যুতি, ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন,—অজ্ঞানতিমিরনাশী, সকল পাপের অর্থাৎ অন্যায়ের অন্তকারী।

কখনও বা তিনি ঊষার রাগে, কখনও প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে, কখনও সন্ধ্যার ম্লান আভায় ধরার বক্ষ প্লাবিত করেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় তিনি স্বপ্রকাশ, স্বীয় বিজ্ঞান-বিভায় উদ্ভাসিত।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এই জননায়ক কখন কখন রাহুগ্রস্ত হ'য়ে ক্ষণকালের

জন্য অন্ধকারের আবেষ্টনে মুহ্যমান হন—বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু—নেপোলিয়ন, লেনিন, সান ইয়াটসেন—সকলেরই এই দশা হয়েছিল—কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য মাত্র।

নীত যাঁরা তাঁদের জ্যোতি নেই, উত্তাপ নেই—জনসঙ্ঘের তাপ তাঁরা পরিমাপ করেন মাত্র। জনসঙ্ঘ তাতিয়া উঠিলে তাঁরা তাতিয়া উঠেন; তাঁরা যে উত্তাপ record করেন সেটা তাঁদের নিজের তাত নয়, অপরের। এই নীতের দল বানের মুখে নৌকার মত—স্ফীত তরঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করে' ভেসে যান—দেখায় যেন তাঁরাই বানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চেন—কিন্তু তাঁদের নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—তাঁরা আগে যান বলে' অগ্রণী—এগিয়ে নিয়ে যান বলে' নয়।

নীতদের স্বপক্ষে একটি কথা বলবার আছে যে, জনসঙ্ঘের তাপটা তাঁরা অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেন; তাঁদের নিজ সত্ত্বাকে জনসঙ্ঘের সত্ত্বার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন—জনমতটাকে সৃজন কর্ত্তে না পাল্লেও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অভি-নেতা—সে বড় বিষম জন্তু!

অভিনেতার সাধারণ প্রকৃতি যা তা পূর্ণ মাত্রায় তাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান—অর্থাৎ যিনি ভীম সেজেচেন—তাঁর মধ্যে বৃকোদরের গর্জ্জন ও বপুর বিশালতা ব্যতীত আর কোন লক্ষণ না থাকলেও তিনি ভীমের অংশ অভিনয় করে' যেতে পারেন; ভীম-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর এক-প্রাণতা না থাকলে কিছুই এসে যায় না। অভি-নেতাগণের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলা চলে—অভি-নেতাগণ প্রকৃত যে-বস্তু সেটাকে পূর্ণ মাত্রায় ঢেকে রেখে, লোকের কাছে—অবস্থা বিশেষে যে রূপে প্রকট হ'লে ঠিক খাপ খায়, তাঁরা ঠিক সেই রূপে প্রকাশিত হন। তাঁরা যে রূপটা পরিগ্রহ করেন সেটা একান্ত নিজের জন্যই, পরের জন্য নহে। তাঁদের

মতামত ও কার্য্যবিধি নিজের নহে, পরের, তবে সেটা পরের হ'লেও তাঁরা আপনারই বলে' মনে করেন—এ আত্ম-প্রতারণা তাঁদের কখনও যায় না।

অভি-নেতা অন্যৎপুষ্ট কোকিলের মত, যতক্ষণ ছাতারের বাসায় ততক্ষণ তিনি ছাতারে, তারপর কোকিলা-সঙ্গমে তিনি পিকবর বসন্ত-সখা। নীত ও অভি-নেতায় এই পার্থক্য—উভয়েই পরের রূপ, পরের ধরণ নিজের করে' নেন, নীত করেন অন্তরের সহিত, অভিনেতা করেন অন্তরকে লুকিয়ে! তাই বলেছি অভি-নেতা বড় বিষম জীব!

কিন্তু হতভাগ্য দেশ আমাদের এই অভি-নেতার কবলে কবলিত হ'য়ে বিভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত হচ্ছে। এতে দেশেরও অপরাধ, অভিনেতাদেরও অপরাধ।

ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত বিসম্বাদ উপস্থিত করে' এই দুঃখী দেশের দুঃখের ভরা বৃদ্ধি করা হচ্ছে—সে বিসম্বাদের মূলে অজ্ঞানতা পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েচে। সে অজ্ঞানতা কোথাও পবিত্রতা, কোথাও বা আধ্যাত্মিকতার নাম গ্রহণ করে' জনসঙ্ঘের মনকে আচ্ছন্ন করে' রয়েচে; জনসঙ্ঘের যাঁরা মুখপত্র তাঁরা কোথাও নীত রূপে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভি-নেতা রূপে সেই অজ্ঞানতার পরিপোষণ করে' জননায়কের সম্মান লাভ কচ্চেন। প্রকৃত যিনি জননায়ক তিনি অজ্ঞানতার প্রশ্রয় দিবার পাত্র নহেন—কিন্তু সে দুর্লভ নেতার অভাবে, অভি-নেতাগণ জনমত পরিপোষণ করার অভিনয় করে' আপনাদের অপদার্থতার প্রমাণ দিচ্ছেন এবং গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢেলে চলে' যাচ্ছেন। ফলে এই বিচ্ছিন্ন দেশ আরও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে।

এককালে বলবানের, ধনীর উপাসনার প্রচলন ছিল; কিন্তু

বর্ত্তমান কালে শক্তিহীন দরিদ্র দরিদ্র-নারায়ণ নামে পূজিত হচ্চে; এই পূজা প্রকরণের নাম দেওয়া হয়েচে democracy. ধনবানের আরাধনা যে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, দরিদ্র-নারায়ণের আরাধনাও সেই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেতৃবর্গ অর্থাৎ অভি-নেতৃবর্গ বর্ত্তমান ভুলটাকে ভুল বলে' বুঝতে পেরেও জনমতকে ছাড়িয়ে উঠতে পারচেন না।

প্রথম ভুল—দরিদ্র দরিদ্র বলেই নারায়ণত্ব দাবী করতে পারে না—তার যা কিছু দাবী তা মানুষত্বের দাবী; সে দাবী ধনীরও আছে—অতএব দরিদ্র-নারায়ণ না বলে' মনুষ্য-নারায়ণ কথাটাই সত্য—সবার উপর মানুষ সত্য—এ বড় সত্যকথা।

এত দিনের নিপীড়িত দরিদ্র যখন মাথা তুলে' দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েচে তখন তাদের নারায়ণত্বে দাবী অমান্য করা অভি-নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অভি-নেতাগণ নারায়ণত্ব স্বীকার করার ফলে ধনীর সঙ্গে নির্ধনের বিরোধটা পাকা হ'য়ে যেতে বসেচে। কিন্তু অভি-নেতাগণকে চুপি চুপি ডেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে দরিদ্রের মধ্যেও সত্যিকারের নারায়ণকে কতখানি দেখলেন—তা হ'লে চুপি চুপি তাঁরা স্বীকার করবেন যে, ধনীর মধ্যেও যতখানি দরিদ্রের মধ্যেও ততখানি অর্থাৎ একটুখানিও নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে অর্থাৎ platform থেকে সে কথা বলবার তাঁদের সাহস নেই—এই সাহসের অভাবে তাঁরা আত্ম-প্রতারিত এবং অন্যকেও প্রতারণার মধ্যে ফেলে একটা বিরাট ভুলকে বাঁচিয়ে রেখেচেন।

ভগবান গড়লেন নর ও নারী। দুটা ভিন্নধর্ম্মী জীব—অভি-নেতা

দলিতা নারীর আর্ত্তনাদ শুনে বলে' উঠলেন—তুমি দেবী ; তারপর, তুমি দেবীরও উপরে, তুমি পুরুষের সমান। যখন হেয়ুং উঠল যে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকরণ তখন অভি-নেতা ঠিক সেই সুরেই গান ধরলেন। কিন্তু মনের ভিতর অন্য সুর বাজতে থাকল—সেটা এই যে, পুরুষ পুরুষ, নারী নারী।

অতএব এই অভি-নেতাদের কবল থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

১৬ ভাদ্র, ১৩৩৪

৫৩

মাতৃ-মঙ্গল

এস প্রসন্ন, মাতৃমঙ্গল গাহিব, শুনিবে এস। তোমাকে আঁটকুড়ী বলে' গালি দিয়েছিল তাই তুমি অভিমানে অধীর হয়েছিলে—আমার মত আঁটকুড়োর কাছে সান্ত্বনালাভের আশায় ছুটে এসেছিলে। অভিমানের কথা বটে—কেননা আঁটকুড়ী গালিটা তোমাদের যে কতবড় গালি তা যে আঁটকুড়ী সেই বুঝতে পারে, অপরে নহে। মাতৃমঙ্গল শোন, পরজন্মে—যদি তোমার পরজন্ম থাকে—হয়ত মাতা হ'য়ে ধন্য হতে পার।

মাতৃরূপিনী নারী, তুমি মাতা হইয়া জয়যুক্ত হও—বিশ্ববিজয়িনী প্রাণশক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ রূপিনী জননী হইয়া জয়যুক্ত হও।

কুলিশ-কঠোর তৈমুরলঙ্গ সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—পঞ্চাশৎ বৎসর ব্যাপিয়া—হস্তী যেমন বল্মীক স্তূপকে দলিত করিয়া চলিয়া যায়—তৈমুরের বজ্রকঠিন পাদুকা তেমনি নগর, গ্রাম, সমগ্র রাজ্য-স্থিতি দলিত মথিত করিয়া চলিয়াছে—দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছে; মৃতের অস্থিরাশি পর্ব্বত-চূড়ার আকার ধরিয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে। যেদিন মৃত্যু তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরকে তাঁহার স্নেহময় বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়—সেইদিন তৈমুরলঙ্গ, প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মরণের খেলায়, মৃত্যুকেও

পরাজিত করিতে বদ্ধপরিকর হন—সেইদিন তৈমুরলঙ্গ পণ করেন—মারের শীকার তিনি মারিয়া নিঃশেষ করিয়া দিবেন। করুণায় এক রাজপুত্র মারকে পরাজিত করিয়াছিলেন—তৈমুর মৃত্যুর খোরাক নিজেই নিঃশেষ করিবেন, মৃত্যু অনাহারে মরিবে, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার মুখে ত্রিশ বৎসর কেহ হাসি দেখে নাই; ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ, উচ্চশির—ত্রিশ বৎসর তাঁহার লৌহকবচ ভেদ করিয়া কোন ছিদ্রপথে করুণার রশ্মি তাঁহার হৃদয়-দ্বারে হানা দেয় নাই।

কিন্তু হে মাতৃশক্তি তুমি জয়যুক্ত হও—মৃত্যু তোমার নিকট পরাজিত—মৃত্যু-রূপী তৈমুর তোমার নিকট কেমন করিয়া পরাভব স্বীকার করিল তাহাই আজ গাহিব—তাহার উচ্চশির কি প্রকারে অবনত হইল—তাহার কঠিন হৃদয়াবরণ কি প্রকারে করুণার কোমল শরে ভিন্ন হইল—তাহাই আজ গাহিব—মাতা তুমি জয়যুক্ত হও!

সমরকন্দের মধ্যস্থিত এক শষ্পাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যে তৈমুরের ছাউনি পড়িয়াছে—সহস্রাধিক পটমণ্ডপ বিস্তৃত শিখিপুচ্ছের আকারে উপত্যকা ছাইয়াছে! সমরকন্দের কবিগণ এই উপত্যকা ভূমিকে "পুষ্পের প্রণয়" নাম দিয়াছেন—ফুলে ফুলে উপত্যকা ছাইয়া আছে—দূরে সুবৃহৎ নগরীর হর্ম্যচূড় দেখা যাইতেছে—মসজিদের শিখরদেশ লক্ষিত হইতেছে। পটমণ্ডপের উপর সহস্র রেশমী পতাকা বিচিত্র পুষ্প-বিতানের মত শোভা পাইতেছে।

এক সুবিশাল চতুষ্কোণ পটমণ্ডপের মধ্যে তৈমুরের দরবার বসিয়াছে—মণিমুক্তাখচিত রেশমী পরিচ্ছদ—শুভ্র কেশের উপর শুভ্র শিরস্ত্রাণ, শিরস্ত্রাণের শীর্ষদেশে রক্তবর্ণ মণিখণ্ড—যেন রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। তৈমুরের মুখচ্ছবি একখানা

বক্র রক্তমাখা ছুরিকার মত ক্রুর; চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র কিন্তু সর্ব্বদর্শী।

ভোজ্য ও পানীয়ের প্রচুর সমাবেশ—চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল; তৈমুর রাজন্যবর্গ পরিবৃত হইয়া আনন্দে মত্ত। তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র কবি করমানি উপবিষ্ট। করমানি নির্ভীক স্পষ্টবাদী—মৃত্যু হইতে ভয়ঙ্কর তৈমুরের মুখের উপর অপ্রিয় সত্য বলিতেও কুণ্ঠিত নহে। তৈমুর জিজ্ঞাসিলেন—"কবি কত টাকা মূল্যে আমাকে বেচিতে পার?"

করমানি উত্তর করিলেন,—"পঁচিশ টাকায়।"

তৈমুর। পঁচিশ টাকা ত আমার জুতারই মূল্য।

কবি। আমি জুতার কথাই ভাবিতেছিলাম—স্বধু জুতারই কথা—কারণ তোমার নিজের কোন মূল্য নাই—একটা কড়িও নয়।

ভীষণ হইতে ভীষণতর তৈমুরের মুখের উপর কবি এই সত্যকথা বলিলেন। কবি জয়যুক্ত হউন—কেননা কবিই একমাত্র সত্যের উপাসক—তাঁহার অন্য উপাস্য নাই এবং সত্য তৈমুরের তরবারি অপেক্ষা ভীষণ।

সুরা-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—সঙ্গীত-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে—সেই উন্মত্ত আনন্দ-কলরব ভেদ করিয়া, বর্ষণোন্মুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া যেমন বিদ্যুল্লতা ছুটিয়া যায়, কোথা হইতে নারীর আর্ত্ত-কণ্ঠরব ক্রূর তৈমুরের কর্ণ ব্যথিত করিল—সে কণ্ঠস্বর পুত্রহারা এবং পুত্রহন্তা তৈমুরের চিরপরিচিত।

তৈমুর হুকুম করিলেন—দেখ এ আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ কে আনে—

প্রতিহারী সংবাদ দিল—ছিন্নবসনা, ধূলি-ধূসরিতা এক রমণী,

উন্মাদিনী-প্রায়, ত্রিভুবন-বিজয়ী সাহান-সাহের সহিত সাক্ষাৎ চাহে।

"লইয়া আইস"—তৈমুর হুকুম করিলেন।

পরমুহূর্ত্তে তাঁহার সমক্ষে ছিন্নবসন-পরিহিতা তাম্রবর্ণা আলুলায়িত-কুন্তলে-অনাবৃতবক্ষ-অৰ্দ্ধআবৃত, উন্মাদিনী-প্রায় রমণী প্রসারিত হস্তের তর্জ্জনী তৈমুরের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিই কি সেই খঞ্জ যে সুলতান বৈয়াজিৎকে পরাভূত করিয়াছে?"

"হাঁ আমিই সেই, অনেককে পরাভুত করিয়াছি—এখনও ক্লান্ত হই নাই। কিন্তু, তুমি কে, রমণি!"

"শোন, তুমি অনেক কিছু করিয়াছ, কিন্তু তুমি পুরুষমাত্র, আমি মাতা। তুমি মৃত্যুর অনুচর, আমি জীবনের সহচরী। তুমি আমার নিকট অপরাধী, আমি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তোমার কাছে দাবী করিতে আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি তোমার মন্ত্র—'ন্যায় বিচারই শক্তির প্রস্রবণ'—আমি সে কথা বিশ্বাস করি না; তথাপি আমি মাতা, আমার প্রতি ন্যায় বিচার কর।"

তৈমুর রমণীর কথার ভিতর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা অনুভব করিলেও বলিলেন—"বস, তোমার কথা আমি শুনিব।"

রমণী সেই রাজন্যগণের সঙ্গে এক-আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি বহুদূর হইতে আসিতেছি—সে কতদূর তুমি বুঝিবে না। আমার স্বামী একজন ধীবর—সুন্দর, সরল, সুখী। আমি তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলাম! আমার এক সন্তান ছিল—তেমন সন্তান পৃথিবীতে কাহারও জন্মায় নাই—"

"আমার জাহাঙ্গীরের মত"—তৈমুর অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন।

"—আমার পুত্রের বয়স যখন ছয় বৎসর, জলদস্যুগণ তাহাকে

লুট করিয়া লইয়া গেল; আমার স্বামীকে মারিল—আরও কত লোককে মারিল। আজ এই চারি বৎসর ধরিয়া আমি পৃথিবী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার পুত্রকে খুঁজিতেছি—সে নিশ্চয়ই তোমার সৈন্য মধ্যে আছে—কেননা আমি জানি—সুলতান বৈয়াজিৎ জল-দস্যুগণকে ধৃত করিয়াছিল, আর তুমি বৈয়াজিৎকে মারিয়াছ, আর বৈয়াজিতের সর্ব্বস্ব লুট করিয়াছ—অতএব তুমি জান আমার পুত্র কোথায় আছে—ফিরাইয়া দাও আমার পুত্রকে।"

"পাগল"—এই কথা বলিয়া তৈমুর এবং তৈমুরের পারিষদবর্গ হাসিয়া উঠিল। কেননা সব রাজাই চিরদিন আপনাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্ব করেন।

কিন্তু কবি করমানি রমণীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ পাগল বটে, মাতা মাত্রেই যেমন পাগল—সেই মত—"

তৈমুর বলিলেন—"রমণি, তুমি পৃথিবী ঘুরিয়াছ বলিলে, কিন্তু অজানিত দেশে, নদনদী পর্ব্বত বনভূমি পার হইলে কি প্রকারে—বনের পশু, আর বনের পশু অপেক্ষাও পশুবৃত্তি মানুষের, হাত এড়াইয়া কি উপায়ে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে? হাতে হাতিয়ার নাই—যে বন্ধু হাতে বল থাকা পর্য্যন্ত কখনও বিমুখ হয় না সে তরবারি নাই—তোমার সকল সংবাদ দাও, আমার বিস্ময় অপনোদন কর, আমাকে বুঝিবার অবসর দাও।"

মাতা জয়যুক্ত হউক। রমণী উত্তর করিলেন—"আমি ধীবরগণের সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়াছি; যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার অন্বেষণ-কালে বায়ু অনুকূল হয় তাহা কি জান না? নদী সন্তরণে পার হইয়াছি। পর্ব্বত?—কই পর্ব্বত ত দেখি নাই!"

করমানি স্মিতহাস্যে বলিলেন—"যেথা প্রেম, সেথা পর্ব্বত সমভূমি হইয়া যায়!"

"সত্য, বনের পশুর সম্মুখে পড়িয়াছি—ভল্লুক, শূকর, মহিষ—কিন্তু পশুদেরও হৃদয় আছে—তোমার সঙ্গে যেমন কথা কহিতেছি, তাহাদেরও সহিত সেইরূপ কথা কহিয়া বলিয়াছি—আমি পুত্রহারা মাতা—সন্তানের উদ্দেশে চলিয়াছি—তাহারা মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

তৈমুর বলিলেন—"রমণি, তোমার কথা সত্য।"

রমণী শিশুর মত অনর্গল বলিয়া চলিল—কেননা শত পুত্রের মাতাও অন্তরে শিশুর মতই—"পুরুষ মাত্রেই মাতার কোলের সন্তান, তোমারও মা ছিল; বৃদ্ধ! তোমারও জননী তোমাকে স্তন্যপান করাইয়াছেন। তুমি ভগবানকে না মানিতে চাও, মানিও না; কিন্তু মাতাকে মানিতেই হইবে।"

কবি করমানি বলিলেন—"সত্য! বলীবর্দ্দ হইতে গোবৎস জন্মে না; সূর্য্যালোক না থাকিলে ফুল ফোটে না; প্রেম না থাকিলে সুখ থাকে না; রমণী না থাকিলে প্রেম থাকিত না; কবি কোথা থাকিত মাতা না থাকিলে!"

সভাস্থ সকলেই আপন আপন মাতার মুখ স্মরণ করিতে বাধ্য হইলেন। রমণী বলিলেন—"আমার পুত্র ফিরাইয়া দাও, আমি মাতা, সে আমার সন্তান।"

জনপদ-বিধ্বংসী, নর-শোণিত-পিপাসু তৈমুর চিন্তাকুল হইলেন, নির্ব্বাক হইয়া ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন—তারপর সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমি তৈমুর—আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মৃত্যুর খোরাক নষ্ট করিয়া, নিজ হস্তে রক্তের নদী বহাইয়াছি—যে হেতু মৃত্যু আমার হৃদয়ের আলো নিভাইয়া দিয়াছে, আমার জাহাঙ্গীরকে গ্রাস করিয়াছে। মানুষের মূল্য কিছু নাই, রাজ্যের মূল্য কিছু নাই—আমার ন্যায় খঞ্জ, মানুষের মুণ্ডপাত করিয়াছে, ধরিত্রীকে পদানত করিয়াছে—কিন্তু আজ আমার যাহা মনে হইতেছে তাহা নূতন, একান্ত অভিনব! এই ক্ষুদ্র রমণী আমার সম্মুখে বসিয়া আমাকে হুকুম করিতেছে—তাহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে বলিতেছে—যেন সে আমার সমকক্ষ বা আমার প্রভু! এ শক্তি সে কোথায় পাইল! সে স্নেহময়ী মাতা—কল্যাণময় পুত্রের জননী; সে পুত্র হয় ত একদিন পৃথিবীর সকল দুঃখ মোচন করিয়া আনন্দস্রোতে ধরিত্রীকে প্লাবিত করিবে—আমার জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহাই করিত—আমি মাত্র নরশোণিতে মৃত্তিকা অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি—কিন্তু কিছু রোপণ করি নাই—কি জন্মিবে এই উর্ব্বর মরুভূমি বক্ষে?

পার্শ্বচরগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"যাও জনে জনে, দিকে দিকে—জননীর সন্তানকে খুঁজিয়া আন; সে আনিবে তাহাকে রাজ্য দিব—মাতা তিষ্ঠ—তোমার পুত্রকে আনিয়া দিব!" এই বলিয়া ভয়ঙ্কর তৈমুর শিশুর মত মাথা নত করিল। মাতা হাসিলেন—সকলে হাসিল—জননীকে দেখিয়া শিশু যেমন হাসে তেমনি হাসিল। জননীরূপিণী নারী জয়যুক্ত হও!

৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪

ইতি

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যদি একটি মানুষ হতো তো এতকাল ধরে সে বেঁচে থাক্তেই পারতো না।—কিন্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্কিমের যুগে এই ঝাঁটা একবার এ দেশের উপরে পড়েছিল। এখন এ যুগের পালা তাই ঝাঁটা আবার এসেছে। শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে নতুন যুগের নতুন পাতা বা খাতা খুল্লেন চারু বাবুর কমলাকান্ত। এজন্যে অল্প লোকের কাছেই ধন্যবাদ পাবেন তিনি, কিন্তু ঝাঁটার দৌলতে চারু বাবুকে প্রায় সকলের কাছেই গালাগালি সইতে হবে এটা দেখতে পাচ্ছি। যারা—'উলঙ্গ সত্য' বলে কথাটা সহজে মুখ থেকে বার করে কিন্তু কথার উলঙ্গতাকে একেবারেই মার্জ্জনা করতে রাজি নয় তারা পত্রের ভাষার খুঁৎ ধরবেই ধরবে—এবং তাই ধরেই থাকবে, ভাবটা ধরবার দিকেও যাবে না। কমলাকান্তের পত্র ক'খানার আগাগোড়াই উলঙ্গ এবং সত্য; অতএব সত্যটা পরিত্যাগ করে উলঙ্গতারই সমালোচনা করবে কাগজওয়ালারা এবং যারা রুচিবাগীশ তারা। কমলাকান্ত একমাত্রা আর্ফিং এবং এক পোয়া ঘন দুধ এই নিয়েই থাকবে, বই বেচে পয়সা পাবে না নিশ্চয়—এটা যে উলঙ্গসত্য তা বইটা পড়লে সকলেই বুঝবে।"

—(ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩০)

প্রবাসী

"এই পুস্তকে Re-incarnated কমলাকান্তের ৩০ খানি পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সাবেক কমলাকান্ত রসিকতার আবরণ দিয়া বহু বিষয়ের গভীর তত্ত্ব আলোচনার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নূতন অবতারও সেইরূপ গভীর অভিনিবেশ ও বিচক্ষণতার সহিত অনেক চিন্তনীয় তত্ত্ব রসলিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে নব-নব বিষয়ে চিন্তা উদ্রিক্ত হয়, জ্ঞাত বিষয়ের উপর নূতন

আলোকপাত হয়, বহু সমস্যা ও সমাধান মনের সম্মুখে উপনীত হয়। আধুনিক কালে বঙ্গসাহিত্যে চিন্তাশীলতার নিতান্ত অভাব; চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে যে পরিমাণ বিদ্যা আত্মস্থ করিয়া প্রকাশ করিবার শক্তির আবশ্যক তাহা আধুনিক লেখকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় একখানি চিন্তাশীল প্রবন্ধের পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম।" —(ফাল্গুন, ১৩৩১)

ভারতবর্ষ

"লেখকের নাম নাই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন; তিনি নিজের নাম গোপন করেন নাই; কিন্তু এই 'কমলাকান্তের পত্র'-লেখক নাম গোপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে চিনি, বিশেষভাবে জানি, বন্ধু বলিয়া গৌরবও অনুভব করি। কিন্তু নামটা তিনি যখন গোপন করিয়াছেন, তখন আমরাও প্রকাশ করিলাম না। তবে, ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছি, এমন কৃতী, এমন পণ্ডিত, এমন তত্ত্বজ্ঞ, এমন সুরসিক লেখক বেশী দিন আত্মগোপন করিতে পারিবেন না। এই 'কমলাকান্তের পত্র'ই তাঁহাকে শুধু জাহির করিবে না, তাঁহাকে যশস্বী করিবে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র পাশে এই 'কমলাকান্তের পত্র' নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে স্থান গ্রহণ করিতে পারে, একথা আমরা এই পুস্তকের প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এম্-এ মহাশয়কে জানাইয়া দিতেছি। এই পুস্তকের ইহার অধিক পরিচয় আর কি, তাহা আমরা জানি না। যিনি বাঙ্গলা পড়িতে জানেন, তাঁহাকেই এই বইখানি পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।"—(পৌষ, ১৩৩০)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

"অহিফেনামৃত পান করিয়া কমলাকান্ত ঠাকুর বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। অহিফেন প্রসাদাৎ তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা শক্তি যে শুধু অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নয়, পরন্তু কালের গতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা দেশে যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানা বিষয়ক সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, আফিংখোর কমলাকান্ত সেগুলির কি সুসঙ্গত